ভাগীরথী বহে চলে

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

এই লেখকের আরও কয়েকখানি বই

মঙ্গলসূত্র	লালুভুলু
মধুমতী থেকে ভাগীরথী	কলঙ্ককথা
উর্বশী সন্ধ্যা	হাসপাতাল
উল্কা	কাজললতা
বহ্নিশিখা	কন্যাকুমারী
রজনীশেষের শেষতারা	সূর্যতপস্যা
অজ্ঞাতবাস	রতিবিলাপ
অমৃতপাত্রখানি	মায়ামৃগ
ইস্কাবনের টেক্কা	ময়ূর মহল
অশান্ত ঘূর্ণি	বাদশা
কোমল গান্ধার	রাত্রি নিশীথে
অহল্যা ঘুম	কনকপ্রদীপ
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি	মেঘ কালো
তালপাতার পুঁথি	কাগজের ফুল
সেই মরুপ্রান্তে	নিরালা প্রহর
ঝড়	রাতের গাড়ী
অপারেশন	রূপ ও প্রসাধন
অস্তি ভাগীরথী তীরে	কন্যা কেশবতী
ধূসর গোধূলি	কিরীটী অমনিবাস
উত্তরফাল্গুনী	নীলতারা
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী	নূপুর
কালো ভ্রমর	নিশিপদ্ম
ছিন্নপত্র	মধুমিতা
কালোহাত	মুখোশ
ঘুম নেই	রাতের রজনীগন্ধা
পদাবলী কীর্তন	কিশোর সাহিত্য সমগ্র

ভাগীরথী বহে চলে

নৌকা এগিয়ে চলেছে। বকশিশের লোভে চারজন দাঁড়ি সমানে দাঁড় টেনে চলেছে। ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন।

দেখতে দেখতে গঙ্গাতীরবর্তী কলকাতা শহর দৃষ্টিপথ থেকে মিলিয়ে যায়।

পাটাতনের উপরে উপুড় হয়ে মাথা গুঁজে সুহাসিনী ফুলে ফুলে কাঁদছিল তখনো। তার চারু কেশভার পৃষ্ঠব্যেপে ছড়িয়ে পড়েছে—আঁচল লুটোচ্ছে!

হাত-দুয়েক ব্যবধানে বসে ভবতারিণী পাষাণমূর্তির মত।

আর নৌকার গলুইয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তখনো আনন্দচন্দ্র। রাধারমণ যে তার বালবিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেবেন বলে স্থির করেছেন কথাটা আনন্দচন্দ্রর কানেও এসেছিল। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আনন্দচন্দ্র ব্যাপারটার মধ্যে কোন দোষের কিছু দেখতে পায়নি।

হিন্দুঘরের বিধবাদের যে কি দুর্বিষহ জীবন সে তো আনন্দচন্দ্র জ্ঞান হওয়া অবধিই দেখে এসেছে তার নিজের গৃহে। নতুন যুগের শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের স্পর্শে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাকে আসতেই হয়েছে। বিদ্যাসাগর-মশাইকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টাকে আদৌ নিন্দনীয় মনে করেনি—তাই সে যখন শুনেছিল মল্লিকমশাই তাঁর বালবিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিতে মনস্থ করেছেন, মনে মনে তাঁর সৎসাহসকে প্রশংসাই করেছে। এবং এটাও ঠিক, আজ নৌকায় পা দেওয়ার পূর্বে যদি সে ভবতারিণী দেবীর নবদ্বীপ যাবার ব্যাপারটা বুঝতে পারত, সে কোনমতেই ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে আসত না।

কিন্তু এখন আর ফিরবার পথ নেই। তাকে নবদ্বীপধাম পর্যন্ত যেতেই হবে।

সুহাসিনী তখনো ফুলে ফুলে কাঁদছিল—আনন্দ দাদা গো, আমি যাব না—আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল—

পিতামহীর কাছে কেঁদে কোন লাভ নেই বুঝতে পেরেই হয়ত সুহাসিনী আনন্দচন্দ্রের সাহায্যভিক্ষা করছিল কেঁদে কেঁদে।

কিন্তু কি করবে আনন্দচন্দ্র! কি সে করতে পারে ভেবে ভেবে আনন্দচন্দ্র কোন পথই দেখতে পায় না। ভবতারিণীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহসও যেমন তার নেই, তেমনি সে শক্তিও নেই। অথচ সে মনে মনে বুঝতে পারছিল এ অন্যায়। এ জুলুম।

ক্রমে সূর্যের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রৌদ্রের তাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুহাসিনী একসময় কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঐ পাটাতনের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে বায়ু অনুকূল পেয়ে মাঝি নৌকায় পাল তুলে দিয়েছিল—নৌকা তরতর করে বহে চলে।

ভবতারিণী ইতিমধ্যে গিয়ে ছৈয়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাঝি ও দাঁড়িরা আনন্দচন্দ্র বা সুহাসিনীর দিকে তাকায়ও না—তারা তাদের কাজ আপন মনে করে চলে।

ভবতারিণী ও অন্নপূর্ণা যতই সতর্কতা অবলম্বন করুন না কেন এবং যত তাড়াতাড়িই তাঁদের কর্মপদ্ধতি স্থির করুন না কেন, কাদম্বিনীর কাছে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু গোপন থাকেনি।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাদম্বিনী সুহাসিনীকে তার শয্যায় না দেখতে পেয়ে সারা বাড়ি তার অনুসন্ধান করে পাতি পাতি করে এবং জানতে পারে কেবল সুহাসিনীই নয়, ঐ সঙ্গে কত্তামা ভবতারিণী দেবীকেও কোথায়ও দেখতে পায় না।

কোথায় গেল সুহাসিনী আর কোথায়ই বা গেলেন কত্তামা!

রাধারমণ বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কাদম্বিনী তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল—মামাবাবু!

—কাদু!

কাদম্বিনীর ডাকে রাধারমণ তার মুখের দিকে তাকালেন—কিছু বলবি কাদু?

—মামাবাবু সুহাস নেই—

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন রাধারমণ—নেই! কি বলছিস তুই, কাদু?

—হ্যাঁ মামাবাবু, সুহাস বাড়ির মধ্যে কোথায়ও নেই।

—নেই মানে কি? কোথায় যাবে সুহাস?

—তা জানি না। সারা বাড়ি অন্দর ও বহির্মহল—দীঘির ধার সর্বত্র খুঁজেছি কোথায়ও সে নেই। আর কত্তামাকেও দেখছি না।

—মা-ও নেই!

—না। আমার মনে হচ্ছে মামাবাবু, কাল রাত্রেই কত্তামা সুহাসকে সঙ্গে নিয়ে কোথায়ও চলে গেছেন।

—চলে গেছেন মা—কিন্তু কোথায় যাবেন?

—তা জানি না।

—তোর মামী কোথায়?

—রাধামোহনের মন্দিরে।

—তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি?

—না।

—হুঁ। যা তোর মামীকে একবার এ ঘরে পাঠিয়ে দে তো গিয়ে।

কাদম্বিনী চলে গেল।

বিমূঢ় রাধারমণের আর কাজে বের হওয়া হল না, ঘরের মধ্যে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন অস্থির ভাবে—তাঁর কি গোপন বিবাহ দেবার ব্যাপারটা তাঁর মা জেনে ফেলেছেন? কিন্তু কেমন করেই বা জানবেন? এ বাড়িতে কথাটা একমাত্র ঐ কাদম্বিনী ছাড়া তো আর কেউ জানে না। জানার কথাও নয়। আর কাদম্বিনী নিশ্চয়ই কিছু বলেনি, তাহলে তার মা ব্যাপারটা জানবেন কি করে?

অন্নপূর্ণা এসে ঠাকুরঘরে ঢুকল। পরনে তার একটি লালপাড় গরদের শাড়ি। প্রত্যূষে স্নান করেই অন্নপূর্ণা একেবারে গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিল। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্যাপারটা তার স্বামীর অগোচরে আর থাকবে না, তা সে জানত এবং তখন সে স্বামীর সামনে গিয়ে কেমন করে দাঁড়াবে তাই ভাবছিল। তার স্বামীকে সে চেনে। জেরায় জেরায় তাকে একেবারে জেরবার করে দেবে। পূজোর ঘরে তখন প্রতিমুহূর্তেই অন্নপূর্ণা তার স্বামীর ডাক শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিল। এই বুঝি তার স্বামী ঠাকুরঘরে এসে প্রবেশ করেন!

—মামীমা!

কাদম্বিনীর ডাকে অন্নপূর্ণা তাকাল তার দিকে।

—মামাবাবু তোমাকে ডাকছেন মামীমা।

—তোর মামাবাবু কোথায়? ভয়ে ভয়ে শুধায় অন্নপূর্ণা।

—তাঁর ঘরে।

কাদম্বিনী সংবাদটা দিয়েই ঠাকুরঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অন্নপূর্ণা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং পায়ে পায়ে এসে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। রাধারমণ তখনো ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।

—আমাকে ডেকেছ?

—হ্যাঁ—ঘুরে দাঁড়ালেন রাধারমণ একেবারে স্ত্রী অন্নপূর্ণার মুখোমুখি—সুহাস কোথায়?

—সুহাস!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মেয়ে সুহাস! কোথায় সে?

—কোথায় আবার? বাড়ির মধ্যেই কোথায়ও হয়ত আছে। দেখব?

—না, দেখতে হবে না—সে বাড়ির মধ্যে কোথায়ও নেই।

—নেই ?

—না নেই। আর কথাটা তুমি খুব ভাল করেই জান বড়বৌ। মা কোথায় ?

—মা ?

—হ্যাঁ মা, কোথায় তিনি ?

তিনি তো— কি বলবার চেষ্টা করে আমতা আমতা করে অন্নপূর্ণা।

কিন্তু রাধারমণ স্ত্রীকে থামিয়ে দেন। বলেন, তুমি আর মা ভেবেছ সুহাসকে অন্যত্র কোথায়ও সরিয়ে দিলেই আমার কাজে তোমরা বাধা দিতে পারবে! তা পাববে না। সুহাসের আবার আমি বিয়ে দেবই। আশ্চর্য, নিজে মেয়েমানুষ হয়ে একটা মেয়ের দুঃখ তুমি বুঝলে না ? আর শুধু কি তাই, তুমি না তার মা বড়বৌ, তুমি না তাকে গর্ভে ধরেছ।

—এ অন্যায়, এ পাপ—

—না, অন্যায়ও নয়, পাপও নয়—অন্ধ কুসংস্কারে তোমাদের দৃষ্টিও অন্ধ হয়ে গিয়েছে। নচেৎ বুঝতে পারতে, এতে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কিছু ছিল না।

অন্নপূর্ণা একটা কথাও বলে না। মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেবল মনে মনে গৃহদেবতা রাধামোহনের কাছে প্রার্থনা জানায়, ঠাকুর, মা যেন নিরাপদে নবদ্বীপ ধামে পৌঁছে যান।

—বল তারা কোথায় ? রাধারমণ আবার প্রশ্ন করলেন।

—আমি জানি না।

—জানো। বল !

—মা রাত থাকতে সুহাসকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন যেন।

—বড়বৌ ! পারবে তুমি ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে ?

—আমি কিছু জানি না। বলে অন্নপূর্ণা আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

•

বেলা তৃতীয় প্রহরের শেষে নবদ্বীপের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। গঙ্গার ঘাটে তখনো স্নানার্থীদের ভিড় আছে।

শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি এই নবদ্বীপধাম। গোরাচাঁদের এই পদধূলি-স্পর্শে এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা পুণ্যতীর্থের গৌরব ধারণ করে আছে। গঙ্গার ঘাটে একদল লোক খোলকরতাল ও খঞ্জনী সহযোগে কীর্তন করছে।

ভবতারিণী উঠে দাঁড়ালেন। সুহাসিনী কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে এখন একেবারে নীরব। আলুলায়িত কুন্তলে সে স্তব্ধ হয়ে পাটাতনের উপরে বসে ছিল। ভবতারিণী আনন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন—আনন্দ, তুমি এই নৌকার উপরেই অপেক্ষা কর। কাছেই গুরুদেবের গৃহ, তাঁর গৃহে আমি আগে একাই যাব, ফিরে আসতে আমার বেশী দেরি হবে না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসব।

ভবতারিণী নৌকা থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন।

ভবতারিণী দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে সুহাসিনী মৃদু কণ্ঠে ডাকল, আনন্দ দাদা!

—কিছু বলছ সুহাস?

—তুমি আমাকে বাঁচাও আনন্দ দাদা—

আনন্দচন্দ্র অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুহাসিনীর মুখের দিকে। কোন জবাব দেয় না।

—ঠাকুরমা একবার আমাকে ওঁর গুরুর ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে আর জীবনে আমি মুক্তি পাব না!

—সুহাস, একটা কথার জবাব দেবে?

—কি?

—তোমার বাবা তোমার যে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন তা তো তুমি জানতে?

—জানতাম, বাবাই আমাকে বলেছিলেন।

—এ বিবাহে তোমার মত আছে? লজ্জা করো না, আমাকে বল!

—আনন্দ দাদা!

—বল।

—এ বিবাহ, মানে বিধবার বিবাহ কি পাপ?

—না।

—পাপ নয় তুমি বলছ আনন্দ দাদা!

—না, পাপ হলে কি বিদ্যাসাগরমশাই বিধবা-বিবাহের বিধান দিতেন? সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত।

—তবে?

—কি তবে?

—ঠাকুরমা ঐ কথা বলছেন কেন?

—ঠাকুরমা কেন অনেক লোকই—আজ সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তাদের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। ঠাকুরমার কথা থাক, আমি যা জিজ্ঞাসা করছিলাম তার জবাব দাও। তোমার এ বিবাহে মত আছে তো?

—আছে।

—ঠিক বলছ ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেবো না, যা করবার আমিই করব।

—কি করবে ?

—শোন, আপাতত তুমি কত্তামার বিরুদ্ধাচরণ করো না। কান্নাকাটি করো না। উনি তোমাকে যা বলেন করতে তাই করবে।

—কিন্তু আনন্দ দাদা—সুহাসিনীর কণ্ঠস্বরে একটা দ্বিধা। কি যেন সে বলবার চেষ্টা করে।

—আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব সুহাস। আনন্দচন্দ্র বলে।

—তুমি আমাকে সত্যিই বাঁচাবে তো আনন্দ দাদা ? এখানে থাকলে আমি মরে যাব !

—হ্যাঁ শোন, আজ রাতটা চুপচাপ থাক। কাল রাত্রে তৃতীয় প্রহরে তুমি বাড়ির বাইরে চলে আসবে, পারবে না কোন এক ফাঁকে ?

—পারবো।

—পারবে তো ?

—হ্যাঁ, আমি জানি কত্তামার গুরুগৃহে এখানে বেশী লোকজন নেই। কত্তামার গুরুদেব, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর এক অন্ধ বিধবা কন্যা—আমি যেখানেই থাকি না কেন ঠিক বের হয়ে আসব।

—তবে সেই কথাই রইল। আমি তোমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব কথা দিলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভবতারিণী ফিরে এলেন, সঙ্গে তাঁর গুরুদেব। বয়সে প্রৌঢ়, সৌম্যশান্ত দেখতে তারিণীচরণ। গুরুদেব তারিণীচরণ এসে সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো মা জননী আমার—

একান্ত আজ্ঞাবহের মত সুহাসিনী উঠে গিয়ে ভবতারিণীর গুরুদেবের চরণের ধূলি নিয়ে প্রণাম করল।

—বেঁচে থাকো মা। ধর্মে মতি হোক। এ তো বেশ মেয়ে ভব, এর জন্য তোমার এত চিন্তা ?

ভবতারিণী গুরুদেবকে সব কথাই বলেছিলেন। তিনি শুনে বলেছিলেন, বেশ করেছ, মা, ভাল কাজই করেছ, বিধবার পুনর্বিবাহ মহাপাপ !

সকলে এসে ভবতারিণীর গুরুগৃহে প্রবেশ করল।

নিকানো ঝকঝকে আঙ্গিনা, একধারে তুলসীমঞ্চ, খানতিনেক ঘর—তিন পোতায় খড়ের চাল—মাটির দেওয়াল—মাটির মেঝে।

গুরুপত্নী এসে সুহাসিনীর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। পরে ভবতারিণী বললেন, আনন্দ, তুমিও হাতমুখ ধুয়ে নাও। আজ বিশ্রাম কর—কাল ফিরে যেয়ো।

—না কত্তামা, আমি একবার গঙ্গার ঘাটে যাব। আমি মাঝিকে বলে আসি—ঐ নৌকাতেই কাল সকালে আবার আমি ফিরে যাব।

—বেশ, তাহলে সেই ব্যবস্থাই কর।

আনন্দ চলে গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে।

মাঝিরা তখন রান্না চাপিয়েছে গঙ্গার ঘাটেই।

—মাঝি! আনন্দ ডাকল।

—কী বলছ কর্তা?

—আজকের আর কালকের দিনটা তোমরা বিশ্রাম নাও। কাল শেসরাতে ফিরে যাব। জোয়ার কখন আসবে জানো?

—রাত তিন প্রহরে।

—ঠিক আছে, আমি ঠিক সময়ে আসব—কাল শেষ রাত্রেই আমি ফিরে যেতে চাই—

—ঠাকরুণ যাবেন না?

—না, আমি একা যাব। তোমরা তাহলে প্রস্তুত থেকো।

—থাকব।

২

আনন্দচন্দ্রের কাছ থেকে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পেয়ে সুহাসিনী চুপ করে যায়, শান্ত হয়ে থাকে সন্ধ্যার দিকে। সুহাসিনী বড় ঘরটার মধ্যে সন্ধ্যার পরে চুপ করে বসে ছিল—আনন্দ দাদা যখন কথা দিয়েছে, নিশ্চয়ই এই বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবে। সে শান্ত হয়ে যাওয়ায় ভবতারিণীও কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তাকে সর্বক্ষণ আর চোখে চোখে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ভবতারিণী সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে গিয়েছেন। ঘরের মধ্যে একটা মৃদু পদশব্দ পেয়ে সুহাসিনী দরজার দিকে তাকাল। ঘরের কোণে যে ঘৃতপ্রদীপটি জ্বলছিল

তারই মৃদু আলোয় সে দেখল একটি তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকছে—পরনে তার একটা কালোপাড় শাড়ি, হাতে দু'গাছি শাঁখা, মাথার চুল বুকে ও পিঠের উপরে ছড়িয়ে আছে।

—কই গো, কোথায় তুমি ভাই!

তরুণীর প্রশ্নে সুহাসিনী জবাব দিল, কে তুমি?

—আমি! বলতে বলতে তরুণী আরো কয়েক পা এগিয়ে আসে, বলে, তা কোথায় তুমি? আমি যে ভাই অন্ধ, দেখতে পাই না তো!

—অন্ধ! সুহাসিনী বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, আমি তোমার কত্তামার গুরুকন্যা রাধা। তোমার নাম তো সুহাসিনী, তাই না?

—হ্যাঁ। সুহাসিনী উঠে গিয়ে রাধার একখানি হাত ধরল।

রাধা সুহাসিনীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছ ভাই, তাই না—

—ভয়!

—হ্যাঁ, ভয়। কিন্তু এখানে তুমি এলে কেন বল তো?

—কত্তামা নিয়ে এসেছেন—

—পালাও, তুমি পালিয়ে যাও। চাপা সতর্ককণ্ঠে বললে রাধা।

—পালাব!

—হ্যাঁ, না হলে বিপদে পড়বে।

—বিপদ? কিসের বিপদ?

—তুমি কি কিছুই জান না—কিছুই শোননি?

—না তো!

—তোমার কত্তামার গুরুদেব—আমার বাবার সম্পর্কে কিছুই শোননি?

—না।

—আমার বাবা—পিতৃনিন্দা মহাপাপ, তবুও বলছি,—একটা চরিত্রহীন লম্পট—

—কি বলছ রাধাদিদি!

—হ্যাঁ, তোমাকে সাধন-সঙ্গিনী করবেন ঠিক করেছেন—

—সাধন-সঙ্গিনী। তার মানে কি?

—কেউ কেউ সাধন করবার সময় একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গিনী করে—তাকে তার স্ত্রীর আচার পালন করতে হয়, বুঝেছ?

রাধার কথা শুনে সুহাসিনী যেন একেবারে পাথর হয়ে যায়। এ কোথায় নিয়ে এল তাকে কত্তামা!

সুহাসিনীকে চুপ করে থাকতে দেখে রাধা বললে, তাই তো বলছি তুমি পালাও।

—কেমন করে পালাব রাধাদি!

—তোমাদের সঙ্গে শুনলাম একটি ছেলে এসেছে—

—আনন্দ দাদার কথা বলছ?

—হ্যাঁ। কে হয় তোমার? কোন আত্মীয়? ঐ ছেলেটি যে তোমাদের সঙ্গে এসেছে শুনেছি—

—না, আত্মীয় তো নয়—

—তবে? কে ঐ ছেলেটি?

—আমাদের কলকাতার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে। খুব ভাল আনন্দ দাদা। আমাকে খুব ভালবাসে।

—ওকে বললে ও তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারবে না?

—কিন্তু তোমার বাবা…

—সে ভাবনা আমার। আমি তোমাকে আজ রাতেই সবাই যখন ঘুমাবে, খিড়কি-দরজাপথে বাড়ি থেকে বের করে দেব। তার সঙ্গে তুমি কলকাতায় চলে যাও—এখানে থেকো না। এখানে থাকলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

রাধার কথা শুনেও কিন্তু আনন্দ দাদার পরিকল্পনার কথাটা সুহাসিনী রাধার কাছে প্রকাশ করে না। সুহাসিনী কেবল বললে, তুমি বের করে দেবে আমাকে খিড়কির দরজা দিয়ে?

—হ্যাঁ, দেব। একবার বুঝতে না পেরে একজনের সর্বনাশ আমি করেছি, আর তা হতে দেব না। আমার বাবা—তা হয়েছে কি? তোমার কত্তামা ঠিক করেছেন—বাবাকে বলছিলেন, আমি আড়াল থেকে শুনেছি, উনি কিছুদিনের জন্য নাকি বাবার পরামর্শমত তোমাকে এখানে রেখে যাবেন আমাদের এই বাড়িতে। কথাটা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি ওঁর আসলে কি মতলব! আগে এক শিষ্যের কুমারী কন্যার যে সর্বনাশ করেছিলেন, তোমারও তেমনি সর্বনাশ করবার ওঁর মতলব। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা একরাত্রে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করে—

সুহাসিনীর হাত-পা তখন ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, রাধাদি, তুমি আমাকে বাঁচাও!

—বাঁচাব। আর বাঁচাব বলেই তো এসেছি—তুমি কিছু ভেবো না সুহাসিনী।

সুহাসিনী রাধার পায়ের উপর পড়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে, রাধাদি!

—আহা ওঠ ওঠ, মেয়েমানুষ হয়ে আর একজন মেয়েমানুষকে কলঙ্ক আর লজ্জার হাত থেকে না বাঁচালে আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না। এ জন্মটা তো অন্ধ হয়েই কেটে গেল—বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে সস্নেহে রাধা সুহাসিনীকে তুলে বুকের উপর টেনে নেয়।

—রাধাদি!

—কি ভাই?

—তোমার বিয়ে হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তোমার স্বামী—

—শ্রীগৌরাঙ্গ। অন্ধ মেয়েকে এ দেশে হিন্দুর সমাজে কে গ্রহণ করবে ভাই! তাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণেই নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর প্রসাদী মালা গলায় তুলে নিয়েছি—সেই তিনিই আমার স্বামী।

সুহাসিনী তখন কাঁদছে। অবিরল অশ্রুধারায় তার দু'চোখের কোণ ভেসে যাচ্ছে।

রাধা বললে, কাঁদিসনে বোন। একটা কথার জবাব দিবি?

—কি রাধাদি?

—শুনছিলাম তোর কত্তামা বাবাকে বলছিলেন, তোর বাবা তোর আবার বিবাহ দেবেন মনস্থ করেছেন বলেই নাকি তোকে নিয়ে উনি এখানে পালিয়ে এসেছেন!

—হ্যাঁ।

—হিন্দুঘরের বিধবার কি আবার বিবাহ হয়?

—জানি না, তবে বাবা বলেছেন—

—কি?

—কলকাতায় কে এক মহাপুরুষ আছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর নাম—মস্ত বড় পণ্ডিত, অনেক পড়াশুনা করেছেন, অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে নাকি তিনি বলেছেন—

—কি বলেছেন?

—এতে নাকি কোন পাপ নেই।

—বলেছেন তিনি?

—হ্যাঁ। দুজনের বিয়েও হয়েছে—

—সত্যি বলছিস ?

—আমি শুনেছি।

—কি জানি, জানি না। মুখ্যু মেয়েমানুষ আমি, ধর্ম আর শাস্ত্রের কিই বা জানি, তায় আবার অন্ধ! তবে আমার মন বলে এ পাপ—

—পাপ!

—হ্যাঁ, পাপ। বিয়ে আবার তুই করিস না বোন—

—বাবা কি তবে অন্যায় করছেন ?

—জানি না, যাক ওসব কথা। বাবা একটু আগে বের হয়েছেন—ফিরতে দু'এক ঘণ্টা হবে। মা রান্নাঘরে, তুই যা বাইরের ঘরে, সেই ছেলেটি আছে—তাকে গিয়ে বল, যেন আজ রাত্রেই তোকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে!

—কেউ যদি দেখে ফেলে ?

—কে দেখবে ? কেউ দেখবে না। যা তোর ভয় নেই।

সুহাসিনী তখন মনে মনে স্থির করে ফেলেছে, অভাবনীয় সুযোগ যখন এসেই গিয়েছে তখন কাল রাত্রের জন্য সে আর অপেক্ষা করবে না। আনন্দ দাদাকে সে বলবে আজ রাত্রেই তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। আর ঐ চিন্তা ছাড়া তখন তার মনে আর অন্য কোন চিন্তাই স্থান পায় না।

—আমি যাব আনন্দ দাদার কাছে ? সুহাসিনী বললে।

—যা। রাধা বললে।

—কোন্ ঘরে আনন্দ দাদা আছে আমি তো জানি না রাধাদি।

—ঘর থেকে বের হয়ে আঙিনা, তারই পূর্বদিকের ঘরে তোর আনন্দ দাদা আছেন। চল বরং আমি তোকে পৌঁছে দিই—

—সেই ভাল রাধাদি। তুমি আমাকে পৌঁছে দাও।

অন্ধ রাধা ঘর থেকে বের হয়ে আগে আগে চলল, তাকে অনুসরণ করে সুহাসিনী। অবাক হয়ে যায় সুহাসিনী অন্ধরাধার স্বচ্ছন্দগতি দেখে—সে যেন চক্ষুষ্মানের মত হেঁটে চলেছে। আঙিনা পার হয়ে দাওয়ায় উঠল রাধা। হাত দিয়ে অনুভব করে খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল। পশ্চাৎ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল সুহাসিনী—ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, ছোট একটা দেওয়ালগিরি—সে আলো তেমন পর্যাপ্ত নয়।

রাধা বললে, যা ভিতরে গিয়ে দেখ।

রাধার গলা বোধ হয় আনন্দচন্দ্র শুনতে পেয়েছিল। ঘরের একধারে চৌকির উপরে বসেছিল আনন্দচন্দ্র। সে সুহাসিনীর কথাই ভাবছিল—সুহাসিনীকে সে

তো বলল, তাকে সে এখান থেকে উদ্ধার করে কলকাতায় নিয়ে যাবে, কিন্তু তারপর ? কত্তামা ভবতারিণী দেবী যখন ব্যাপারটা জানতে পারবেন, তাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন না। মল্লিকমশাই হয়ত কিছু বলবেন না, বরং খুশিই হবেন সুহাসিনীকে ফিরে পেয়ে, কিন্তু ভবতারিণীর আক্রোশের হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাবে কেমন করে ? কেবল কি কত্তামা ভবতারিণী দেবীই, মল্লিক মশাইয়ের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীও এর সঙ্গে জড়িত, তিনি যখন শুধাবেন, এ কাজ কেন সে করল—কি জবাব দেবে সে তাঁকে ? তাঁকে যে নিজের মায়ের মতই শ্রদ্ধা করে আনন্দচন্দ্র !

তা ছাড়া ওদের পারিবারিক ব্যাপারে কেনই বা সে নিজেকে জড়াচ্ছে ! সামান্য একজন আশ্রিত সে মল্লিক-গৃহে। শেষ পর্যন্ত ওদের পরস্পরের কলহের মধ্যে পড়ে যদি তাকে মল্লিক-গৃহের আশ্রয় ছাড়তে হয়, তার পড়াশুনার কি হবে ! সামনের বছরে সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে—আশ্রয়ের একটা ব্যবস্থা না থাকলে সে পড়াশুনাই বা করবে কোথায় থেকে ? বাবা ভারতচন্দ্রও হয়ত ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট হবেন। বলবেন হয়ত, কি দরকার ছিল তোমাদের ওদের পারিবারিক গোলমালের মধ্যে নিজেকে জড়াবার !

কিন্তু আবার অন্যদিকে আছেন স্বয়ং মল্লিকমশাই। তিনি ব্যাপারটা জানতে পারলে হয়ত তাকেই দোষারোপ করবেন। এ যে হল শাঁকের করাত—দুদিকেই কাটে।

—আনন্দ দাদা ! দরজার বাইরে থেকে মৃদু চাপা কণ্ঠে ডাকল সুহাসিনী।

—কে ? চমকে ওঠে আনন্দচন্দ্র।

—আমি সুহাস। বলতে বলতে সুহাসিনী এসে ঘরে ঢুকল আনন্দচন্দ্রের গলার সাড়া পেয়ে।

—কি ব্যাপার সুহাস, তুমি ?

—আজ আমাকে নিয়ে চল কলকাতায় আনন্দ দাদা—

—ছিঃ ছিঃ ! খুব অন্যায় হয়েছে তোমার এভাবে এ ঘরে আসা। যদি কেউ দেখে ফেলে থাকে—

—ওর কোন দোষ নেই, আমিই ওকে বলে নিয়ে এসেছি এ সময়। বলতে বলতে রাধা এসে ঘরে ঢুকল।

—আপনি !

জবাব দিল সুহাসিনীই। বললে, ও রাধাদি—

—রাধাদি ?

—হ্যাঁ, কত্তামার গুরুকন্যা।

—আপনি আজ রাত্রেই ওকে নিয়ে চলে যান। রাধা বললে, নচেৎ এখানে থাকলে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে!

—কি বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি। আপনি সব ব্যবস্থা করুন—মধ্যরাত্রে ওকে আমি খিড়কির দরজায় পৌঁছে দেব, আপনি সেখানে অপেক্ষা করবেন—

—কিন্তু আপনার বাবা—কত্তামা—

—আপনাকে যা বলছি তাই করুন। মনে থাকে যেন, ঠিক মধ্যরাত্রে—এস সুহাস। কথাগুলো বলে রাধা আর দাঁড়াল না, সুহাসিনীর হাত ধরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আর আনন্দচন্দ্র নির্বাক, সেখানে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। কত্তামার গুরুকন্যা স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সুহাসকে নিয়ে তাকে আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যেতে বলেছে, নচেৎ এখানে থাকলে নাকি তার সর্বনাশ হয়ে যাবে! কিসের সর্বনাশ, কিছুই বুঝতে পারে না আনন্দচন্দ্র।

আনন্দচন্দ্র মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সত্যিই যেন।

আনন্দচন্দ্র আর দ্বিধা করে না, সুহাসকে নিয়ে চলে যাওয়াই স্থির করে। যা হবার হবে, সে সুহাসকে নিয়ে আজ রাত্রেই চলে যাবে। কিন্তু মাঝিদের বলে রেখেছে সে কাল রাত্রে যাবে! আনন্দচন্দ্র বের হয়ে পড়ল গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে তখুনি আবার। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, আনন্দচন্দ্র গায়ের র‍্যাপারটা ভাল করে জড়িয়ে নিল। পথে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই—অন্ধকার, চাঁদ উঠবে আজ মধ্যরাত্রির পরে।

মাঝিরা রাত্রের আহার প্রস্তুত করছিল।

জলের ধারে গিয়ে ডাকল, মাঝি—অ মাঝি!

—কেডা ডাকতিছো?

—মাঝি, আমি—

বুড়ো মাঝি এগিয়ে এল, কয়েন কত্তা—কি কইতেছেন!

—তোমাকে বলেছিলাম কাল শেষরাত্রে যাব, কিন্তু মনে পড়ে গেল একটা জরুরী কাজ আছে কলকাতায়—আজ রাত্রেই যাব ভাবছি—জোয়ার আসবে কখন মাঝি?

—শেষ পহর রাতে—

—যেতে পারবে না?

—ক্যান যাতি পারব না—অনুকূল হাওয়া আছে, পাল খাটায়ে দেব নে—

—তবে সেই কথাই রইল, আমি ঠিক সময়ে আসব—

—কত্তামা যাবেন না তো ?

—না। তবে আর একজন যাবেন—

—ঠিক আছে।

আনন্দচন্দ্র সব ব্যবস্থা করে ফিরে এল।

মধ্যরাত্রির কিছু পরেই আনন্দচন্দ্র সুহাসিনীকে নিয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হল। নিজের র‍্যাপারটা সুহাসিনীর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছিল তার। সাবধানের মার নেই !

—মাঝি !

—আয়েন কত্তা—

ওরা দুজনে নৌকায় উঠে বসল। সুহাসিনী ছৈয়ের ভিতর গিয়ে বসল। আনন্দচন্দ্র বাইরেই পাটাতনের উপরে বসল।

—নাও ভাসাই কত্তা ? মাঝি শুধাল।

—হ্যাঁ, পাল তুলে দাও।

পালে হাওয়া লাগতেই তরতর করে নৌকা ভেসে চলল। কাল প্রত্যুষে উঠে ভবতারিণী যখন ওদের কাউকে দেখতে পাবেন না ! আনন্দচন্দ্র মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দেয়, যা হবার হবে, আর ভাবতে পারে না আনন্দচন্দ্র। মাথার উপরে আকাশে অগণিত নক্ষত্র। গঙ্গার দুই তীর অন্ধকারে ঝাপসা। মধ্যে মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী দু'একটা কুটিরের মৃদু আলোর শিখা দেখা যায়।

কলকল ছলছল জলের শব্দ। মাঝি গান ধরে :

কোন্ দেশেতে বসতি কন্যা
তোমার কোন্ দেশেতে ঘর—
আমি সারা জীবন খুইজা মলাম রে—

অনুকূল স্রোত ও পালে হাওয়া পেয়ে নৌকা ভোর-নাগাদই বড়বাজারের গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড়ল।

ভাড়ার টাকা ফিরে যাবার আগেই ভবতারিণী আনন্দচন্দ্রকে দিয়ে দিয়েছিলেন। মাঝিকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আনন্দচন্দ্র সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, চল সুহাস !

—আমার বড্ড ভয় করছে আনন্দ দাদা—

—ভয় কিসের, চল !

দুজনে হাঁটতে শুরু করে মল্লিক-গৃহের দিকে ।

৩

প্রত্যুষের আলো তখনো ভাল করে চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একটা আলোছায়ার লুকোচুরি চলেছে ।

গৃহের যত নিকটবর্তী হচ্ছে সুহাসিনী, তার বুকের মধ্যে কম্পনও যেন বাড়তে থাকে। তার বাবা অবিশ্যি তাকে দেখলে খুশীই হবেন। কিন্তু তার মা ! মার আক্রোশ থেকে সে মুক্তি কি পাবে ? যাক গে, যা হবার হোক। ভাগ্যে রাধাদির সাহায্য সে পেয়েছিল ! নচেৎ কর্তামার গুরুগৃহ থেকে কি সে এত সহজে মুক্তি পেত ? কি সাংঘাতিক কথা ! সাধনের সঙ্গিনী হতে হত তাকে কর্তামার গুরুদেবের !

ব্যাপারটা যদিও এখনো সে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেনি, কিন্তু রাধাদির কথা শুনে এটুকু বুঝেছিল, তার সমূহ সর্বনাশ হত। সেই পরিকল্পনাই করেছিলেন কর্তামার গুরুদেব ।

সেই সর্বনাশের হাত থেকে তো সে উদ্ধার পেয়েছে রাধাদির কৃপায় ।

বহির্দ্বারের কাছাকাছি এসে আনন্দচন্দ্র বললে, সুহাস, তুমি এখানে দাঁড়াও—আমি চট করে একবার ভিতরে ঢুকে দেখে আসি আশেপাশে কেউ আছে কিনা ।

—এক কাজ করলে হত না আনন্দদাদা ! সুহাসিনী বললে ।

—কি ?

—চল না সদর দিয়ে না গিয়ে খিড়কিপথে প্রবেশ করি !

—ঠিক। কথাটা তুমি মন্দ বলোনি। তাই চল, ওদিকটায় এখন এসময়ে কেউ থাকবে না ।

দুজনে খিড়কির দ্বারের দিকেই অগ্রসর হল ।

আনন্দচন্দ্র প্রাচীর টপকে ভিতরে গিয়ে খিড়কির দ্বার খুলে দিল। তারপর ডাকল, এস সুহাস !

দুজনে আবছা আলোছায়ায় আম-কাঁঠালের বাগানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হল ।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই বুঝি সন্ধ্যা হয়। ভবতারিণী নেই, ওই অন্নপূর্ণাই রাত্রিশেষে শয্যাত্যাগ করে রাধামোহনের কাজ করবার জন্য একটা গামছা কাঁধে ফেলে দীঘিতে স্নান করতে আসছিল। দূর থেকে তার নজরে

পড়ে গেল ওরা—আনন্দচন্দ্র আর সুহাস। থমকে দাঁড়ায় অন্নপূর্ণা—এত রা
বাড়ির পশ্চাতে বাগানের মধ্যে কারা!

দু'পা এগিয়ে যায় অন্নপূর্ণা।

—কে?

আনন্দচন্দ্রও অন্নপূর্ণাকে দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে
দাঁড়িয়ে গিয়েছিল থমকে।

সুহাসিনীও মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—কে? অন্নপূর্ণা আরো কাছে এদের এগিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে।

—সুহাস! আনন্দ! তোমরা?

আনন্দ ও সুহাসিনী দুজনেই নির্বাক। দুজনেই যেন পাথর।

আনন্দই কথা বললে, হ্যাঁ, আমরা—

—মা কোথায়? অন্নপূর্ণার প্রশ্ন।

—কত্তামা আসেননি।

—মা আসেননি!

—না।

—তিনি তোমাদের পাঠিয়ে দিলেন? তোমরা নবদ্বীপধামে যাওনি আনন্দ

—গেছিলাম। সুহাসকে নিয়ে আমি চলে এসেছি।

—চলে এসেছ? কেন?

সুহাস পায়ে পায়ে অন্দরের দিকে এগুচ্ছিল। হঠাৎ অন্নপূর্ণা ডাক
সুহাস, দাঁড়া!

মায়ের কঠিন নির্দেশে সুহাস দাঁড়িয়ে পড়ে।

অন্নপূর্ণা এগিয়ে এসে সুহাসের একখানা হাত কঠিন মুষ্টিতে চেপে ধর
সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিস নিশ্চয়ই মার অজান্তে?

—হ্যাঁ।

—কেন? কেন এসেছিস হতভাগী, বল্?

—ওখানে থাকলে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত।

—সর্বনাশ! সর্বনাশ হয়ে যেত? ঠিক আছে, আয় আমার সঙ্গে।
মুঠিতে সুহাসিনীর হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে অন্নপূর্ণা অন্দ
দিকে অগ্রসর হয়।

আনন্দচন্দ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

আরো অনেকক্ষণ বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল আনন্দচন্দ্র। তা

অন্দরের দিকে অগ্রসর হল।

অন্নপূর্ণার আক্রোশ কি ভাবে যে সে এড়াবে বুঝতে পারে না আনন্দচন্দ্র। জবাবদিহি তাকেও একটা দিতে হবে। হয়ত তাকে এই গৃহই ছাড়তে হবে। এই শহরে সে তারপর কোথায় আশ্রয় পাবে? কোথায় কোন্ আশ্রয়ে থেকে পড়াশুনা করবে?

আনন্দচন্দ্র যেন আর ভাবতে পারে না। বহির্মহলে নিজের ঘরে ঢুকে শয্যাটা বিছিয়ে সে শয্যায় আশ্রয় নিল।

আকাশ-পাতাল চিন্তা তাকে গ্রাস করে। আনন্দচন্দ্র যেন আর ভাবতে পারে না।

ঐ মল্লিকগৃহের মাটির নীচে একটা গুপ্তকক্ষ ছিল। রাধারমণের পিতা-ঠাকুর যখন ঐ গৃহ নির্মাণ করেন, কলকাতা শহর তখন বর্গীর ভয়ে তটস্থ। হঠাৎ যদি বর্গীরা আক্রমণ করে, তাহলে পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য ঐ মাটির নীচে গুপ্তকক্ষটি তৈরি করেছিলেন। তৈরিই করা হয়েছিল মাটির নীচে ঐ কক্ষটি—ব্যবহৃত হয়নি আজ পর্যন্ত। প্রয়োজনও হয়নি বর্গীর হাঙ্গামার জন্য শেষ পর্যন্ত। কক্ষটিতে তালা দেওয়াই থাকত। এবং ঐ গুপ্তকক্ষটির কথা একমাত্র রাধারমণ, ভবতারিণী ও অন্নপূর্ণা ব্যতীত কেউ জানত না।

সুহাসিনীকে বাঁচাবার আর কোন পথ না পেয়ে ভবতারিণী যখন নবদ্বীপ-ধামে যাত্রা করলেন, তখনিই মনে পড়েছিল অন্নপূর্ণার গুপ্ত কক্ষটির কথা।

সুহাসিনী ঐভাবে ফিরে আসায় অন্নপূর্ণার সেই কক্ষটির কথাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণা তার সংকল্প মনে মনে স্থির করে ফেলে।

সুহাসিনীকে দেখতে পেলে একবার তার স্বামী, এ বিবাহে অন্নপূর্ণা বাধা দিতে পারবে না। এবারে তার স্বামী আরো সাবধান—আরো সতর্ক হবেন। তাছাড়া শাশুড়ীও নাই।

কিন্তু সুহাসিনীকে যদি ঐ গুপ্তকক্ষ সে বন্দিনী করে রাখতে পারে—তার স্বামী সুহাসিনীর এ গৃহে উপস্থিতির কথাটা জানতেও পারবেন না। ধারণাও করতে পারবেন না সুহাসিনীকে সে ঐ গুপ্তকক্ষে বন্দিনী করে রেখে দিয়েছে।

—মা, মাগো! আমার হাতটা ছাড়ো, আমি বলছি তোমার কথা আমি শুনব। তোমার কথার অবাধ্য হব না। সুহাসিনী বলতে থাকে।

অন্নপূর্ণা কন্যার কথার কোন জবাব দেয় না। কন্যার হাত শক্তমুষ্টিতে ধরে সোজা এসে নিজের শয়নকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল। ইদানীং সে পৃথক কক্ষে

শয়ন করত।

—বোস এখানে, আমি আসছি। বলে সুহাসিনীকে কক্ষের মধ্যে রেখে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণার সুবিধাই ছিল, কারণ তখনও রাধারমণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেননি। সেই যে সন্ধ্যায় বের হয়েছেন এখনো ফেরেননি। আজকাল একেবারে ভোর হলে ফেরেন গৃহে।

ভবতারিণীর কক্ষেই চাবির গোছাটা ছিল—একটা কুলঙ্গীর মধ্যে। মরিচা ধরা চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে ঐ কক্ষেরই একটা দরজা খুলে ফেলল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি অন্ধকারে নীচে নেমে গেছে। প্রদীপটা জ্বালাল অন্নপূর্ণা। প্রদীপ হাতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। গুপ্তকক্ষের বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে প্রদীপটা সিঁড়ির উপরে রেখে চাবির সাহায্যে মরিচা-ধরা বিরাট তালাটা খুলে ফেলল। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর কপাট খুলে গেল। অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা বন্ধ ভ্যাপসা গরম হাওয়া চোখেমুখে এসে ঝাপটা দিল অন্নপূর্ণার।

কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে প্রদীপ হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল অন্নপূর্ণা। কত বৎসর ঐ রুদ্ধকক্ষে কেউ পা দেয়নি। মেঝেটা স্যাঁতসেঁতে—ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা।

অন্নপূর্ণা ইতিপূর্বে জীবনে একবারই মাত্র ভবতারিণীর সঙ্গে ঐ কক্ষে পা দিয়েছিল। ছোট একটি কক্ষ—নীচু হতে উপরের দিকে গোটাচারেক ঘুলঘুলি দেওয়ালে বায়ু প্রবেশের জন্য ঐ কক্ষে—তা ছাড়া আলো-বাতাস চলাচলের আর কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রদীপটা কক্ষের এক কোণে রেখে আবার সোপান বেয়ে অন্নপূর্ণা উপরে চলে এল। দরজার শিকল খুলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে দেখল অন্নপূর্ণা—সুহাসিনী মেঝের উপরে বসে আছে।

সুহাসিনী মাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে মুখ তুলে তাকাল।

—আয় আমার সঙ্গে—

—কোথায়?

—আয় উঠে আয়—

সুহাসিনা তথাপি ওঠে না। যেমন বসেছিল তেমনিই বসে থাকে।

অন্নপূর্ণা সুহাসিনীর হাত ধরে টেনে তুলে বললে—চল।

সুহাসিনী কোন বাধা দেয় না। দেবার কোন চেষ্টাও করে না। মার সঙ্গে সঙ্গে এসে ভবতারিণীর কক্ষে প্রবেশ করল।

গুপ্তকক্ষের দরজার দিকে এগুতেই সুহাসিনী কেমন যেন ভীতকণ্ঠে বলে—

কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে ?

—চুপ কর—আয়—

—মা !

—আবার ! আয়—

—আমাকে কি তুমি মেরে ফেলবে মা ?

—আয়—

সুহাসিনী আর কথা বলে না। সে তার মায়ের হাতেই নিজেকে সঁপে দেয়। কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল সুহাসিনী ঘটনার আকস্মিকতায়। কোথায় তাকে তার মা নিয়ে চলেছে সে বোধশক্তিটুকুও যেন তখন তার লোপ পেয়েছে।

গুপ্তকক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে মেয়েকে অন্নপূর্ণা বাইরে থেকে কপাটে তালা লাগিয়ে দিল। বন্ধ দরজার এপাশ থেকে অন্নপূর্ণা বললে—কিছু ভাবিস না, কটা দিন এখন এখানে থাকবি তুই—আমি এসে দুবেলা তোকে খেতে দিয়ে যাব।

ভিতর থেকে সুহাসিনীর কোন সাড়া এল না।

মা চলে গেল। ভারী সেগুনকাঠের দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে।

কক্ষের এক কোণে প্রদীপটা মিটিমিটি জ্বলছে। সামান্য সেই প্রদীপের শিখা ঐ গুপ্তকক্ষের ঘনীভূত অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি। অন্ধকার যেন আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে এক কোণে কেবল একটা আলোর চক্র যেন।

বিমূঢ় সুহাসিনী কেমন যেন অসহায় বোবাদৃষ্টিতে সেই আলোর চক্রটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সমস্ত বোধশক্তিই যেন লোপ পেয়েছে, দেহ ও মন শিথিল। দীর্ঘকালের রুদ্ধ বাতাস কেমন যেন দম বন্ধ করে আনে কক্ষের মধ্যে সুহাসিনীর।

হাঁপ ধরছে বুকের মধ্যে। শ্বাস নিতে কেমন যেন কষ্ট হয়।

এ কোথায় কোন্ অন্ধকূপের মধ্যে মা তাকে বন্দিনী করে রেখে গেল! হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে উঠল সুহাসিনী—মা—মাগো—কোথায় তুমি ? মা—মা—মা—

ঐ ছোট কক্ষের নিরন্ধ্র দেওয়ালে দেওয়ালে যেন সেই ডাক আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু অন্নপূর্ণার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

—মাগো—ছেড়ে দাও আমায়—আমি প্রতিজ্ঞা করছি—বাবা আবার আমার বিয়ে দিতে চাইলেও আর আমি বিয়ে করব না ! মা—মা—মাগো !···

দাঁড়িয়ে ছিল সুহাসিনী—বসে পড়ল ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপরে। মা—মাগো !

বেলা তখন গোটা-দশেক হবে। ঐদিন দ্বিপ্রহরে নবদ্বীপধাম যাত্রা করবেন মনস্থ করেছিলেন রাধারমণ।

রাধারমণ নৌকার ব্যবস্থা করতে গঙ্গার ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন, আনন্দ এসে সামনে দাঁড়াল ঐ সময়।

—কিছু বলবে আনন্দ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আনন্দ ?

—আজ্ঞে !

—সুহাস কোথায় গেল জানো ?

—কেন, সুহাসিনীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি ?

—না তো ! কোথায় সে ?

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে কত্তামা সুহাসিনীকে নবদ্বীপধামে নিয়ে গিয়েছিলেন—

—সে কি ! কখন ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আজ প্রত্যুষেই তো তাকে নিয়ে আবার আমি ফিরে এসেছি কাকাবাবু !

—সুহাসকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছো ?

—হ্যাঁ, কত্তামার অজান্তেই তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

—বেশ করেছ—খুব ভাল কাজ করেছ—কিন্তু কই, সুহাসকে তো আমি দেখলাম না কোথায়ও অন্দরে !

—দেখেননি ?

—না।

—কাকীমার সঙ্গে সঙ্গে সেও অন্দরে গেছে। কাকীমা তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন অন্দরে।

রাধারমণ বিস্মিত হলেন। সুহাসিনী তবে কোথায় গেল ? অন্দরে থাকলে কি তিনি তার দেখা পেতেন না—সুহাসও কি তার কাছে আসত না ?

রাধারমণ রীতিমত যেন চিন্তিত হয়ে আবার অন্দরে ফিরে এলেন। কাদম্বিনীর সঙ্গে দেখা হল অন্দরে প্রবেশ করতেই।

—কাদু !

—কি মামাবাবু ?

—সুহাস কোথায় ?

—সুহাস ! তাকে কি কত্তামা ফিরিয়ে এনেছেন ?

—না, মা আনেননি—আনন্দ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে—পালিয়ে এসেছে।

—সুহাসকে নিয়ে পালিয়ে চলে এসেছে আনন্দ!

—হ্যাঁ।

—কে বললে?

—কেন, আনন্দই বললে। এইমাত্র তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বললে। সুহাস কোথায় দেখ তো, দীঘির ঘাটে নেই তো সুহাস?

—আমি তো একটু আগে দীঘির ঘাট থেকে আসছি, সেখানেও কেউ নেই দেখলাম—আনন্দ মিথ্যা কথা বলেনি তো!

—না, না—মিথ্যা বলবে কেন সে? হ্যাঁ রে, তোর মামী কোথায়?

—মামীমা তো মন্দিরে—

রাধারমণ আর দাঁড়ালেন না, সোজা চলে গেলেন নাটমন্দিরে।

নিত্য যে রাধামোহনের পূজা করে সেই পূজারী তখনো আসেনি। অন্নপূর্ণা পূজার যোগাড় করছিল।

দরজার বাইরে থেকেই রাধারমণ ডাকলেন—বড়বৌ!

অন্নপূর্ণার বুকের ভিতরটা সহসা যেন ঐ ডাক শুনে ধক করে ওঠে। এ সময় হঠাৎ স্বামী কেন?

—বড়বৌ!

স্বামী কি তবে কিছু জানতে পেরেছেন? অন্নপূর্ণা কিন্তু সাড়া দেয় না।

—বড়বৌ শুনছো—একবার বাইরে এস তো!

অন্নপূর্ণা বাইরে এল।—কি হয়েছে?

—সুহাস কোথায়?

—সুহাস!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সুহাস কোথায়,—কোথায় সে?

অন্নপূর্ণা একটু আগেই ভাবছিলেন, একফাঁকে আনন্দর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে, সে যাতে সুহাসিনীর কথাটা কাউকে না বলে বসে—

—কি হল, জবাব দিচ্ছ না! সুহাস কোথায়?

৪

স্ত্রীর নীরবতায় রাধারমণ যেন ধৈর্য হারান। চিৎকার করে ওঠেন আবার—কি হলো, সঙের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

—কি বলছো ! শান্ত গলায় বললে অন্নপূর্ণা, বেশ একটা দীর্ঘ শান্ত স্তব্ধতার পর।

—কি বলছি ? এতক্ষণে কথাটা আমার কানে প্রবেশ করল ? সুহাস কোথায় ? তাকে বাড়ির মধ্যে কোথায়ও দেখছি না কেন ? কোথায় গেল সে ?

—তার আমি কি জানি ?

—বড়বৌ, আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে জেনো ! বল সুহাস কোথায় ?

—আমি তো জানি না।

—জানো না ? তুমি জানো না সুহাস কোথায় ?

—না।

—তুমি আজ, আনন্দর সঙ্গে সুহাস নবদ্বীপ থেকে ফিরে আসার পরই, প্রত্যুষে তার হাত ধরে টানতে টানতে অন্দরে নিয়ে আসোনি ?

—কে বললে তোমায় ?

—আনন্দ বলেছে—

—আনন্দ মিথ্যা বলেছে।

—কি, কি বললে ? আনন্দচন্দ্র মিথ্যা বলেছে ?

—হ্যাঁ, সুহাস ফেরেনি নবদ্বীপ থেকে—আনন্দই একা ফিরে এসেছে।

—আনন্দ মিথ্যা বলেনি। মিথ্যা বলার ছেলে সে নয়। তাকে আমি চিনি—ভাল করেই চিনি। মিথ্যা বলছো তুমিই বড়বৌ !

—আমি সত্যই বলেছি।

—বড়বৌ, তুমি—তুমি তাকে মেরে ফেলনি তো !

অন্নপূর্ণা আর দাঁড়ায় না, মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

—বড়বৌ, শোন শোন—

অন্নপূর্ণার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

বিমূঢ় রাধারমণ কি করবেন বুঝতে পারেন না। স্ত্রী অন্নপূর্ণা যে মিথ্যা বলছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না রাধারমণের। কিন্তু এও বুঝতে পারছিলেন, অন্নপূর্ণার পেট থেকে কোন কথাই তিনি বের করতে পারবেন না। রাধারমণ আর দাঁড়ালেন না। তাঁর মাথার মধ্যে তখন চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত। কিন্তু কোথায়ই বা অন্নপূর্ণা সুহাসকে সরিয়ে ফেলতে পারে !

এই বাড়ির কোন কক্ষে তাকে লুকিয়ে রাখেনি তো ? কথাটা একবার রাধারমণের মনে হয়। রাধারমণ আবার বহির্মহলে ফিরে এলেন। আনন্দচন্দ্রের খোঁজ করলেন, কিন্তু তার দেখা পেলেন না। আনন্দচন্দ্র কলেজে চলে গিয়েছে।

অন্দর ও বহির্মহলের প্রত্যেকটি ঘর রাধারমণ তন্ন তন্ন করে কন্যার অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর একবারও মনে পড়লো না ঐ গৃহে ভূগর্ভের কক্ষটির কথা।

আর মনে পড়বেই বা কি করে! সে কক্ষ তো কখনো ব্যবহার করা হয়নি এবং তার কোন প্রয়োজনও হয়নি। সেটা তো সর্বদা তালাবন্ধই থাকে।

পরিশ্রান্ত হয়ে একসময় রাধারমণ নিজের শয়নকক্ষে এসে পালঙ্কের উপর বসে পড়লেন। একমাত্র চিন্তা তখন তাঁর—সুহাস কোথায় গেল? কোথায় সে যেতে পারে? অন্নপূর্ণা কোথায় তাকে সরিয়ে ফেলতে পারে?

বসেই ছিলেন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রাধারমণ। অন্নপূর্ণা দু'দুবার আহারের জন্য বলতে এসেছিল। রাধারমণ স্ত্রীর কথা কানেই তোলেননি। হঠাৎ কানে এল শ্যালক পরেশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর—মল্লিকমশাই আছেন নাকি?

—কে?

পরেশচন্দ্র এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

—মল্লিকমশাই, দিদিকে নিতে এসেছি—পিতাঠাকুরের বোধ হয় শেষ অবস্থা। এখন তখন।

—কি হয়েছে শ্বশুরমশাইয়ের?

—কয়েক দিন থেকেই একনাগাড়ে জ্বর হচ্ছিল, হঠাৎ গত পরশু থেকে সংজ্ঞাহীন। তাই দিদিকে নিতে এলাম।

—বলেছ তোমার দিদিকে?

—না, এখনো দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি। পরেশচন্দ্র বললে।

—তা কবে নিয়ে যেতে চাও ভগ্নীকে তোমার?

—আজই। পরেশচন্দ্র বললে—যদি অনুমতি করেন!

—বেশ নিয়ে যাও। শান্ত গলায় রাধারমণ জবাব দিলেন।

ছোট ভাইয়ের মুখে পিতার অসুস্থতার কথা শুনে অন্নপূর্ণা মহা ভাবনায় পড়ল। এখন কি সে করবে? গর্ভগৃহে সুহাসের কি ব্যবস্থা করবে?

পিতা গুরুতর অসুস্থ, শেষ সময়—একটিবার পিতাকে দেখতে যাবে না! কিন্তু সুহাস? সুহাসের কি ব্যবস্থা করবে? তবে কি সুহাসকে বের করে দেবে ঘর থেকে? বের করে দিলে সুহাসকে, তার বিবাহটা তো আটকাতে পারবে না অন্নপূর্ণা!

অন্নপূর্ণা কিছুই স্থির করতে পারে না। এসময় ভবতারিণী দেবী থাকিলে

কোন অসুবিধাই হত না। তিনি একটা পরামর্শ হয়ত বা দিতে পারতেন। স্থির হয়েছিল অপরাহ্ণ-বেলাতেই যাত্রা করবে অন্নপূর্ণা ভাইয়ের সঙ্গে।

অনেক ভেবে অন্নপূর্ণা শেষ পর্যন্ত স্থির করে, সুহাসকে গর্ভগৃহ থেকে বের করেই আনবে। অন্নপূর্ণা চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে গুপ্তদ্বারপথে গর্ভগৃহের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

চাবি দিয়ে তালা খুলল।

ঘর অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবে কি প্রদীপটা নিভে গেছে? কিন্তু প্রদীপে তৈল তো যথেষ্ট পরিমাণে ছিল!

অন্ধকারেই সোপান বেয়ে নীচে নামল অন্নপূর্ণা।

—সুহাস! ডাকল অন্নপূর্ণা।

কোন সাড়া নেই।

আবার ডাকল অন্নপূর্ণা—সুহাস, কোথায় তুই? বের হয়ে আয়, সুহাস!

না, কোন সাড়া নেই।

সাড়া দিচ্ছে না কেন মেয়েটা? তবে কি সুহাস ঘুমিয়ে পড়েছে? আবার ডাকল অন্নপূর্ণা—সুহাস, সুহাস! হঠাৎ অন্ধকারে একটা হিসহিস গর্জন শোনা গেল।

থমকে দাঁড়াল অন্নপূর্ণা। কিসের শব্দ!

একটা ক্রুদ্ধ হিসহিস গর্জন যেন অন্ধকারের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে।

অন্নপূর্ণা ভয় পেয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি উপরে এসে এক হাতে একটা লাঠি ও অন্য হাতে একটা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে পুনরায় সেই গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রদীপের আলোটা তুলে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়েই চমকে উঠল অন্নপূর্ণা—বিরাট একটা গোখরো সাপ!

ফণা তুলে হেলছে আর দুলছে, আর মেঝেতে পড়ে আছে সুহাসের দেহটা।

অস্ফুট একটা চিৎকার করে উঠল অন্নপূর্ণা—তারপরই পড়ি কি মরি করে এসে সোজা স্বামীর শয়নঘরে ঢুকল, ওগো শীগগিরী—শীগগিরী চল!

অন্নপূর্ণার চোখেমুখে আতঙ্ক।

—কি, কি হয়েছে বড়বৌ! তাড়াতাড়ি পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ালেন রাধারমণ।

—সর্বনাশ হয়েছে!

—কি, কি হয়েছে?

—সুহাস—

—কি, কি হয়েছে সুহাসের ?

—সুহাসকে বোধ হয় সাপে কেটেছে। বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে অন্নপূর্ণা।

—সাপে কেটেছে! কোথা থেকে এল সাপ ? কোথায় সুহাস ?

—গর্ভগৃহে। মাটির নীচে।

—সে কি !

—হ্যাঁ, তাকে তোমার দৃষ্টির আড়াল করে রাখবার জন্য সেই ঘরে আটকে রেখেছিলাম। চল চল—শীগগিরী চল—

রাধারমণ একটা লাঠি নিয়ে ছুটে গেলেন গর্ভগৃহে। পিছনে পিছনে অন্নপূর্ণা।

প্রদীপটা নিভে গিয়েছিল। সেটা দরজার সামনেই ফেলে রেখে অন্নপূর্ণা স্বামীর ঘরে ছুটে এসেছিল। প্রদীপটা আবার জ্বালিয়ে দুজনে সেই গৃহে প্রবেশ করল।

কিন্তু সাপটাকে দেখা গেল না। সুহাস অচৈতন্য—সারা অঙ্গ তার নীল হয়ে গিয়েছে, মুখ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

—এ কি করলে বড়বৌ ? এ তুমি কি করলে ? মেয়েটাকে এভাবে হত্যা করলে সাপের মুখে ফেলে দিয়ে ?

বুকে করে তুলে নিয়ে এলেন কন্যার অচৈতন্য বিষজর্জর দেহটা রাধারমণ। সারা বাড়িতে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

সাহেব ডাক্তারকে ডেকে আনলেন রাধারমণ।

সাহেব ডাক্তার সুহাসকে পরীক্ষা করে বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বললেন—সব ফিনিশ হইয়া গিয়াছে। I am sorry Baboo ! She is dead ! মৃত—কন্যা তোমার মৃত !

অন্নপূর্ণা চিৎকার করে কেঁদে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। আর বজ্রাহত বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে রইলেন সর্পদংশনে মৃত কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে রাধারমণ।

এদিকে মন্দির থেকে রাত্রে শয়নারতি দেখে এসে গুরুদেবের সামনে উপবেশন করলেন ভবতারিণী। সুহাসিনীর চিন্তাই তখন তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরছে।

পুত্রকে না জানিয়ে তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে রাতারাতি নৌকাযোগে নবদ্বীপধামে চলে এসেছেন।

পরের দিন প্রত্যুষে যখন পুত্র রাধারমণ জানতে পারবে সুহাসিনী গৃহে নেই এবং সেই সঙ্গে তিনি ও আনন্দচন্দ্র নেই—ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করে নিতে রাধারমণের কষ্ট হবে না। তারপর তাঁরা যখন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবেন, পুত্রের সমস্ত সন্দেহ হয়ত তাঁরই উপরে বর্তাবে।

পুত্রকে ভবতারিণী দেবী ভাল ভাবেই চেনেন।

অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির মানুষ রাধারমণ। তখন কি ভাবে তার প্রশ্নের জবাব দেবেন, সেটাও একটা চিন্তার বিষয়।

তাই ভবতারিণী গুরুদেবকে বলছিলেন—রাধারমণকে তো আপনি চেনেন গুরুদেব। সে যদি ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা অনুমান করতে পারে, আমাকে ও সেই সঙ্গে আপনাকে কাউকেই নিষ্কৃতি দেবে না।

—কোন চিন্তা করো না ভব, যা করবার আমিই করবো। ভাবছি সুহাসকে নিয়ে—

—কি প্রভু?

—কিছুদিনের জন্য কাটোয়ায় কালই চলে যাব। তুমি তো জান সেখানে আমার একটি আশ্রম আছে, কটা দিন সেখানেই থাকব।

—তারপর?

—তারপর যথা কর্ম বিধিয়তে। তুমি আমার পরেই ব্যাপারটা ছেড়ে দাও।

মনে মনে গুরুদেব তখন পূর্ণকিশোরী রূপলাবণ্যযুক্তা সুহাসিনীর কথাই চিন্তা করছিলেন। কন্যাটি সর্বসুলক্ষণাযুক্তা, সাধন-সঙ্গিনী হবার একান্ত উপযুক্তা।

গুরুদেব সান্ত্বনা দিলেও কিন্তু ভবতারিণী নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। পৌত্রীকে নিয়ে রাত্রে শয়ন করলেন বটে, কিন্তু একই কথা ভাবতে লাগলেন—অতঃ কিম!

ভাবতে ভাবতেই কখন একসময় নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন, সহসা শেষ রাত্রির দিকে নিদ্রাভঙ্গ হতেই চমকে উঠলেন—পৌত্রী তার শয্যায় নেই!

কোথায় গেল সুহাস?

তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করলেন এবং সর্বত্র অনুসন্ধান করেও যখন সুহাসিনীর কোন সন্ধান পেলেন না এবং সেই সঙ্গে জানতে পারলেন আনন্দচন্দ্রও নেই, ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে ভবতারিণীর বিলম্ব হল না।

ছুটে গেলেন গুরুদেবের কাছে—সর্বনাশ হয়েছে প্রভু!

—কি হলো মা?

—সুহাস নেই!

—সে কি! কোথায় যাবে? দেখ ভাল করে সন্ধান করে—যাবে কোথায়?

—সন্ধান করেছি, নেই—আনন্দচন্দ্রও নেই!

—আনন্দচন্দ্রও নেই?

—না, এইমাত্র গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলাম—নৌকাও নেই!

—তারা কি তবে—

—নিশ্চয়ই কলকাতায় ফিরে গিয়েছে। কি হবে প্রভু!

গুরুদেব একটু ভেবে নিয়ে বললেন—তুমি তাহলে আর বিলম্ব করো না—

—বিলম্ব করবো না!

—না, এই মুহূর্তে কলকাতায় যাত্রা করো। চল আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

গুরুদেবই সব ব্যবস্থা করে দিলেন ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে।

নৌকা ভাড়া করে একজন পরিচিত লোককে দিয়ে ওদের রওনা করে দিলেন। নৌকা ভেসে চলল।

বাড়িতে কান্নাকাটি চলেছে, সেই সময় ভবতারিণী নবদ্বীপ থেকে হন্তদন্ত হয়ে নৌকাযোগে ফিরে এলেন।

কান্নার শব্দ শুনে ভবতারিণী একজন দাসীকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কাঁদছে কেন সব? কি হয়েছে রে?

—কত্তামা গো—দাসী কেঁদে ওঠে হাউহাউ করে।

—আ মলো যা, বলবি তো কি হয়েছে! কাঁদছে কেন সকলে বাড়ির মধ্যে?

—সুহাসিনী দিদি—

—কি, কি হয়েছে সুহাসের? সে কোথায়?

—সে আর নেই গো কত্তামা—সে নেই!

—নেই?

—না, সাপে কেটেছে তাকে। দেখুন গে কত্তাবাবুর ঘরের মধ্যে—

—সাপ! কোথা হতে এলো সাপ? ছুটলেন ভবতারিণী। ছুটতে ছুটতে এসে ভবতারিণী প্রবেশ করলেন পুত্রের শয়নকক্ষে।

একটা পাটির ওপরে মেঝেতে সুহাসিনীর বিষজর্জর মৃতদেহটা পড়ে আছে। একপার্শ্বে ভূলুণ্ঠিতা পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা চৈতন্যহীনা। আর মৃতের শিয়রের ধারে প্রস্তরমূর্তির মত উপবিষ্ট তাঁর পুত্র রাধারমণ। আত্মীয়জন, আশ্রিতজন চারিদিকে ভিড় করে ক্রন্দন করছে।

—সুহাস! চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন ভবতারিণী।

পৌত্রীকে প্রাণাধিক স্নেহ করতেন ভবতারিণী। ভবতারিণী মৃতা সুহাসিনীর দেহটা আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছিলেন, পুত্র রাধারমণ চিৎকার করে উঠলেন—না, তুমি স্পর্শ করো না ওকে, স্পর্শ করো না!

—রাধারমণ!

—তুমি আর তোমার পুত্রবধূ দুজনে মিলে ওকে হত্যা করেছ মা—তোমরা হত্যা করেছ!

—রাধারমণ!

—হ্যাঁ, ওকে তুমি স্পর্শ করো না। তোমরা যদি ওকে আমার কাছ থেকে না ছিনিয়ে নিয়ে যেতে, অকালে এমন করে সোনার প্রতিমা মাকে আমার চলে যেতে হত না।

ভবতারিণী আর চুপ করে থাকতে পারেন না, বলে উঠলেন—এত বড় কঠিন বাক্যটা তুই আমার প্রতি উচ্চারণ করতে পারলি রাধারমণ! আমি ওকে হত্যা করেছি?

—ভেবে দেখো মা, তাই কি করোনি অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে? ঐ হতভাগিনী মেয়েটার যে আমি ভালই করতে চেয়েছিলাম মা, সেটা তুমি আর তোমার পুত্রবধূ বুঝলে না—বুঝতে চেষ্টাও করলে না।

—না করিনি, যা মহাপাপ—

—পাপ! মহাপাপ! বিধবার বিবাহ পাপই যদি হত মা, অত বড় একজন পণ্ডিত ঐ বিধান দিতেন না—দিতে পারতেন না! যাক মা, তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে তো? এবারে সুখী হয়েছ তো তোমরা? বলতে বলতে রাধারমণ ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সর্প-দংশনে হোক বা যে ভাবেই হোক, মৃত্যু যখন হয়েছে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। পুরোহিতকে ডেকে আনবার জন্য রাধারমণ লোক পাঠালেন। অপঘাতে মৃত্যু—স্বাভাবিক মৃত্যু তো নয়, কে জানে পুরোহিত এসে আবার কি বিধান দেন!

পুরোহিত এসে বিধান দিলেন অপঘাতে সর্প-দংশনে মৃত্যু—কলার ভেলায় করে মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়াই কর্তব্য, অতএব তাই করা হবে স্থির হলো।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে যেতে মধ্যরাত্রি হয়ে গেল।

শববাহকদের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দচন্দ্রও গেল। রাধারমণ কিন্তু গেলেন না।

৫

বাহকরা যখন গঙ্গাতীরে শ্মশানভূমিতে শব বহন করে এসে পৌছাল, সূর্যদেব তখন পাটে বসেছেন।

শীতের শান্ত গঙ্গার জলে সূর্যের অন্তিম রশ্মি যেন আবীর গুলে ঢেলে দিয়েছে। শীতের ছোটবেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—বিষণ্ণ, বিধুর। শ্মশানে তখন একটি চিতা জলছিল, অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় চিতাবহ্নির শেষ আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

শব-বাহকেরা শবের খাটিয়া শ্মশানভূমিতে নামিয়ে রাখল।

কলেজ থেকে আনন্দচন্দ্র যখন ফিরে এলো, মল্লিকবাড়ি কেমন যেন অটস্ফু স্তব্ধতার মধ্যে থমথম করছে। মল্লিকবাড়িতে তখনো সন্ধ্যাপ্রদীপ জলেনি। রাধামোহনের মন্দিরেও সন্ধ্যাদীপ জলেনি। একটু বিস্মিতই হয় আনন্দচন্দ্র, দীর্ঘকাল এ গৃহে সে আছে—ইতিপূর্বে কখনো তো সে এমনটি দেখেনি!

ব্যাপার কি? সব এত স্তব্ধ কেন?

নিজের কক্ষে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ আনন্দচন্দ্রের কানে এলো একটা অস্ফুট করুণ বিলাপধ্বনি। কে যেন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

ধক্ করে ওঠে আনন্দচন্দ্রের বুকের ভিতরটা একটা যেন অমঙ্গল আশঙ্কায়। আনন্দচন্দ্রের আর কক্ষে প্রবেশ করা হলো না, সে অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল। অন্দরের পথে দাসী মোক্ষদার সঙ্গে দেখা।

—কে গা? মোক্ষদা প্রশ্ন করে।

—আমি মোক্ষদা।

—দাদাবাবু!

—হ্যাঁ। কিন্তু কে কাঁদছে বল তো? এখনো সন্ধ্যাপ্রদীপ জলেনি!

মোক্ষদা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। সুহাসিনীকে সত্যিই ভালবাসত মোক্ষদা। এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছে সুহাসিনীকে।

আর এ বাড়িতে ঐ তো ছিল একটিমাত্র সন্তান।

—কাঁদছো কেন মোক্ষদা, কি হয়েছে? আনন্দচন্দ্র বললে।

—দিদিমণি আমাদের আর নেই গো আনন্দ দাদাবাবু।

—দিদিমণি—সুহাস নেই, কি বলছো মোক্ষদা!

—দিদিমণিকে সাপে কেটেছে গো।

—সাপ! কোথা থেকে এলো সাপ? আনন্দচন্দ্রের বিস্ময়ের যেন অবধি নেই।

এই মল্লিকবাড়িতে সাপ কোথা থেকে এলো আবার আর কেমন করেই বা সেই সাপ দংশন করলো সুহাসিনীকে ?

—মোক্ষদা !

মোক্ষদা তখনো কাঁদছে।

—সাপ কোথা থেকে এলো মোক্ষদা ?

—মাটির নীচের কুঠুরীতে নাকি সাপ ছিল—সেই সাপে কেটেছে দিদিমণিকে, এই তো কিছুক্ষণ আগে সকলে শব শ্মশানে নিয়ে গেল।

—দাহ করতে ?

—না, সাপে কাটলে কি দাহ করে দাদাবাবু ! ভেলা করে জলে ভাসিয়ে দেবে হয়ত—ঠাকুরমশাই তো সেই বিধানই দিয়ে গেলেন।

—মোক্ষদা !

—আজ্ঞে ?

—কত্তামা তোমাদের ফিরেছেন ?

—হ্যাঁ। তিনিও তো তখন থেকে বুক চাপড়ে কাঁদছেন।

—কত্তামশাই কোথায় ?

—তিনি একটু আগে শ্মশানে গেলেন, বাগান থেকে কলাগাছ কেটে নিয়ে।

আনন্দচন্দ্র আর দাঁড়ালো না। নিজের ঘরে ফিরে এসে হাতের বইখাতাপত্র-গুলো ছুঁড়ে ফেলে রেখে ঐ অবস্থাতেই ছুটলো শ্মশানের দিকে।

আনন্দচন্দ্র শ্মশানে গিয়ে যখন পৌঁছাল, কলাগাছের ভেলা তখন প্রায় তৈরী। পাশেই মস্তক থেকে পা পর্যন্ত একটা চাদরে মৃতদেহটা আবৃত রয়েছে। হঠাৎ ঐ সময় কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে শবের সামনে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারেও আনন্দ চিনতে পারল, সে আর কেউ না—ভোলানাথ।

—আনন্দ ! ভোলানাথ ডাকল : সুহাসকে বলে সাপে কেটেছে !

—আনন্দচন্দ্র চুপ করে থাকে।

—আমার, আমারই জন্য সবকিছু ঘটলো। আমি যদি না সব কথা গিন্নী-মাকে বলে দিতাম—উঃ, এ আমি কি করলাম আনন্দ, এ আমি কি করলাম, সোনার প্রতিমাকে আমি এমনি করে শেষ করে ফেললাম !

ভোলানাথ শ্মশানভূমিতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ঘৃণায় বিরক্তিতে আনন্দচন্দ্র অন্যদিকে মুখ ফেরায়। নতুন একটা চিতা তখন জ্বলে উঠেছে কিছুদূরে। লেলিহান অগ্নিশিখা বায়ুতাড়িত হয়ে জ্বলতে থাকে।

ঐ সময় রাধারমণ মল্লিক এসে আনন্দর সামনে দাঁড়ালেন—তাঁর হাতে একটা প্যাকেট।

—আনন্দ ?

—আজ্ঞে! আনন্দ রাধারমণ মল্লিকের দিকে তাকাল।

—এর মধ্যে লালপাড় শাড়ি শাঁখা সিন্দুর আলতা সব আছে—মাকে আমার সাজিয়ে দাও তোমরা, আর এই নাও অলংকারগুলো। রাজেন্দ্রাণী মাকে আমার রাজেন্দ্রাণীর মত সাজিয়ে দাও, ও বিধবা নয়—ও চির আয়ুষ্মতী—সতী-সাধ্বী—

আনন্দচন্দ্র কি বলবে বুঝতে পারে না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রাধারমণ মল্লিকের মুখের দিকে। দূরের চিতার আলো তার চোখেমুখে এসে পড়েছে, মনে হয় যেন একটা প্রেত সামনে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ পাশ থেকে ঐ সময় নারীকণ্ঠে কে বললে, কাকে সাজিয়ে দিবি রে ?

আনন্দচন্দ্র চেয়ে দেখলো এক ভৈরবী, মাথায় দীর্ঘ কেশ জটায় পরিণত—পৃষ্ঠ ব্যেপে রয়েছে, কপালে রক্তসিন্দুরের বিরাট এক গোলাকার টিপ, পরনে রক্তলাল শাড়ি, এক হাতে ত্রিশূল।

রাধারমণও তাকিয়ে ছিলেন ভৈরবীর দিকে।

ভৈরবীর বয়েস হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়।

কে একজন পাশ থেকে বলে ওঠে, প্রণাম ভৈরবী মা!

ভৈরবী কিন্তু লোকটার দিকে তাকালও না।

রাধারমণ বললেন, মা, আমার মেয়েকে একটু সাজিয়ে দেবে!

—তোর মেয়ে ?

—হ্যাঁ, মা।

—কিসে মলো, কি হয়েছিল বাবা ? ভৈরবী শুধায়।

—সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে।

ভৈরবী আর প্রশ্ন করলো না, এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের উপর থেকে বস্ত্রটা টেনে তুলে সুহাসিনীর অনাবৃত মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আহা রে!

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো সুহাসিনীর বিষজর্জরিত নীলাভ মুখখানির দিকে। তারপর রাধারমণের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমরা একটু সরে যাও, আমি ওকে সাজিয়ে দিই।

সকলে কিছুদূরে সরে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে ভৈরবী সুহাসিনীকে সাজাল।

—আয় সাজিয়ে দিয়েছি মাকে, ভেলায় তুলে মা-গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দে।

চিতার রক্তাভ আলোয় সুহাসিনীর মুখের দিকে আনন্দচন্দ্র নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে—এ কোন্ সুহাসিনী, একে তো সে চেনে না, একে তো সে কখনো ইতি-পূর্বে দেখেনি! সিঁথিতে সিন্দূর, কপালে সিন্দূর, কপালে সোনার টায়রা, গলায় চন্দ্রমুখী হার, হাতে কঙ্কণ, বাঁজুতে বলয়—রাজেন্দ্রাণীর মতই যেন সত্যি সেজে ঘুমিয়ে আছে সুহাসিনী।

ভেলায় তুলে শোয়ানো হলো মৃতদেহ সযতনে।

সকলে অতঃপর ভেলা বহন করে নিয়ে গিয়ে ভাগীরথীর জলে ভাসাল। শিয়রের ধারে একটি মাটির সরায় কিছু তণ্ডুল, তিল যব হরিতকী, দুটো কদলী, আর একটি মাটির পাত্রে একটি জলন্ত ঘৃতপ্রদীপ।

কলকল ছলছল করে বহে চলেছে যেন ভাগীরথী। পতিতোদ্ধারিণী মা-গঙ্গা। আনন্দচন্দ্র ভেলাটা ঠেলে দিচ্ছে যখন গভীর স্রোতে, হঠাৎ যেন তার কানে এলো দুটো কথা—আনন্দ দাদা!

চমকে ওঠে আনন্দচন্দ্র।

স্রোতে ভেসে চলে ভেলাটা। প্রদীপের শিখাটা বাতাসে কাঁপছে।

সবাই একে একে জল থেকে উঠে গিয়েছে, যায়নি কেবল আনন্দচন্দ্র—সে তখনো কোমরজলে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার কানে এলো, সুহাস—সুহাসিনী!

তারপর জলের মধ্যে একটা ভারী বস্তু পড়ার ঝপাং শব্দ।

ভোলানাথ জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চিৎকার করে ডাকল আনন্দচন্দ্র, ভোলানাথ!

কিন্তু ভোলানাথ তখন প্রখর স্রোতের মধ্যে সাঁতরে চলেছে ভেলাটাকে লক্ষ্য করে।

ভেলা বহু দূরে চলে গিয়েছে ভাসতে ভাসতে। ভেলার দিকে সাঁতরে চলেছে ভোলানাথ।

শ্মশানযাত্রীরা আবার ফিরে এলো গৃহে।

রাধারমণ কেবল শ্মশান থেকে ফেরেননি। শ্মশান থেকেই তাঁর ক্রুহাম গাড়িতে চেপে কোথায় চলে গেছেন।

কোচোয়ান শুধায় একসময়, কোন্ দিকে যাবো হুজুর?

কোথায় যেতে হবে রাধারমণ বলে দিলেন।

টগবগ করে খুরের আওয়াজ তুলে ব্রুহাম গাড়িটা ছুটে চলে।

গাড়িটা যখন জলদবালার গৃহের সামনে এসে দাঁড়াল তখন রাত্রি প্রায় দশটা।

কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দাসী এসে দরজা খুলে দেয়।

রাধারমণ সোজা দ্বিতলে উঠে গেলেন।

জলদবালা রাধারমণের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, কি হয়েছে গো? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

রাধারমণ একটা কথাও বললেন না, সোজা গিয়ে শয্যায় উপবেশন করলেন।

জলদবালা সামনে এসে দাঁড়াল।

—জলদ, আমার সুহাস মাকে মা-ভাগীরথীর বুকে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম।

—কি বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, মা আমার অভিমান করে চলে গেল।

—তবে যে তুমি বলেছিলে আবার বিবাহ দেবে!

—বিবাহই তো দিয়ে এলাম—মৃত্যুর সঙ্গে।

তারপরই দুজনে নির্বাক।

একজন শয্যার উপর, অন্যজন মাটিতে বসে থাকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। বাইরে রাত্রির প্রহর গড়িয়ে চলে।

আনন্দচন্দ্র কেন যেন হঠাৎ স্থির করেছিল শ্মশান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে, মল্লিকবাড়িতে আর নয়। আর কয়েকদিন বাদেই তার পরীক্ষা, পরীক্ষা দিয়ে সে গ্রামে চলে যাবে। অন্যত্র কোথায়ও থেকে সে এবারে ডাক্তারী পড়বে।

এবং তাই করে আনন্দচন্দ্র, পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়ে গেল সেদিন বৈকালে এসে রাধারমণের সঙ্গে আনন্দ দেখা করলো, কাকা, আজই আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সুহাসিনীর আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুর পর থেকেই রাধারমণ যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। দিনের বেলা সকালের দিকে কিছুক্ষণ ছাড়া আর গৃহেই থাকেন না, হয় গদিতে না হয় জলদবালার গৃহে। ভবতারিণী দেবীও যেন একেবারে চুপ হয়ে গেছেন।

আর অন্নপূর্ণা নিঃশব্দে সংসারের ও মন্দিরের ঠাকুরসেবা করে যাচ্ছেন।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কথাই নেই। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা যেন সারাবাড়িতে পাষাণভার হয়ে চেপে বসেছে।

রাধারমণ বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিশেষ একটা কাজ ছিল বলেই ঐ সময় গৃহে এসেছিলেন, নচেৎ ঐ সময় কখনো তিনি থাকেন না।

—কাকা!

—কে?

—আমি আনন্দ।

—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ কাকা, আজই আমি গ্রামে ফিরে যাচ্ছি।

—পরীক্ষা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, কাকা।

—এবারে তো ডাক্তারী পড়বে?

—তাই পিতাঠাকুরের ইচ্ছা—

—কবে ফিরবে?

—পরীক্ষার ফল বের হলে।

—আনন্দ?

—আজ্ঞে!

—ডাক্তারী পড়ার সময় যে টাকা তোমার লাগবে আমার কাছ থেকে নিও।

—বেশ। পিতাঠাকুরকে বলবো।

কি জানি কেন এবারে কলকাতায় ফিরে যে সে আর এ গৃহে আসবে না সে কথাটা রাধারমণকে বলতে পারল না এবং ঐ মল্লিকগৃহে না থাকলে কোথায় সে থাকবে তাও কিছু ভেবে পায়নি এখনো পর্যন্ত। তারপর আরো একটা কথা আছে, পিতাঠাকুরকে কথাটা জানাতে হবে—তাঁকে কিছু না জানিয়ে অন্যত্র সে থাকতেও তো পারবে না।

আনন্দচন্দ্র কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হতে যাবে, ঐ সময় ভবতারিণী কর্ত্তামা এসে কক্ষে প্রবেশ করেলেন।

—রাধারমণ!

—কিছু বলবে মা? পুত্র জননীর মুখের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ, এবার তুমি আমার কাশীবাসের ব্যবস্থা করো।

—তুমি কাশীবাসিনী হতে চাও মা?

—হ্যাঁ।

—তোমার বধূমাতার মনের অবস্থা এখন—

—ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমার কাশী যাত্রার ব্যবস্থা করো।

—ঠিক আছে মা, তাই হবে। কিন্তু কেন যে তুমি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছো এসময়—

—ত্যাগ নয়, ওরে ত্যাগ নয়, আমি পালিয়ে যেতে চাই—দূরে।

—মা!

—আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না রাধারমণ, আমারই জন্য সুহাসিনীর অমন অপঘাতে মৃত্যু হলো!

—তুমি আর কি করবে মা বলো, হতভাগিনীর নিয়তি—

—না, না, এখন কেবলই মনে হচ্ছে যদি তোমার বিরুদ্ধাচরণ না করতাম!

রাধারমণ একটু যেন অবাকই হয়, জননীর মুখে আজ এ কি বিপরীত কথা?

—বাকী জীবনটা, ভবতারিণী বললেন, বিশ্বনাথের চরণতলে বসে একটাই কেবল প্রশ্ন করবো—আমি কি তাহলে ভুল করেছিলাম! কথাগুলো বলতে বলতে ভবতারিণী যেন উদ্‌গত অশ্রুপ্রবাহকে রোধ করতে করতে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

আনন্দচন্দ্রও কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। রাধারমণ পাথরের মত কক্ষের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁর নিজেরও আজ বার বার মনে হচ্ছে, তবে কি তিনিই ভুল করেছিলেন, প্রচলিত চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিধবা কন্যার বিবাহ দেবার চেষ্টা করে! আর সেই কারণেই কি ভগবান এত বড় বেদনার বোঝাটা তাঁর মাথার উপর চাপিয়ে দিলেন!

একটা মানুষের মৃত্যুতে যে চারিদিক এমনি শূন্য হয়ে যেতে পারে, এ তো তিনি কখনো ভাবেননি। আজ যেন সমস্ত সংসারটাই তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে গিয়েছে।

সুহাস চলে গেল, মাও চাইছেন কাশীবাসিনী হতে, স্ত্রী অন্নপূর্ণাও অর্ধমৃত—এ কি হলো, সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল!

কখন ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ভিতরে ও বাইরে ঘনিয়ে এসেছে জানতে পারেননি। হঠাৎ সন্ধ্যা-শঙ্খ বাজতে তাঁর চমক ভাঙলো।

কতকগুলো দলিলপত্র সিন্দুক থেকে নিতে এসেছিলেন, সেগুলো নিয়ে রাধারমণ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

৬

গঙ্গায় তখন জোয়ারের স্ফীতি। উত্তাল তরঙ্গসংকুল গঙ্গা—ভাগীরথী।

প্রচণ্ড স্রোতের টান। ভেলা সুহাসিনীর মৃতদেহ বহন করে তীব্র স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে অনেকটা দূরে চলে গেল।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না। তবু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে ভোলানাথ দ্রুতবেগে সাঁতার দিয়ে চলতে লাগল।

যেভাবে হোক ভেলাটা সে ধরবেই।

অনেকটা সাঁতার কেটে যাবার পর অবশেষে অতিকষ্টে ভোলানাথ স্রোতের টানে চলমান ভেলাটা ধরে ফেলল এবং বহুকষ্টে ভেলার উপর দেহের অর্ধেকটা তুলে দিল।

ভেলা ভেসে চলেছে।

মাথার উপর কৃষ্ণপক্ষের নক্ষত্রখচিত আকাশ।

অনেকক্ষণ ঐভাবে ভেলার উপরে দেহের অর্ধাংশ স্থাপন করে পরিশ্রান্ত ভোলানাথ মরার মত পড়ে রইলো।

তারপর ঐভাবেই শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার দু'চোখের পাতায় নিদ্রার ঘোর নামে।

ভোলানাথ এলিয়ে পড়ে থাকে এবং একসময় গভীর ক্লান্তিতে ও নিশীথের গঙ্গাবক্ষের সুশীতল বায়ুপ্রবাহে ভোলানাথের দুই চোখে নামে গভীর নিদ্রা।

ভেলা স্রোতের টানে ভেসে চলে।

ক্রমে একসময় যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো ভোলানাথের, তখন রাত্রির শেষ যাম। গঙ্গাবক্ষে প্রত্যুষের প্রথম আলো কুয়াশার একটা যবনিকার মত দুলছে মৃদু মৃদু।

ভোলানাথের প্রথমটায় কিছুই মনে পড়ে না।

কোথায় সে—কোথায় চলেছে কিছুই মনে পড়ে না। অতি কষ্টে ভোলানাথ দেহের নিম্নাংশটা ভেলার উপরে টেনে তোলে।

সিক্ত বস্ত্র। শীত-শীত করে ভোলানাথের।

কোথায় সে?

মাথাটা বেশ ভারী।

ক্রমে ক্রমে ভোলানাথের সম্পূর্ণ চেতনা যেন ফিরে আসে।

ভেলায় সে বসে আছে।

ভেলার উপরে শায়িতা বস্ত্রালংকার-সিন্দুর-আলতায় সুসজ্জিতা সুহাসিনীর মৃতদেহটা। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুহাসিনীর মৃতদেহটার দিকে ভোলানাথ।

ধীরে ধীরে তার সব কথা মানসপটে উদিত হয়।

সর্পদংশনে সুহাসিনীর মৃত্যু হয়েছিল। তারপর তার মৃতদেহটা বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিতা করে ভেলায় তুলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভোলানাথ জানত না ব্যাপারটা। অত বড় যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার কিছুই সে জানত না।

অন্নপূর্ণা যখন সুহাসিনীর হাতটা চেপে ধরে অন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছিল, সে সময় ভোলানাথ ঐ বাগানের মধ্যেই উপস্থিত ছিল। সে কিছুই জানত না। ভবতারিণী সুহাসিনী এবং আনন্দচন্দ্রকে নিয়ে যে নবদ্বীপধামে গুরু-গৃহে প্রস্থান করেছে সে সংবাদ সে জানত না।

কর্তা যে গোপনে অন্যত্র সুহাসিনীকে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দেবার মতলব করেছেন, অন্নপূর্ণাকে কথাটা বলে দেবার পর কি হলো সেটা জানবার জন্যই সেরাত্রে প্রাচীর টপকে মল্লিকবাড়িতে সে প্রবেশ করেছিল। আর ঠিক সেই সময় আনন্দচন্দ্র সুহাসিনীকে নিয়ে খিড়কীর দ্বারপথে মল্লিকগৃহে প্রবেশ করে।

ভোলানাথ দূর থেকে সব কিছুই শোনে ও দেখে।

অন্নপূর্ণা সুহাসিনীর হাত ধরে অন্দরের দিকে চলে যাবার পর ভোলানাথ সেখানে আর দাঁড়ায় না। প্রাচীর টপকে আবার মল্লিকবাড়ি থেকে বের হয়ে আসে এবং সেই দিন রাত্রে আবার সুহাসিনীর শেষ পর্যন্ত কি হলো জানবার জন্য মল্লিকগৃহে এসে প্রবেশ করে।

সেখানে তখন কান্নার রোল। শববাহকরা শ্মশানের দিকে প্রস্থান করেছে কিছুক্ষণ পূর্বে। সব কিছু জানতে পেরে ভোলানাথ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

ভোলানাথ হেঁটে চললো শ্মশানের দিকে।

দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সব সে দেখে। সুহাসিনীকে ভৈরবী মূল্যবান বস্ত্রে ও একগা অলংকার দিয়ে রাজেন্দ্রাণীর মত সাজিয়ে দেয় রাধারমণের নির্দেশে।

মৃতের দেহে ঐসব মূল্যবান অলংকার দেখে এবং অদূরে চিতার আলোয় সেই অলংকারগুলো ঝিকমিক করে জ্বলে—ভোলানাথের দুই চোখে লোভের আগুন জ্বলে ওঠে।

বহু টাকার অলংকার সুহাসিনীর দেহে। ঐ অলংকারগুলো যদি সে হাতাতে পারে, তার আর এ জীবনে কোন দুঃখ থাকবে না। সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারবে। সেই লোভের বশবর্তী হয়েই ভোলানাথ গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়েছিল। সুহাসিনীর প্রেমে শোকে অন্ধ হয়ে নয়। সেই সুযোগ এই মুহূর্তে তার করতলগত।

ভোলানাথ চেয়ে থাকে মৃতা সুহাসিনীর দেহের অলংকারগুলোর দিকে। সুহাসিনী যেন মরেনি—পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে।

ভোলানাথের বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সে যেন সমাহিত।

হঠাৎ ভেলাটা যেন থেমে গেল মৃদু একটা ধাক্কা খেয়ে। ভোলানাথের সম্বিৎ ফিরে এলো। ভোরের আলো তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখে এক সন্ন্যাসী ভেলাটা ধরে থামিয়েছে, সন্ন্যাসী আবক্ষ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

মাথায় একরাশ জটা।

সন্ন্যাসী নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে ভোলানাথের দিকে।

—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সন্ন্যাসী, কে তুমি?

—প্রভু—

—ভেলায় শায়িতা ও কে?

ভোলানাথ বিব্রত বোধ করে, কি জবাব দেবে ঠিক বুঝতে পারে না।

সন্ন্যাসী আবার প্রশ্ন করলেন, কে হয় তোমার? কি হয়েছে ওর?

—প্রভু, সর্পদংশনে ওর মৃত্যু হয়েছিল, তাই—তাই ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছে।

—সর্পদংশনে মৃত্যু?

—হ্যাঁ, প্রভু।

সন্ন্যাসী যেন মুহূর্তকাল কি ভাবলেন, তারপর ভেলাটা সামনের দিকে টেনে এনে ভোরের আলোয় কিছুক্ষণ মৃতা সুহাসিনীর মুখখানি নিরীক্ষণ করলেন, তার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, তারপর আবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভেলা থেকে নেমে ভেলাটা তীরের কাছে নিয়ে আসতে পারবে তুমি?

—পারবো।

—তবে নিয়ে এসো।

ভোলানাথ সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে পড়ল। বুকপ্রমাণ জল প্রায় সেখানে। ভোলানাথের দেহে রীতিমত শক্তি ছিল, সে ভেলাটাকে টেনে টেনে তীরের কাছে নিয়ে এলো।

—শোন, সন্ন্যাসী আবার বললেন, মৃতদেহটা ভেলার উপর থেকে তুলে তীরে এনে নামাও—আমি আসছি।

সন্ন্যাসী সামনের জঙ্গলে অন্তর্হিত হলেন।

জায়গাটা নির্জন। কোন লোকালয়ের চিহ্নমাত্র আশেপাশে কোথাও নেই। তীরভূমি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গঙ্গাবক্ষে এসে মিশেছে। সম্মুখে ঘন জঙ্গল দৃষ্টিতে পড়ে।

মৃতদেহটা রীতিমত ভারী। বহুকষ্টে ভোলানাথ মৃতদেহটা পাঁজাকোলে করে ভেলার উপর থেকে নামিয়ে সেই ঢালু তীরভূমিতেই শয়ন করালো।

ভোলানাথ রীতিমত তখন হাঁপাচ্ছে।

আধ ঘণ্টাটাক পরে ভোলানাথ দেখলো, সন্ন্যাসী ঢালু তীরভূমি দিয়ে দ্রুত নেমে আসছেন।

আলো তখন চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী সুহাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিবাহিতা নারী! এ কে হয় তোমার? তোমার স্ত্রী কি?

স্বাভাবিক ভাবেই সন্ন্যাসী অনুমানটা করেছিলেন।

ভোলানাথ মাথাটাকে ঈষৎ হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

—ঠিক আছে বৎস, তুমি একটু দূরে যাও।

ভোলানাথ দ্বিরুক্তি করল না, কিছু দূরে চলে গেল।

সন্ন্যাসীর হাতের মধ্যে ছিল কিছু শুষ্ক লতা, সেগুলো জলে ভিজিয়ে হাতের তালুর মধ্যে ডলতে লাগলেন—একটু পাতলা রস বের হলো।

সন্ন্যাসী মৃতের মুখ অতিকষ্টে সামান্য একটু ফাঁক করে কয়েক ফোঁটা রস সুহাসিনীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই সুহাসিনীর স্তব্ধ নাড়ীর মধ্যে গতির সঞ্চার হয়, সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন। তিনি তখন সুহাসিনীর নাড়ী ধরে বসে আছেন।

আরো কিছুক্ষণ পরে সুহাসিনীর অক্ষিপল্লবে মৃদু কম্পন শুরু হলো। সন্ন্যাসী সুহাসিনীর দেহে হাত বুলাতে লাগলেন মৃদু মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে।

ভোলানাথ দূরে দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে থাকে। ব্যাপারটা কি ঘটছে কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

আরো কিছুক্ষণ পরে সুহাসিনী চোখের পাতা খুললো। সুহাসিনী ঘোর-ঘোর দৃষ্টিতে দেখলো একটি জটাজুটধারী মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্রমে সুহাসিনীর চোখে আরো সব কিছু স্পষ্ট হয়।

ক্লান্ত অবসন্ন মৃদু কণ্ঠে সুহাসিনী প্রশ্ন করলো, আমি কোথায়?

—গঙ্গাতীরে।

সুহাসিনী উঠে বসবার চেষ্টা করে। তার তখনো কিছুই মনে পড়ছে না। কেবল একটা আলোর প্লাবন যেন তার দৃষ্টির সম্মুখে।

সন্ন্যাসী বাধা দিলেন, না, না মা, এখন ওঠবার চেষ্টা করো না মা। তুমি দুর্বল।

—আপনি কে?

মৃদু স্মিত হাস্যে সন্ন্যাসী বললেন, আমি একজন সন্ন্যাসী, মা।

—সন্ন্যাসী!

—হ্যাঁ, মা।

—আমি এখানে কি করে এলাম? আমি তো সেই গুপ্ত গর্ভগৃহে—তারপর কিসে যেন আমায় দংশন করলো!

—সর্পদংশন করেছিল মা তোমাকে। এখন কেমন বোধ করছো মা?

—ভালো।

—তোমার স্বামী অদূরে অপেক্ষা করছে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভেলায় ভেসে এসেছে।

—আমার স্বামী!

—হ্যাঁ মা, তোমার স্বামী।

—কিন্তু—

—ডেকে দেবো মা তোমার স্বামীকে?

—আমার স্বামী নেই বাবা।

—স্বামী নেই? কিন্তু ও যে বললে—

—আমি বিধবা।

—বিধবা!

—হ্যাঁ, কৈশোরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত-ইশারায় ভোলানাথকে আহ্বান জানালেন।

ভোলানাথ সুহাসিনীকে উঠে বসতে দেখেছিল। সে সন্ন্যাসীর আহ্বানে ছুটে এলো। আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো, সুহাস!

সন্ন্যাসী বাধা দিলেন, কে তুমি, কি নাম তোমার—সত্য পরিচয় দাও। তুমি বলেছিলে এ তোমার স্ত্রী—

—প্রভু!

—তুমি মিথ্যা বলেছো। সন্ন্যাসী এবারে সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, একে চেনো তুমি?

—হ্যাঁ, ভোলানাথ।

—কে হয় তোমার ও?

—কেউ নয়।

—ও, ও মিথ্যা বলছে প্রভু, ও আমার স্ত্রী। ভোলানাথ চেঁচিয়ে উঠলো।

সন্ন্যাসী রক্তচক্ষে ভোলানাথের দিকে তাকালেন। তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা।

—যাও, যাও এখান থেকে।

ভয়ে ভয়ে ভোলানাথ সরে গেল।

—এখন তুমি কি করতে চাও মা? সন্ন্যাসী শুধালেন।

—জানি না।

—গৃহে ফিরে যেতে পারবে?

—না।

—আমি মা গঙ্গাসাগরযাত্রী, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে নিকটবর্তী এক শ্মশানে দু'দিনের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, আজই আবার যাত্রা করবো।

—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

—আমার সঙ্গে যাবে? কোথায়?

—যেখানে আপনি যাবেন।

—আমি মা সন্ন্যাসী, ঘর তো আমার নেই। তুমি গৃহী—তুমি তোমার গৃহেই ফিরে যাও মা।

সুহাসিনীর মনের মধ্যে যেন আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে অকস্মাৎ। তার অতীত—তার এতদিনকার জীবন সব যেন কেমন মিথ্যা মনে হয় ঐ মুহূর্তে।

মনে হয়, কোথায় যাবে সে? কোন্ গৃহে? যে গৃহ তাকে মৃতা বলে বর্জন করেছে?

না, আর সে গৃহ নয়।

সন্ন্যাসী সুহাসিনীকে নীরব দেখে বললেন, তোমার মনের ঐ বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী মা। সংসার তোমাকে চায়, তোমার মনও সংসারের শত বন্ধনে এখনো বাঁধা—তুমি বুঝতে পারছো না। তুমি গৃহেই ফিরে যাও মা।

সুহাসিনী যেমন নীরব ছিল তেমনি নীরব থাকে।

সন্ন্যাসী আবার যেন কি চিন্তা করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, একাকিনী নারী তুমি, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তুমি কেমন করে আবার গৃহে ফিরে যাবে সেও একটা চিন্তার বিষয়। ঠিক আছে, আপাততঃ তুমি আমার সঙ্গে গঙ্গাসাগরেই চল—সেখানে কোন তীর্থযাত্রীদলকে বলে দেবো তোমাকে তোমার গৃহে পৌঁছে দিতে।

সুহাসিনী মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনি আমাকে নিয়ে কোনরূপ বিব্রত বোধ করবেন না তো!

সন্ন্যাসী হাসলেন, না মা, সে চিন্তা তোমার নেই—চল। তবে এক কাজ করো মা, তোমার গায়ের অলংকার সব খুলে একটা পুঁটুলি বেঁধে নাও।

সন্ন্যাসী এগিয়ে চললেন, সুহাসিনী সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করল। তাঁর নির্দেশমত অলংকার সব খুলে একটা পুঁটুলি করে বাঁধে।

ভোলানাথকে সন্ন্যাসী চলে যেতে বললেও সে যায়নি, কিছুদূরে আত্মগোপন করে ছিল। সুহাসিনীকে সন্ন্যাসীর পিছু পিছু যেতে দেখে সে দূর থেকে নিজেকে আত্মগোপন করে ওদের অনুসরণ করে।

সুহাসিনী এমনি করে তার প্রায় করায়ত্ত হয়েও, আবার তার নাগালের বাইরে চলে যাবে ভোলানাথ কিছুতেই তা হতে দেবে না। অথচ সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হতেও আর সাহস পায় না।

দূর থেকেই অনুসরণ করে চলে সন্ন্যাসীকে ভোলানাথ।

সন্ন্যাসী গঙ্গাতীর ধরে চলেছেন তো চলেছেনই।

সুহাসিনী চলেছে তাঁর পেছনে পেছনে।

সন্ন্যাসী ইচ্ছা করেই গ্রাম বা লোকালয়কে বর্জন করে চলেছিলেন, সঙ্গে তাঁর যৌবনবতী সুন্দরী নারী।

সন্ধ্যার দিকে এক নির্জন বটবৃক্ষমূলে এসে সন্ন্যাসী বসলেন, সুহাসিনীও বসল অদূরে। রাতটা এই বৃক্ষতলেই বিশ্রাম করব মা, শেষরাত্রের দিকে আবার যাত্রা শুরু করব। তোমার নিশ্চয়ই ক্ষুধা পেয়েছে মা—

—না।

ঝোলা থেকে একটি পক্ক বেল বের করলেন সন্ন্যাসী। সেটা সুহাসিনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই বেল ফলটি ভক্ষণ করে ক্ষুধার নিবৃত্তি করো।

—না।

—নাও, আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই—নাও।

সুহাসিনী পক্ক বেলটি গ্রহণ করলো সন্ন্যাসীর হাত থেকে।

—তুমি ক্ষুধার নিবৃত্তি করো, আমি গঙ্গায় গিয়ে স্নানাহ্নিক সেরে আসি। সন্ন্যাসী জলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুহাসিনী বেলটি হাতে করে বসে থাকে। সন্ধ্যার আঁধার ঝাপসা হয়ে নামছে চারিদিকে।

সহসা কানে আসে মৃদু কণ্ঠস্বর, সুহাস!

—কে?

—আমি—ভোলানাথ।

ভোলানাথ !

সন্ধ্যার আবছায়ায় সম্মুখে ভোলানাথকে দেখে সুহাসিনীর যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

প্রথমটায় তার বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

ভোলানাথ আবার বলে, সুহাস, আমি ভোলানাথ !

—তুমি, তুমি—

—হ্যাঁ সুহাস, আমি ভোলানাথ—

—তুমি ফিরে যাওনি ?

—না। আমি তোমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করে এসেছি।

—কেন ?

—কেন কি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

—না।

—সুহাস !

—তুমি চলে যাও ভোলানাথ।

—চলে যাব, তুমি কি পাগল হলে ! ঐ ভণ্ড শয়তান সাধুর সঙ্গে তুমি কোথায় চলেছো ? তুমি বুঝতে পারনি সুহাস—কিন্তু ওর মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। পথের মধ্যে ও কোথায়ও তোমাকে খুন করে তোমার অলংকার ছিনিয়ে নিয়ে সটকে পড়বার মতলব করেছে।

—কি করে বুঝলে ?

—এ আর বুঝতে এমন কষ্ট কি ! এ তো সহজ কথা। নইলে ও এমনি তোমাকে মিষ্টি কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলছে !

—তুমি অলংকারগুলো চাও ভোলাদা ?

—কি বললে ?

—হ্যাঁ, যদি চাও তো নিতে পারো আমার অলংকারগুলো।

—না।

—কি, না ?

—তোমার অলংকার আমি চাই না। আমি তোমাকে চাই। চল সুহাস, আমরা ঐ ভণ্ড শয়তান সন্ন্যাসী ফিরে আসবার আগেই এ স্থান ত্যাগ করি।

—না, এগুলো চাও তো তুমি বল। বলতে বলতে পুঁটুলি-বাঁধা স্বীয় পরিধেয়

শাড়ির অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধা অলঙ্কারগুলো ভোলানাথের সামনে তুলে ধরলো সুহাসিনী।

—না না, বললাম তো সুহাস ওসব আমি চাই না। তুমি কি মনে করো তোমার ঐ অলঙ্কারগুলোর লোভেই জীবনমরণ তুচ্ছ করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভাসতে ভাসতে এতটা দীর্ঘ পথ এসেছি! সেরকম ইচ্ছা থাকলে তো কখন ওগুলো তোমার গা থেকে খুলে নিয়ে আমি চলে যেতে পারতাম—তুমি তো টেরও পেতে না কিছু। শোন সুহাস, আর দেরি করো না—এখুনি হয়ত সন্ন্যাসী এসে পড়বে।

সুহাসিনী বললে, এগুলো চাও তো তুমি নিতে পার ভোলাদা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না।

—যাবে না?

—না।

—তোমার মা-বাবার কাছে তুমি ফিরে যেতে চাও না! তোমাকে হারিয়ে তাঁরা হয়ত কত কান্নাকাটি করছেন—

প্রত্যুত্তরে বললে সুহাসিনী, যে জীবনে তারা আমার আপনজন ছিল সে জীবনে আর আমি ফিরে যেতে চাই না। তাদের কাছে আর তো আমি জীবিত নই, আজ তাদের কাছে তো আমি মৃত—আমার সর্পাঘাতে মৃতদেহটা তারা জলে ভাসিয়ে দিয়ে সৎকার করেছে।

—কিন্তু সত্যি-সত্যিই তো তুমি কিছু আর মরে যাওনি, তুমিতো এখনো জীবিত।

সুহাসিনী চারপাশের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে কেমন যেন বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে কয়েকটা জোনাকি আলোর বিন্দু ছিটিয়ে ছিটিয়ে ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা চারিদিকে।

সুহাসিনীর মনে হয়, সত্যিই কি সে এখনো বেঁচে আছে!

না, মৃত্যুর পরপারে অন্য জীবন!

যেখানে মা নেই বাপ নেই—কোন স্নেহ কোন মমতা বা আকর্ষণ নেই, কোন আশা নেই—আকাঙ্ক্ষা নেই!

—সুহাস! আবার ডাকলে ভোলানাথ অধৈর্য কণ্ঠে, আমার কথা কি তুমি শুনতে পাচ্ছো না? এখনো বসে আছো কেন? ওঠো, চলো!

—তুমি যাও ভোলাদা, আমি যাবো না।

অদ্ভুত শান্ত, অদ্ভুত স্থির কণ্ঠস্বর যেন সুহাসিনীর।

ঐ সময় সহসা পাশের একটা ঝোপ অন্ধকারে নড়ে উঠলো। ভোলানাথ চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওরা কেউ বুঝতে পারেনি, ইতিমধ্যে একসময় সন্ন্যাসী সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে ফিরে এসেছিলেন, ভোলানাথের কণ্ঠস্বর শুনে ঝোপের আড়ালে এতক্ষণ আত্মগোপন করেছিলেন।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ঝোপের আড়াল থেকে সুহাসিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু সুহাসিনীর যেন কোন সম্বিৎ নেই তখনো।

—মা!

সন্ন্যাসী ডাকলেন।

—আমি—

সুহাসিনী উঠে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী বললেন, না, না—উঠো না। বোস বিশ্রাম করো, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আকাশে চন্দ্রোদয় হবে, তখন আবার আমরা যাত্রা করবো। অন্তথায় অন্ধকারে পথ অতিক্রম করা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে।

সুহাসিনী আবার বসে পড়লো।

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল কি যেন ভাবলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, সত্যিই কি তুমি সংসারে আর ফিরে যেতে চাও না, মা?

—না।

—তোমার সমস্ত জীবন তোমার সামনে পড়ে রয়েছে, বেশ ভাল করে ভেবে দেখো মা। তাছাড়া তোমার বয়স অল্প এবং ভুলো না তুমি যুবতী নারী—

—আমার জন্য আপনি ভাববেন না, আমার ব্যবস্থা আমিই করে নিতে পারবো।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন।

অন্ধকারে সন্ন্যাসীর সে হাসি সুহাসিনী দেখতে পেল না।

ভোলানাথ বেশী দূরে যায়নি। অল্পদূরে একটা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল।

সে ওদের সব কথাই শুনতে পায়।

ভোলানাথ বুঝতে পেরেছিল, আর সে সুহাসিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। সুহাসিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে আর ফিরে যেতে চায় না।

ভোলানাথ বুঝতে পারছিল না কেন সুহাসিনীর ঐ বৈরাগ্য। অবিশ্যি ব্যাপারটা ভোলানাথের পক্ষে সম্যক্ উপলব্ধি করাটাও সম্ভব ছিল না। কখন কোন্ পথে যে সহসা সুহাসিনীর মনের মধ্যে বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে, কেবলমাত্র ভোলানাথ কেন সুহাসিনী নিজেও বুঝতে পারেনি।

অতীত জীবন—অতীত স্নেহমমতা আজ সুহাসিনীর কাছে মৃত। একটা বিষণ্ণ উদাসীনতা কেবল তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

মা অন্নপূর্ণা তার পুনর্বিবাহের ব্যাপারে যাই বলুক না কেন, পিতা যখন তার আবার বিবাহ দেবেন বলে কথাটা তাকে জানিয়ে দিলেন, সুহাসিনীর মনের মধ্যে যেন একটা পুলকের শিহরণ জাগছিল। দেহ ও মনের যে বাসনা-কামনা যৌবন সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেলিত করেছে, সমাজ ও সংসার সেটা মেনে না নিলেও, সেটাকে সে কোনমতেই যেন অস্বীকার করতে পারছিল না।

ভয় ও আশঙ্কার দোলায় সে দুলছিল নিরন্তর। ভোলানাথ তাতে ইন্ধনই যুগিয়েছে এবং সেই ইন্ধনের স্বাদ সুহাসিনী যেন উপভোগই করেছে। ভোলানাথকে তাই সে প্রশ্রয়ই দিয়েছে।

বিবাহ হলে সে সাধ তার পূর্ণ হতো।

কিন্তু ঘটনাচক্রে সে বিবাহ ভেঙ্গে গেল। ভবতারিণী তাকে নিয়ে পালালেন নবদ্বীপধামে। সেখানে গিয়ে আর এক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল, রাধা তাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলো। গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর অকস্মাৎ যদি ঐভাবে তার মায়ের সামনাসামনি না পড়ে যেতো, কি হতো বলা যায় না।

কিন্তু মায়ের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ায় ঘটনা দ্রুত দিক পরিবর্তন করলো, অন্নপূর্ণা তাকে অন্ধকার গুপ্তকক্ষে বন্দী করে রাখল।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই নিরুপায় বসে থাকতে থাকতে সর্বপ্রথম সুহাসিনীর মনের মধ্যে বেশ বিরাট একটা ধাক্কা লাগলো। সে ভুলে গেল তার রূপ যৌবন ও বাসনা কামনার পীড়ন। সম্মুখে পশ্চাতে উর্ধ্বে নিম্নে—কেবল নিরন্ধ্র অন্ধকার, এক ভয়াবহ শূন্যতা। সেই শূন্যতার মধ্যেই ঘটলো সর্পদংশন। একটা অসহ্য যন্ত্রণা—শরীরটা ক্রমে ক্রমে যেন শিথিল হয়ে গেল।

সন্ন্যাসীর ওষধির ক্রিয়ায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে সুহাসিনী চক্ষু মেলে তাকাল নতুন এক জগতের দিকে—নতুন আলোয়।

বৃক্ষতলে সন্ন্যাসী হাতের উপর মাথা রেখে নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন।

সুহাসিনীর চোখে ঘুম ছিল না। অন্ধকার বৃক্ষতলে অনতিদূরে সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

হঠাৎ কি মনে হলো, অঞ্চলপ্রান্তে পুঁটুলি করে বাঁধা অলংকারগুলো সুহাসিনী গিঁট খুলে মাটিতে ঢেলে দিল। সবাই ছেড়ে চলেছে যখন তখন আর এ অলংকারের বন্ধন কেন!

সুহাসিনী শূন্য অঞ্চলপ্রান্তটা তুলে এবারে সারাঅঙ্গ ভাল করে ঢেকে দিল। মধ্যরাত্রির হিমেল বায়ুতে শীত-শীত করছিল।

নিদ্রা আসবে না জানত সুহাসিনী, তাই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

—মা!

একসময় সন্ন্যাসীর ডাকে সুহাসিনী যেন সম্বিৎ ফিরে পায়।

—তুমি কি ঠায় বসেই ছিলে নাকি মা? সন্ন্যাসী শুধালেন।

সুহাসিনী কোন জবাব দিল না।

ইতিমধ্যে আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছিল, চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করলেন এবং বললেন, চল।

সুহাসিনী উঠে দাঁড়াল।

গঙ্গার তীরে তীরে উভয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন।

আরো দুইদিন ধরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সন্ন্যাসী সুহাসিনীকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে অবগাহন করবার জন্য বহু সহস্র পুণ্যলোভাতুরা নরনারী সমবেত হয়েছে সেখানে। বিরাট মেলা বসেছে। সুহাসিনী ফ্যালফ্যাল করে সেই অগণিত নরনারীর দিকে চেয়ে থাকে।

দূরে কপিলমুনির মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

ভোলানাথও এসেছিল ওদের পিছু পিছু—আত্মগোপন করে। সুহাসিনীর সামনে যেতে আর সাহস পায়নি। সন্ন্যাসী যেন সর্বক্ষণ সুহাসিনীকে আগলে আগলে রেখেছেন।

সাগরের তীর ঘেঁষে সুহাসিনী দাঁড়িয়েছিল। বহু নরনারী অবগাহন করছে -কেউ ডুব দিচ্ছে—কেউ কোমরজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করছে।

সন্ন্যাসীও আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করছিলেন।

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ভোলানাথ, পায়ে পায়ে সে এসে সুহাসিনীর পাশে দাঁড়াল।

—সুহাস!

সুহাসিনী ভোলানাথের ডাকে ফিরে তাকাল।

—সুহাস!

—ভোলাদা!

—তোমার অলঙ্কারগুলো কোথায়?

—অলঙ্কার!

—হ্যাঁ, যেগুলো সেদিন তুমি আমায় দিতে চেয়েছিলে?

—নেই।

—নেই! কোথায় গেল?

—ফেলে দিয়েছি।

—ফেলে দিয়েছো! কোথায়?

—যে গাছের তলায় সেরাত্রে ছিলাম সেই গাছের তলায়।

—অলঙ্কারগুলো ফেলে দিলে!

সুহাসিনী ভোলানাথের প্রশ্নের আর কোন জবাব দেয় না, সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সন্ন্যাসীকে দেখা গেল জল থেকে সিক্তবস্ত্রে উঠে আসছেন।

ভোলানাথ আর দাঁড়াল না। ত্বরিত পায়ে স্থানত্যাগ করলো।

সন্ন্যাসী সামনে এসে বললেন, যাও মা, জলে ডুব দিয়ে এসো।

সুহাসিনী জলের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রায় দীর্ঘ এক মাস পরে ভোলানাথ ফিরে এলো কলকাতায়। ঐদিনের পর আর সে সুহাসিনী বা সন্ন্যাসী কাউকেই দেখতে পায়নি। জনারণ্যের মধ্যে যেন তারা হারিয়ে গেল। দুটো দিন দুটো রাত্রি তাদের সর্বত্র মেলার মধ্যে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেছিল ভোলানাথ, কিন্তু আর দেখতে পায়নি তাদের।

অবশেষে একদল যাত্রীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলো।

একবার মনে হয়েছিল ভোলানাথের, রাধারমণ মল্লিককে সুহাসিনীর সংবাদটা দেবে না, কিন্তু পরে কি ভেবে মত পরিবর্তন করল।

একদিন বিকালের দিকে সে আবার মল্লিকগৃহে এসে প্রবেশ করল।

রাধারমণ সেজেগুজে ব্রুহামে চেপে বেরুবার জন্য সদরে এসেছেন, ভোলানাথ এসে সামনে দাঁড়াল।

ভোলানাথের ছিন্ন জামাকাপড়, একমুখ দাড়ি, মাথারল রুক্ষ।

চিনতে পারেননি রাধারমণ ভোলানাথকে, ভেবেছিলেন বোধ হয় লোকটা সাহায্যপ্রার্থী।

ভ্রূকুটি করে তাকালেন ভোলানাথের দিকে, কি চাই?

—আমি ভোলানাথ।

—ভোলানাথ!

—হ্যাঁ, আপনি হয়ত ভুলে গেছেন—একসময় আপনার গৃহেই আশ্রিত হয়ে ছিলাম।

—মঙ্গলার ছেলে?

—হ্যাঁ।

—কি চাই?

—আমি একটা সংবাদ নিয়ে এসেছি—

—সংবাদ!

—হ্যাঁ, সুহাসিনীর সংবাদ—

—সুহাস?

—হ্যাঁ, সর্পদংশনে তার মৃত্যু হয়নি।

—কি উন্মাদের মত প্রলাপ বকছো! যে মৃত সন্তানকে নিজের হাতে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি—

—হ্যাঁ সবই ঠিক, কিন্তু সে আজ মৃত নয়—এক সন্ন্যাসীর দয়ায় সে পুনর্জীবন লাভ করেছে।

সহসা যেন বাঘের মতই শালপ্রাংশুসম বিশাল দুটি বাহু বাড়িয়ে কঠিন থাবায় ভোলানাথের স্কন্ধ চেপে ধরলেন রাধারমণ, বললেন, সত্যি—সত্যি বলছিস?

—হ্যাঁ কর্তা, মিথ্যা বলবো কেন?

—তুই একটা চরিত্রহীন লম্পট শয়তান! বললেন রাধারমণ।

—ছাড়ুন। ভোলানাথ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে কিন্তু সক্ষম হলো না।

—মিথ্যা বললে তোকে খুন করে ফেলবো। বল কোথায় সুহাস?

—ছাড়ুন, সব বলছি।

—আয় আমার সঙ্গে—

বলে টানতে টানতে রাধারমণ ভোলানাথকে নিয়ে বহির্মহলের কাছারীঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজার অর্গল তুলে দিলেন।

—বল সব কথা!

—আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না আমার সব কথা, তবু বলছি—বলে আনু-পূর্বিক সমস্ত ঘটনা ভোলানাথ রাধারমণকে বলে গেল।

সব কিছু শুনলেন রাধারমণ নিঃশব্দে। তারপর বললেন, যা বললি সব সত্য?

—হ্যাঁ, সত্য।

—আমি যাবো—

—কোথায় যাবেন কর্তা?

—গঙ্গাসাগরে—

—সেখানে মেলাও ভেঙে গেছে—সব তীর্থযাত্রীরা যে যার ঘরে ফিরে গেছে। সেখানে এখন আর গিয়ে কি করবেন কর্তা—তাছাড়া সন্ন্যাসীকে কি আর পাবেন, —সে হয়ত সুহাসকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে!

—তবু আমি যাবো—

—বেশ যান। আমি চললাম—

—কোথায়?

—জানি না। আপনাকে সংবাদটা দেওয়া কর্তব্য মনে করেছিলাম, তাই সংবাদটা দিয়ে গেলাম। কক্ষের অর্গল খুলে ভোলানাথ শান্ত ধীরপদে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

৮

শীতের এক অপরাহ্নে আনন্দচন্দ্র গাঁয়ে ফিরে এল।

কিছুদিন থেকে পিতা ভারতচন্দ্রের স্বাস্থ্যটা ভাল যাচ্ছিল না। বয়সের ভারে যতটা না, ভারতচন্দ্র অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন তার চাইতে ঢের বেশী। দারিদ্র্যের সঙ্গে একটানা যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ইদানীং আর কবিরাজীও করতে পারেন না।

বাইরের ঘরে একটা বালাপোষ গায়ে বসেছিলেন ভারতচন্দ্র, হাতে ধরা গড়গড়ার নলটা, মধ্যে মধ্যে ধূমপান করছিলেন। চোখের দৃষ্টিও ভারতচন্দ্রের স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

আনন্দচন্দ্র প্রথমেই এসে বাইরের ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে ঝাপসা ঝাপসা আলো। সেই স্তিমিত আলোয় পুত্রের দিকে তাকিয়ে ভারতচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কেডা?

—বাবা, আমি। আনন্দচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে পিতার পদধূলি নিল।

—নশো! কখন আলে?

—এই আসছি।

—পরীক্ষা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, পাস করেছি।

—এবারে তোমাকে ডাক্তারি পড়তি হবে বাবা।

—জানি, সামনের মাস থেকে ক্লাস শুরু হবে—

—তাহলি এ সময় আলে ক্যান!

—ক্লাস শুরু হলে তো আর আসতে পারব না। তাই ভাবলাম দেশ থেকে একবার ঘুরে যাই।

—বেশ করিছো।

—বাবা!

—কিছু কতিছো?

—হ্যাঁ। ভাবছি এবারে আর মল্লিককাকার ওখানে থাকব না।

—ক্যান? রাধারমণ কিছু বলিছে?

—না।

—তবে? থাকতি চাও না ক্যান?

—ওদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—

—দুর্ঘটনা!

—হ্যাঁ।

—রাধারমণের মাতৃদেবী—

—না, সেসব কিছু নয় বাবা—

—তয় কি?

আনন্দচন্দ্র তখন সংক্ষেপে সুহাসিনী-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্বিক পিতার গোচরীভূত করল। ঘরের মধ্যে ততক্ষণে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ব্যাপ্ত হয়েছে। ভারতচন্দ্র সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন, তাঁর যেন বাক্যস্ফূর্তি হয় না। রাধারমণ তার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেবার মনস্থ করেছিল, এও কি সম্ভব! কলকাতা শহর সম্পর্কে অনেক কথা তাঁর মধ্যে মধ্যে কানে আসে বটে এবং 'হিতবাদী' পড়েও কিছু কিছু জানতে পারেন।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক কথাই তিনি শুনেছিলেন। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা, বিধবাবিবাহ দেবার প্রচেষ্টা—

কিন্তু কোন ব্যাপারেই ভারতচন্দ্র কোন গুরুত্ব দেননি। অতখানি মনের

প্রসারতাও তাঁর ছিল না।

নবযুগের ধারার সঙ্গে পুত্র যাতে আপনাকে মিলিয়ে চলতে পারে, সেইজন্যই পুত্রকে তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ রাধারমণের সমস্ত কথা শুনে তিনিও যেন চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ভৃত্য এসে ঘরে আলো দিয়ে গেল।

ভারতচন্দ্র বললেন, ঠিক আছে, তুমি ভিতরে যাও। হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলপান খেয়ে বিশ্রাম নাও গে।

আনন্দচন্দ্র নিঃশব্দে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন।

সেই রাত্রেই।

আনন্দচন্দ্র একটা মোটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে শয্যায় শুয়েছিল। মাঘের প্রচণ্ড শীত হাড়-কাঁপানো। ঘরের মাটির দেওয়াল ভেদ করে যেন সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করছে। ঘরের এক কোণে একটা পিলসুজের উপরে প্রদীপ জ্বলছিল।

কলকাতা শহরে তখন হ্যারিকেনের আলো জ্বলে। গ্যাসবাতি তখনো শহরে আসেনি। আসার সময় আনন্দচন্দ্র গোটা দুই হ্যারিকেন বাতি কিনে এনেছিল। তারই একটা প্রজ্বলিত করে পিতাঠাকুরের ঘরে দিয়েছিল।

হ্যারিকেন বাতি দেখে ভারতচন্দ্র খুব খুশী। ঝকঝকে কাচের চিমনি ভেদ করে আলোর প্রভা চারিদিকে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

পুত্রকে শুধান, এটারে কয় কি?

—আজ্ঞে হ্যারিকেন বাতি।

—বেশ আলো হয় তো! রাত্রে এখন আর দেখতি অসুবিধা হবে না।

পিসীরাও ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিল, তারাও আলো দেখে খুশী।

ছোট পিসীমণি তো বললেন, পরের বার যখন আসবা, আরো দুটো বাতি লয়ে আসিস।

পিসীদের ঘরে অন্য বাতিটা পৌঁছে দেয় আনন্দ।

কাঁথার তলে শুয়ে শুয়ে আনন্দচন্দ্রের সারাটা মন তখন যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে অন্নদাসুন্দরী।

দীর্ঘ এক বৎসর পরে আনন্দচন্দ্র গৃহে এসেছে এবারে। এক বৎসর পরে বধূর সঙ্গে দেখা হবে।

ঘরের দরজা ভেজানোই ছিল। অন্নদাসুন্দরী দীর্ঘ একগলা ঘোমটা টেনে

দরজার কবাট দুটো ঠেলে ভিতরে এসে প্রবেশ করল। তারপর ধীরে ধীরে গুণ্ঠন অনেকটা তুলে দিল। এবারে আনন্দচন্দ্র বেশ স্পষ্টই অন্নদাসুন্দরীর মুখখানি দেখতে পাচ্ছে।

কয়েকটি অগোছালো চূর্ণকুন্তল কপালের উপর এসে পড়েছে। নাকের নথের লাল পাথরটা চিকচিক করছে। অন্নদাসুন্দরী একবার আড়চোখে তাকাল অদূরে শায়িত স্বামীর দিকে।

আনন্দচন্দ্র আর চুপ করে থাকতে পারে না, ডাকল—বৌ!

চমকে তাড়াতাড়ি অন্নদাসুন্দরী গুণ্ঠন টেনে দেয়।

—কি হল, আবার ঘোমটা দিলে কেন? এ ঘরে তো আর কেউ নেই।

অন্নদাসুন্দরী নড়েও না চড়েও না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁথার মায়া ছেড়ে উঠে পড়ল আনন্দচন্দ্র এবং অন্নদাসুন্দরীর কাছে এসে তাকে দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে বক্ষের উপর টেনে নিল। অন্নদাসুন্দরী নিজেকে স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে করতে মৃদু আপত্তি জানায়, ছাড়ুন ছাড়ুন—ছোটঠাকরুণ বোধ হয় এখনো বাইরে আছেন!

—থাক। আনন্দচন্দ্র স্ত্রীর কোন আপত্তিতে কর্ণপাত করে না।

রাত্রির শেষ যামে কখন যে অন্নদাসুন্দরী শয্যাত্যাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে আনন্দচন্দ্র টেরও পায়নি। ঘুম ভাঙল তার ছোট পিসীমণির ডাকে। এই নশো, আর কত ঘুমাবি! দাদা তোকে ডাকতিছেন, ওঠ বাবা!

ধড়মড় করে শয্যার ওপরে উঠে বসে আনন্দচন্দ্র।

পাকদুয়োরের ঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়ে আনন্দচন্দ্র ভারতচন্দ্র যে ঘরে বসে ছিলেন সেই ঘরে এসে ঢুকল।

—আমারে ডাকতিছিলেন?

—হ্যাঁ, বোস। কবে যাবা?

—ভাবছি মাসখানেক পরে যাবো।

—না, দেরি কইরো না। যত তাড়াতাড়ি পারো কলকাতায় চলে যাও। দেখো আমিও ভেবে দেখলাম, রাধারমণের গৃহে বোধ হয় তোমার আর না থাকাই ভাল। কলুটোলায় আমাগোর এক জ্ঞাতিভাই নিবারণ থাকে, আমি তোমারে একটা চিঠি দিয়া দেবো, তার ওখানেই তুমি থাকবা। তোমার মেডিকেল কলেজও কাছে হবে, পড়াশুনারও সুবিধা হবে।

—আপনি যেমন আজ্ঞা করবেন।

—হ্যাঁ, সেখানেই থেকে তুমি পড়াশুনা করবা। বুঝিছো ?

—যে আজ্ঞে।

আনন্দচন্দ্র পিতার কথায় একটু বিস্মিতই হয়েছিল। কারণ সে যখন প্রথম কলকাতায় পড়াশুনা করতে যায়, ঐ নিবারণচন্দ্রর ওখানেই গিয়ে সে উঠেছিল। দিন দুই সেখানে ছিলও, তারপরই ভারতচন্দ্র তার থাকবার অন্যত্র ব্যবস্থা করেছিলেন। তাকে চলে যেতে হয়েছিল রাধারমণ মল্লিকের গৃহে। নিবারণচন্দ্র সেনের অবস্থাও রীতিমত সচ্ছল ছিল, তিনি কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের তখনকার দিনে একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন।

ওকালতী ব্যবসায় প্রচুর অর্থাগম হত নিবারণচন্দ্রের। নিজ অর্থে বিরাট বাড়ি তৈরি করেছিলেন নিবারণচন্দ্র। তা ছাড়া দেশে কোটালিপাড়ায় বিস্তর জমিজায়গাও কিনেছিলেন।

নিবারণচন্দ্রের দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী রত্নাবতীর কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় দ্বিতীয়বার কুসুমকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন।

তখনকার দিনে কুসুমকুমারী লেখাপড়া শিখেছিল এবং তার বাপ অনাদিমোহনও সচ্ছল অবস্থার ছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে কুসুমকুমারীর মন অনেকটা সংস্কারমুক্ত ছিল। সে সকলের সামনে বেরুত, সকলের সঙ্গে কথা বলত—ব্যাপারটা নিবারণচন্দ্র রোধ করতে পারেননি। অবশেষে দেখা গেল নিবারণচন্দ্রের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

নিবারণচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতে শুরু করেন। ঐসব কারণেই আনন্দচন্দ্রকে নিবারণচন্দ্রের গৃহে থাকতে দেননি ভারতচন্দ্র।

আনন্দ বললে, নিবারণকাকার ওখানে থাকব ?

—হ্যাঁ, আমি সব দিক বিবেচনা করে দেখলাম সেটাই যুক্তিযুক্ত হবে। তা ছাড়া নিবারণ তোমাকে নানাভাবে সাহায্যও করতে পারবে।

আনন্দচন্দ্র আর কোন কথা বলল না। কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আবার চলে যেতে হবে! আনন্দ ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করল।

তাগিদ দিয়ে দিয়ে ভারতচন্দ্র সাতদিনের দিনই পুত্রকে কলকাতায় রওনা করে দিলেন। এবং এক দ্বিপ্রহরে আনন্দচন্দ্র এসে নিবারণচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হল পিতাঠাকুরের লেখা পত্রখানি হাতে নিয়ে।

সেদিনটা ছিল রবিবার, ছুটির দিন।

আদালত বন্ধ। বাইরের ঘরের বিরাট তক্তোপোশের বিস্তৃত ফরাসের উপর বসে মুহুরি হরিপদর সঙ্গে নিবারণচন্দ্র পরের দিনের একটা মামলা সম্পর্কে কি কি কাগজপত্র নিতে হবে সে-সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। আনন্দচন্দ্রকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন নিবারণচন্দ্র। হাতের পোর্টম্যাণ্টোটা ও ছোট বাঁধা বিছানাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আনন্দচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে নিবারণচন্দ্রের পদধূলি নিল।

—তোমাকে তো চিনলাম না!

সত্যিই নিবারণচন্দ্র চিনতে পারেননি আনন্দচন্দ্রকে। বৎসর পাঁচেক আগে একবার দেখেছিলেন, তারপর তো আর উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। কাজেই না চিনতে পারারই কথা।

—তা কোথা থেকে আসছো?

—ইতনা থেকে।

—ইতনা!

—আজ্ঞে আমি ভারতচন্দ্র মশাই্য়ের পুত্র—

—আরে আরে, ভারতের ছেলে তুমি! এত বড়টা হয়ে গিয়েছো—কলকাতায় কবে এলে?

—আজই।

কথাটা বলে আনন্দচন্দ্র জামার ভিতরের পকেটথেকে ভারতচন্দ্রের দেওয়া পত্রখানি বের করে নিবারণচন্দ্রের হাতে তুলে দিল।—বাবা একটা পত্র দিয়েছেন।

নিবারণচন্দ্র পত্রখানি খুলে পড়লেন। পত্রখানি পড়ার পর আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বেশ বেশ। তুমি ডাক্তারি পড়বে?

—আজ্ঞে পিতাঠাকুরের তাই ইচ্ছা—

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বদ্যিঘরের সন্তান বৈদ্য হবে বৈকি। তা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে—সেখানে কাউকে চেনো?

—না।

—ঠিক আছে, কাল আমি তোমাকে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যাব—ড্রামণ্ড সাহেব আমার বন্ধু, কলেজে মেডিসিন পড়ায় সে, তাকে ধরলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তারপরই উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যকে ডাক দিলেন, শম্ভু—ওরে শম্ভু!

ভৃত্য শম্ভুচরণ এসে কক্ষে প্রবেশ করল, ডাকছেন কর্তা?

—হ্যাঁ, ছোটমা'র কাছে একে নিয়ে যা। ছোটমাকে বলবি এ আমাদের জ্ঞাতিসন্তান, এখানেই থাকবে। এখানে থেকে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়বে। যাও আনন্দ, শম্ভুর সঙ্গে ভিতরে।

আনন্দ পোর্টম্যাণ্টো ও বিছানাটা তুলতে যাচ্ছিল, নিবারণচন্দ্র বাধা দিলেন, থাক থাক ওসবের জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, শম্ভুই ওসব ভিতরে নিয়ে যাবে'খন।

শম্ভুচরণ বুঝতে পেরেছিল আনন্দচন্দ্র ঐ বাড়িরই লোক, তা ছাড়া কর্তাও নির্দেশ দিয়েছেন সোজা একেবারে অন্দরে নিয়ে যেতে। সে আনন্দচন্দ্রকে নিয়ে সোজা দোতলায় একেবারে কুসুমকুমারীর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

শম্ভু ডাকল, ছোটমা!

—কে রে? নারীকণ্ঠে ভিতর থেকে সাড়া এল।

—আজ্ঞে ছোটমা, আমি শম্ভু—

—কি কাম, ভিতরে আয়!

শম্ভুচরণ ঘরের মধ্যে ঢুকল। আনন্দচন্দ্র দালানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুসুমকুমারী ঘর থেকে বের হয়ে এল।

—এসো এসো, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো ঘরে এসো।

কুসুমকুমারীর বয়স বেশী হবে না। বড় জোর ছাব্বিশ কি সাতাশ মনে হয় হবে। পাতলা দোহারা গড়ন। গায়ে ফুলহাতা কামিজ, পরনে সবুজ চওড়া পাড় একটা দামী তাঁতের শাড়ি। দু'হাতে চারগাছা করে সোনার চুড়ি ছাড়া দেহে অন্য কোন অলংকার নেই। সিঁথিতে ও কপালে সিন্দূর।

দেখতে কালো হলেও সারাদেহে যেন অপূর্ব এক লাবণ্য উপচে পড়ছে। পান খেয়েছেন বোধ হয়, ঠোঁট দুটি পানের রসে লাল।

আনন্দচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে কুসুমকুমারীর পদধূলি নিল।

—থাক থাক। বাবুর জ্ঞাতি তুমি?

—আজ্ঞে উনি আমার খুড়োমশাই হন।

ঠিক ঐ সময় দেখা গেল নিবারণচন্দ্র চর্মপাদুকার চট্ চট্ শব্দ করে ঐদিকেই আসছেন, ছোটবৌ ছেলেটিকে বোধ হয় তুমি চিনতে পারনি!

—না। শম্ভু বললে তোমাদের জ্ঞাতি হয়—

—হ্যাঁ, ওর বাবা আর আমি জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই হই—ভারতদাদার বাবা আর আমার বাবা জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাই ছিলেন।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, আনন্দ হিন্দু কলেজ থেকে এবার পাস করেছে, ডাক্তারি পড়বে মেডিক্যাল কলেজে।

—বাঃ !

—ও এখানেই থাকবে, তুমি ওর এখানে থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দাও ছোটবৌ।

—ওকে তাহলে নীচের তলায় যেখানে সদানন্দ থাকত, সেই ঘরটা তো সে চলে যাবার পর থেকে খালিই পড়ে আছে, সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিই !

—তুমি যা ভাল বোঝ ছোটবৌ তাই কর। নিবারণচন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

—আমি তো তাহলে তোমার কাকীমা হই, কি বল আনন্দ! কুসুমকুমারী বললে।

—হ্যাঁ, কাকীমা।

—চল তোমাকে তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই। ভালই হল, তোমার কাকাবাবু তো সর্বদাই আদালত আর মক্কেল নথিপত্র নিয়েই ব্যস্ত আর আমার দিদি সর্বদাই পূজাআর্চা নিয়ে ব্যস্ত, একদণ্ড যে কথা বলব কারো সঙ্গে এমন একটি প্রাণী এ বাড়িতে নেই। তোমার সঙ্গে কথা বলে বাঁচব, চল।

নীচের ঘরটি বেশ প্রশস্ত। একেবারে রাস্তার উপরে, প্রচুর আলোহাওয়া।

কুসুমকুমারীই দাঁড়িয়ে থেকে নিজে ভৃত্যকে আদেশ দিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিল।

সন্ধ্যার দিকে ভৃত্য ঘরে সেজবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আনন্দচন্দ্র জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল।

কুসুমকুমারী এসে ঘরে ঢুকল, আনন্দ!

—আসুন কাকীমা। বসুন।

—তুমিও বোস। কুসুমকুমারী চৌকির উপর বসতে বসতে আনন্দকেও আহ্বান জানাল। কুসুমকুমারী ইতিমধ্যে শাড়ি বদলেছে। কেশ প্রসাধন করেছে। কালোপাড় শান্তিপুরী দামী শাড়িতে যেন তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

—আনন্দ!

—বলুন ?

—তুমি মধুসূদনের বই পড়েছ ?

—পড়েছি, মেঘনাদ বধ কাব্য—

—তাহলে পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও তুমি পড়াশুনা কর !

নতমুখে স্মিত হাসি হাসে আনন্দচন্দ্র।

৯

সে এমন একটি কাল, এমন একটি সময়, বিশেষ ভাগীরথী-তীরবর্তী কলকাতা শহরে, যার বৈভব যার ঐশ্বর্য তখন বিশেষ এক সমাজকে কেন্দ্র করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অনেক মনীষীর ভিড় তখন কলকাতা শহরে, যাঁরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এক যুগ-সন্ধিক্ষণের সূচনা করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৪-১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল বলা যায় এবং ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৩ সালকে বলা চলে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজনের বা পত্তনের সূচনাকাল এবং সেটা ছিল বিদ্যাসাগরের যুগ।

ঐ যুগেই ঘটে গেল সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভূমিতে নীল চাষ নিয়ে হাঙ্গামা। আনন্দচন্দ্র তখন যৌবনে পা ফেলেছে। সব কিছুই তার চোখের সামনে ঘটেছে।

আনন্দচন্দ্র নিবারণচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে যে ছেলেটিকে দেখামাত্র ভাল লেগেছিল সে হচ্ছে মধুসূদন গুপ্ত। রোগা পাতলা দোহারা চেহারা, টকটকে গোরাদের মত গাত্রবর্ণ। মুখখানি কিন্তু অনেকটা মেয়েলী ঢংয়ের। মধুসূদনের বাবা রামপ্রাণ গুপ্ত মশাই একটা ইংরেজী সওদাগরী হৌসে চাকরি করেন। অত্যন্ত সাহেব-ঘেঁষা মানুষটি। খিদিরপুরের দিকে বিরাট বাড়ি, একেবারে সাহেবী কেতায় সাজানো-গোছানো। সাহেব-মেমদের নিয়ে প্রায়ই খানাপিনা করেন।

ঐ একটিমাত্র ছেলে মধুসূদন। তাও অনেক বয়সের সন্তান।

খুব ছোটবেলাতেই রামপ্রাণ গুপ্ত বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু চৌত্রিশ বৎসর বয়সেও যখন কোন সন্তান-সন্ততি হল না, রামপ্রাণের মা ও বাবা পুত্রের আবার বিবাহ দেবার জন্য জেদাজেদি করতে লাগলেন। কিন্তু রামপ্রাণকে সম্মত করতে পারলেন না, তাঁর এক কথা, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করব না।

—সাত পুরুষ নরকস্থ হবে ! বাবা বললেন।

—হোক।

রামপ্রাণ হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন, ডিরজিওর ছাত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন না পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।

স্ত্রী কমলসুন্দরীও স্বামীকে অনুরোধ করেছেন বিবাহ করার জন্য কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে রামপ্রাণ কর্ণপাত করেননি।

কমলের বয়েস যখন প্রায় ত্রিশ, মধুসূদন গর্ভে এল।

নির্দিষ্ট সময়ে পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠল গৃহ।

বাঈজী নাচ, খেমটা নাচ, কবির লড়াই—রামপ্রাণ কিছুই বাদ দিলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় পিতামাতা তখন আর জীবিত ছিলেন না।

মধুসূদন আনন্দচন্দ্রের এক বৎসর আগে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তীক্ষ্ণধী ছাত্র, সকলের প্রিয়। কিন্তু ধনীর আদরের দুলাল, বিলাসী ও খেয়ালী।

ঝকঝকে ব্রুহামে চেপে মধুসূদন প্রত্যহ কলেজে আসত। সাহেবদের মত তার বেশভূষা। প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হয়েছিল আনন্দচন্দ্র মধুসূদনের প্রতি। কিন্তু সাহস করে এগিয়ে যেতে পারেনি আলাপ করতে।

সেদিন বাইরে অঝোরধারায় বৃষ্টি নেমেছিল। যদিও নিবারণচন্দ্রের গৃহ খুব কাছেই, ঐ মুষলধারায় বৃষ্টির মধ্যে আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে বেরুতে পারছিল না। গেটের একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল আনন্দচন্দ্র।

কিছু বইখাতা বগলে নিয়ে ঐ সময় মধুসূদন বের হয়ে এল ক্লাস থেকে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। যেমন বৃষ্টি তেমনি প্রচণ্ড হাওয়া।

মধুসূদনই এগিয়ে এল আনন্দর সামনে। বললে, বৃষ্টির জন্য আটকা পড়েছেন মনে হচ্ছে?

সলজ্জ হাসি হাসে আনন্দচন্দ্র।

—চলুন আমার গাড়ি আছে সঙ্গে।

—না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। বৃষ্টি একটু পরেই হয়তো থেমে যাবে, তখন বাড়ি যাব।

—না মশাই, বৃষ্টির যা প্রচণ্ডতা দেখছি, সহজে থামবে বলে মনে হয় না। দেখছেন না আকাশ কি রকম কালো হয়ে আছে মেঘে!

—তা হোক। আনন্দ বললে।

—চলুন চলুন, হয়তো সারারাত এ বৃষ্টি থামবে না!

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু নয়, আসুন আমার সঙ্গে।

আর আপত্তি জানাতে পারে না আনন্দচন্দ্র। মধুসূদনের সঙ্গেই ব্রুহামে গিয়ে উঠে বসল।

—কি নাম আপনার?

—আনন্দচন্দ্র গুপ্ত শর্মা।

—আপনিও গুপ্ত ?

—হ্যাঁ। আপনিও তো গুপ্ত!

—আপনি জানেন আমার নাম ?

—জানি। কলেজের সেরা ছাত্র মধুসূদন গুপ্তকে কে না জানে!

—আমার সম্পর্কে আর কি শুনেছেন ?

—আর আবার কি শুনব! আনন্দচন্দ্র বলে।

—কেন, শোনেননি বড়লোকের ছেলে, অহংকারী—

—কই না তো!

—শোনেননি! হা হা করে হেসে ওঠে মধুসূদন গুপ্ত। দরাজ দিলখোলা হাসি মধুসূদনের। আপনার দেশ কোথায় ?

—ইতিনা গ্রামে, যশোহরে—

—যশোহর মানে আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদনের দেশে ?

—হ্যাঁ। তিনি সাগরদাঁড়ির ছেলে—

—ঐ হল। যশোহরেই তো। সত্যি অদ্ভুত কবিপ্রতিভা!

নিবারণচন্দ্রের গৃহ খুব সন্নিকটেই। ব্রুহাম গাড়ি এসে নিবারণচন্দ্রের গৃহের সামনে দাঁড়াল।

—এইখানে থাকেন আপনি ?

—হ্যাঁ, এইখানে থেকেই পড়াশুনা করি।

—এ বাড়ি কার ?

—আমাদের এক আত্মীয়ের, নিবারণচন্দ্র সেন মশাই। চলুন না একটু বসে যাবেন, যদি আপত্তি না থাকে—

—আপত্তি! আপত্তি কিসের ? তবে বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে—

—আসুন, নামুন—সে ব্যবস্থা হবে।

ব্রুহাম থেকে নেমে দুজনে এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কুসুমকুমারী ঘরেই ছিল। আনন্দকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, গাঁড়ি গিয়েছিল আনন্দ ?

—গাড়ি!

—হ্যাঁ। বৃষ্টি দেখে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

—আমি এঁর গাড়িতে চলে এলাম। উনিই জোর করে নিয়ে এলেন আমাকে।

এতক্ষণে কুসুমকুমারীর মধুসূদনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

—ছেলেটি কে আনন্দ ?

মধুসূদনই এগিয়ে এল। পরিচয় দিল নিজের, আমার নাম মধুসূদন গুপ্ত।

মধুসূদনের সুশ্রী চেহারা, সাহেবী বেশভূষা, টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ—কুসুমকুমারী ভেবেছিল বুঝি কোন ইংরেজ।

—কাকীমা!

—কিছু বলছিলে আনন্দ ?

—মধুসূদনবাবুর খুব ক্ষুধা পেয়েছে—

—বসো বসো তোমরা, আমি খাবার আনছি। ত্বরিৎপদে কুসুমকুমারী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মধুসূদন ঘরের চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বিলাসের প্রাচুর্য না থাকলেও মেহগনি কাঠের পালঙ্ক, তার ওপরে শয্যা বিছানো, একটি টেবিল, একটি চেয়ার, একটা আলমারি—সব কিছু গোছানো।

—এই ঘরে আপনি থাকেন ? মধুসূদন প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, বসুন না।

—হুঁ বসছি, কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে। মধুসূদন বললে।

—কি কথা ?

—ঐ আপনি-আপনি নয়, তুমি!

—তুমি ?

—হ্যাঁ, তুমি সম্বোধনই দুজনের মধ্যে থাক। কি, আপত্তি আছে ?

—না, আপত্তি কি!

—ব্যাস। তুমি'র মধ্যে একটা কাছাকাছি আপন-আপন ভাব আছে—মধু আর আনন্দ!

বাইরে বৃষ্টি তখনো অঝোরে ঝরে চলেছে। মেঘে মেঘে সারা আকাশ মসীবর্ণ। ঘরের মধ্যেও অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল।

ভৃত্য একটা সেজবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপরে বাতিটা রেখে চলে গেল।

—বাড়িতে ফিরতে হয়ত দেরি হবে মধু।

—তা হোক।

—বাড়ির লোকেরা হয়ত চিন্তা করবেন।

—চিন্তা করবেন না।

—বাবা ?

—না, বাবা আমার অদ্ভুত মানুষ—

—কি রকম ?

—তাঁর মতে ছেলেকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে সে সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না।

—সত্যি নাকি !

—হ্যাঁ।

—আর মা ?

—মা !

—হ্যাঁ, মা। তোমার মা ?

—মাকে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি রুগ্না—

—রুগ্না !

—হ্যাঁ, আমার জন্মের পর থেকেই রুগ্না ছিলেন, এখন তো শয্যাশায়ী।

—কি অসুখ ?

—ড্রামণ্ড সাহেব তো কতবার মাকে দেখেছেন, বলেন, মাসকুলার অ্যাট্রফি—

—একেবারেই হাঁটাচলা তাহলে বন্ধ বল !

—হ্যাঁ, মাকে দেখলে আমার দুঃখ হয়।

কুসুমকুমারী ঐ সময় ভৃত্যের হাতে দুটি থালায় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

মধুসূদন বলে ওঠে, এ কি করেছেন কাকীমা ! এত কে খাবে ?

—কেন তোমরা—

—না, কাকীমা। তাহলে আর বাড়ি পৌছাতে হবে না আজ রাত্রে—

—কি যা তা বলছ ! ছেলেমানুষ বয়স, খেয়ে নাও।

—ছেলেমানুষ আর নই কাকীমা, বাইশ বছর বয়স চলেছে, অবিশ্যি আনন্দর কত বয়স জানি না।

আনন্দ বললে, একুশ।

—তাহলে তো ছেলেমানুষ কেউই আমরা আর নই।

—একুশ বাইশ কি একটা বয়স নাকি, নাও নাও শুরু কর। কই শুরু করো !

খেতে খেতেই নানারকম গল্প চলে।

কুসুমকুমারী বলে, মধ্যে মধ্যে এস মধু—

—আসব কাকীমা।

—আনন্দ ওকে নিয়ে এস। কুসুমকুমারী বললে।

হাসতে হাসতে মধুসূদন বললে, ওকে আনতে হবে না, আমি আসব কাকীমা।

—আর কয়েকটা নারকেলের নাড়ু দেব মধু? কুসুমকুমারী বলেন।

—না না, আর একটুও জায়গা নেই কাকীমা পেটে। তবে কয়েকটা নাড়ু আপনি দিতে পারেন, সঙ্গে করে নিয়ে যাব—সত্যিই চমৎকার হয়েছে নাড়ুগুলো। বাড়িতে তো আর আমাদের এসব হয় না।

—কেন, তোমার মা নাড়ু তৈরি করেন না?

জবাব দিল আনন্দ, ওর মা খুব অসুস্থ কাকীমা—

—আহা, তাই বুঝি? কি অসুখ তাঁর?

—শরীরের মাংসপেশী শুকিয়ে যাচ্ছে।

—সে আবার কি!

—মা হয়ত খুব চিন্তা করছেন। মধুসূদন বললে, এবারে আমি উঠি কাকীমা।

মধুসূদন অতঃপর বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাইরে বৃষ্টি তখনো থামেনি।

রাত্রি প্রায় ন'টা হল, এখনো বৃষ্টি ঝরেই চলেছে।

নির্জন রাস্তা ধরে ব্রুহাম গাড়ি ছুটে চলে অন্ধকারে। জোড়া ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ একটানা শোনা যায়।

খিদিরপুর অনেকটা পথ। রাত্রি পৌনে এগারটা নাগাদ মধুসূদনের গাড়ি এসে গৃহে পৌঁছাল।

রামপ্রাণ গুপ্ত জেগেই ছিলেন। পুত্রের এত ফিরতে তো কখনো দেরি হয় না। তা ছাড়া প্রচণ্ড বর্ষণ সেই বিকেল থেকে। রামপ্রাণ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন। গাড়ির শব্দ ও ঘণ্টা শুনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ান রামপ্রাণ, মধু এলে?

পিতার কণ্ঠস্বর শুনেই মধুসূদন বুঝতে পারে, প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব হওয়ায় কলেজ থেকে উৎকণ্ঠিত পিতা এখনো জাগ্রত এবং তারই পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন।

মধুসূদন গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে বৈঠকখানায় রামপ্রাণের সামনে দাঁড়াল।

—এত বিলম্ব হল তোমার? কি হয়েছিল? পথে কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো?

—আজ্ঞে না।

—তবে এত বিলম্ব কেন?

—কলুটোলায় আমার এক সহাধ্যায়ীর সঙ্গে তার গৃহে গিয়েছিলাম।

—তা সে কথা তোমার গর্ভধারিণীকে বলে গেলেই তো পারতে। জান তো তিনি অসুস্থ, সহজেই অত্যধিক চিন্তিত হন।

—বৃষ্টির জন্য সহাধ্যায়ীকে তার গৃহে পৌঁছে দিতে গিয়ে, গল্প-গুজব করতে করতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছে।

—যাও, তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে দেখা করে এসো।

মধুসূদন কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

দ্বিতলে একটা কক্ষে কমলসুন্দরী থাকতেন।

বৃহৎ এক পালঙ্কের উপর শয্যা পাতা—সেই শয্যাতেই থাকতেন কমলসুন্দরী। বেশীর ভাগ সময় শুয়েই থাকতেন। কখনো কখনো বসেও থাকতেন। একজন সর্বক্ষণের দাসী ছিল—সে-ই দেখাশুনা করত। সামান্য যাতায়াত ছিল পাশের ঠাকুরঘরে।

উপাধানের ওপরে ভর দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন কমলসুন্দরী। রুগ্ন-কঙ্কালসার দেহ।

এককালে তাঁর রূপের অবধি ছিল না। কিন্তু আজ সে রূপের ওপরে যেন গ্রহণ লেগেছে।

মাংসপেশী শুকিয়ে গিয়ে অস্থিচর্মসার হাত-পা।

—মা!

—এলি বাবা?

মধুসূদন জননীর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে একটি সেজ-বাতি জ্বলছিল। সারাটা রাত্রিই ঐ বাতিটি জ্বলে।

—এত বিলম্ব কেন?

—খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন বুঝি!

—হব না, বাইরে কি দুর্যোগ! আজ বৌমা এসেছে তার পিতৃগৃহ থেকে।

মধুসূদন বুঝতে পারে, তার স্ত্রী নীরজা পিতৃগৃহ হতে এসেছে।

১০

নীরজা—অর্থাৎ নীরজাসুন্দরী।

চার বৎসর পূর্বে মধুসূদনের সঙ্গে দশ বৎসরের বালিকা নীরজাসুন্দরীর বিবাহ হয়েছিল। নীরজাসুন্দরীর পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে। সেখানে নীরজাসুন্দরীর পিতা

অক্ষয়চন্দ্র সেন মশাই একসময় নীলকুঠির ম্যানেজার ছিলেন। একজন বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ। নীরজাসুন্দরী অক্ষয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

অক্ষয়চন্দ্রের বিরাট বসতবাটি, চাষের জমি, গৃহে গোলাভরা ধান, গোশালে গরু—এমন কি হাতিশালে হাতিও আছে।

অক্ষয়চন্দ্রের ঐ একটি মাত্রই কন্যা। দেখতেও নীরজাসুন্দরী অপরূপ সুন্দরী। ধনী এবং স্বঘর ও সুন্দরী বলেই মধুসূদনের পিতা রামপ্রাণ গুপ্ত নীরজাকে পছন্দ করেছিলেন এবং একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

কন্যা এতদিন বালিকা ছিল, তাই পিতৃগৃহেই ছিল। চার বৎসর পরে আজ সে এসেছে স্বামীর ঘর করতে। সকালেই অক্ষয়চন্দ্র কন্যাকে তার শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

রামপ্রাণ তখন গৃহে ছিলেন না।

তাহলেও স্ত্রী কমলাসুন্দরী দাসীকে দিয়ে বেয়াইমশাইকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন আহারাদি করে তারপর যান।

কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র জবাব দিয়েছেন, তুমি বেয়ান ঠাকরুণকে বলো, নাতি-নাতনী না জন্মালে তো এ গৃহে অন্নগ্রহণ করতে পারি না। তা তিনি কেমন আছেন ?

দাসী শ্যামা বলে, কই আর আছেন গো, একেবারেই শয্যাশায়ী।

—আহা! তা কি একেবারেই হাঁটা-চলা করতে পারেন না ?

—না।

—তবে তো খুব কষ্ট বেয়ান ঠাকুরুণের।

—তা কষ্ট বৈকি—

—তা তাঁর দেখাশোনা কে করে ?

—আমিই করি—শ্যামা বলে।

—তাঁর সঙ্গে একটিবার দেখা হয় না ? বেয়াইমশাইয়ের সঙ্গে তো দেখাই হলো না। জামাই বাবাজীও গৃহে নেই—কলেজে।

—আপনি বসেন আজ্ঞে। মাকে আমি খবর দিচ্ছি।

অক্ষয়চন্দ্র একটা কৌচের উপর উপবেশন করলেন। বিরাট কক্ষ। দেওয়ালগিরি ঝাড়বাতি। দেওয়ালে দেওয়ালে সব ইংরেজ মেমসাহেবদের ছবি মোটা মোটা সোনালী কারুকার্যখচিত ফ্রেমে।

কোন এক ইংরেজ হৌসে চাকরি করেন বেয়াইমশাই। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, অক্ষয়চন্দ্র জানতেন। কখনো তিনি আশা করেননি মেয়ের এমন ধনীগৃহে বিবাহ হবে। তাঁর নয়—বলতে হবে তাঁর কন্যারই ভাগ্য। তার ভাগ্য

সুপ্রসন্ন ছিল বলেই কন্যা তাঁর এই গৃহে বধূ হয়ে এসেছে।

আহা, সুখে থাক নীরজা।

দাসী এসে ঘরে ঢুকল। বললে, চলুন বাবু।

—যাবো?

—হ্যাঁ, আসুন।

কমলাসুন্দরী তাঁর নিজকক্ষে বিরাট এক পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। মাথায় গুণ্ঠন টানা, গায়ে একটা চাদর। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কন্যা নীরজাসুন্দরী।

অক্ষয়চন্দ্র বললেন, আপনার পুত্রবধূকে আপনার চরণে রেখে গেলাম বেয়ান ঠাকরুণ। নিজগুণে ওর সব দোষত্রুটি ক্ষমা করে নেবেন। গত বৎসরেই আসতাম, কিন্তু শুনেছেন তো—আমার গৃহেও বিপর্যয় ঘটে গেল। গৃহিণী অকস্মাৎ দুদিনের জ্বরবিকারে চলে গেলেন। তা ছাড়া গত বৎসর দিনও ভাল ছিল না। বেয়াইমশাইকে সবই আগে জানিয়েছিলাম।

কমলাসুন্দরী কোন কথা বলেন না।

বলে তাঁরই ইঙ্গিতে দাসী শ্যামা, বললে, মা সবই জানেন।

—আপনারও যেমন ঐ পুত্র একটিমাত্র সন্তান, আমারও ঐ কন্যাটি একটিমাত্র সন্তান, সবই আপনি জানেন বেয়ান ঠাকরুণ। মাতৃহারা ওকে আপনার চরণাশ্রয়েই সঁপে গেলাম।

অতঃপর কিছু জলযোগ করে অক্ষয়চন্দ্র বিদায় নিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র বিদায় নেবার পর কমলাসুন্দরী পুত্রবধূকে পাশে টেনে নিলেন।

—এতদিনে এই চিররুগ্না মায়ের কথা তোর মনে পড়লো রে?

—মা!

—কি বল?

—গত বৎসর আমাকে আমার বাবা পাঠাতে পারেননি বলে শ্বশুরঠাকুর খুব রাগ করেছেন, না মা?

কমলাসুন্দরী স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, না রে না, রাগ করবেন কেন?

—বাবার তো আর কেউ নেই, একা একেবারে, তাই একটু গোছগাছ করে দিয়ে এলাম।

—বেশ করেছিস।

—অত্যন্ত ভোলা-প্রকৃতির মানুষ বাবা। স্নান-খাওয়ার কথা কিছুই তাঁর মনে থাকে না। আমি চলে এলাম, এখন কে যে তাঁকে দেখবে। হয়তো সময়মত স্নানাহারই হবে না।

—বাড়িতে কোন আত্মীয়পরিজন নেই আর তোদের, যে বেয়াইমশাইকে দেখাশোনা করতে পারে?

—আছেন আমার এক বিধবা কাকীমা, তা তাঁরও তো কাজকর্ম করবার তেমন শক্তি নেই।

—কেন?

—বাতব্যাধিতে প্রায় অশক্ত, অক্ষম। কোনমতে চলাফেরা করেন।

—তবে তো বেয়াইমশাইয়ের সত্যিই বড় কষ্ট হবে রে। যা মা, এবারে হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দে। কমলাসুন্দরী শ্যামাকে বললেন, অন্য এক দাসী মানদাকে ডেকে নীরজার সব ব্যবস্থা করে দিতে।

কেবল যে রামপ্রাণ গুপ্তরই নীরজাসুন্দরীকে দেখে পছন্দ হয়েছিল তা নয়, পুত্র বিবাহ করে বধূ নিয়ে ফিরে এলে বালিকাবধূর মুখখানির দিকে তাকিয়ে কমলাসুন্দরীর দুটি চক্ষুও যেন জুড়িয়ে গিয়েছিল। আহা, যেন লক্ষ্মী প্রতিমাটি।

রামপ্রাণ স্ত্রীকে শুধিয়েছিলেন, গিন্নী, এ পুত্রবধূ তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, যেন লক্ষ্মী প্রতিমাটি।

—তোমার তো ভয়ই ছিল, তাই না?

—ভয় কেন থাকবে?

—ছিল না, সত্যি বলছো?

—সত্যিই বলছি। একটিমাত্র পুত্র আমাদের, তুমি কি আর না দেখেশুনে যাকে তাকে ঘরে নিয়ে আসবে!

—তাহলে খুশী হয়েছো বল?

কমলাসুন্দরী স্বামীর কথার প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসেছিলেন কেবল।

বৌমা এসেছে শুনেও পুত্রের দিক থেকে কিন্তু কোন সাড়াই এলো না।

—যা বাবা, আর দাঁড়িয়ে থাকিস না। অনেক রাত হয়েছে, এবার বিশ্রাম কর।

—কখন এলেন তোমার বৌমা, মধুসূদন বললে।

—এই বেলা সোয়া দশটা নাগাদ। তোর শ্বশুরমশাই এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে, এসে আমার কত সেবা করছে।

মধুসূদন ধীরে ধীরে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। দ্বিতলের একটি কক্ষে তার শয্যাগৃহ।

মধুসূদন এসে সেই কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষের মধ্যে সেজবাতি জ্বলছে। উজ্জ্বল আলোয় কক্ষ উদ্ভাসিত। দামী বেনারসী শাড়ি পরিহিতা সালংকারা

বধূ আবক্ষ গুণ্ঠন টেনে পালঙ্কের একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, মধুসূদন এসে কক্ষে প্রবেশ করে অবগুণ্ঠনবতী বধূর দিকে তাকাল।

দীর্ঘ চার বৎসর আগেকার কথা মধুসূদনের ঠিক মনে নেই।

তা ছাড়া মধুসূদন সেদিন আগ্রহ নিয়ে তেমন বধূর মুখের দিকে তাকিয়েও দেখেনি। বিবাহ করতে হয় সে করেছে, পছন্দ-অপছন্দের কোন কথাই ছিল না।

এই দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে যদি নীরজা এ গৃহে আসত তাহলেও কথা ছিল, কিন্তু তাও হয়নি। তার নবযৌবনের কুসুমিত মনে আজ অন্য একটি ছায়া পড়েছে। সে নীরজাসুন্দরী নয়, সে কাদম্বিনী। সহপাঠী যতীশচন্দ্র বোসের বোন, বেথুন স্কুলের ছাত্রী।

যতীশচন্দ্রের পিতা অবিনাশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের একজন পাণ্ডা। ওদের সকলেরই ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আছে।

চমক ভাঙ্গল মধুসূদনের নীরজাসুন্দরী তার পদস্পর্শ করায়। নীরজাসুন্দরী তার পদধূলি নিচ্ছে।

—থাক, থাক। সরে গেল মধুসূদন।

বধূ নীরজা মুখ তুলল। মাথার গুণ্ঠন ঈষৎ স্খলিত হয়ে অর্ধেক কপালের ওপরে উঠে গিয়েছে। অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ঘরের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়। নীরজাসুন্দরী ঊর্ধ্বমুখী হয়ে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করে।

—আপনি কি আমার উপরে রাগ করেছেন, গত বৎসর আসতে পারিনি বলে?

—কেন, রাগ করবো কেন?

—তবে আমার প্রণাম নিলেন না কেন?

মধুসূদন স্ত্রীর কথার কোন জবাব দিল না। সরে গেল কিছুটা দূরে। কলেজের জামা-কাপড় ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাত-মুখ ধুয়ে এল।

ঘরে এসে দেখে মাটিতে আসন বিছিয়ে মধুসূদনের আহার্য থালায় সাজিয়ে নীরজাসুন্দরী একটা পাখা হাতে বসে আছে।

মধুসূদন তাকালও না। আসনে উপবিষ্ট হয়ে আহার শুরু করল।

—থাক, বাতাস করতে হবে না।

নীরজাসুন্দরীর হাতের আন্দোলিত পাখা থেমে গেল।

—তুমি যাও না, শুয়ে পড় গিয়ে, রাত অনেক হয়েছে।

—আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

—কিন্তু ওভাবে বসে থেকেই বা লাভ কি। আমার শুতে দেরি আছে।

কলেজের অনেক পড়া তৈরি করবার আছে। যাও শুয়ে পড় গিয়ে।

নীরজা কিন্তু তথাপি স্থানত্যাগ করে না।

আহারাদির পর হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করে পাশের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল মধুসূদন সোজা। কক্ষটি তার শয়নকক্ষেরই সংলগ্ন। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, রাশীকৃত পাঠ্যপুস্তক।

জানালাটা খুলে দিল মধুসূদন।

বাড়ির পশ্চাৎদিক। ঐদিকে একটা বিরাট বাগান আছে। এখনো গাছের পত্র হতে পত্রান্তরে বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় সেই শব্দ থেমে যাওয়া গানের সুরের রেশের মত মনে হয়। জলো হাওয়া আসছে খোলা জানালাপথে।

পাশের ঘরে যে মেয়েটি তার স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে আজ এ গৃহে এসে উপস্থিত হলো, তাকে তো সে অস্বীকার করতে পারবে না। মন্ত্রোচ্চারণ করে অগ্নি নারায়ণ শিলাকে সামনে রেখে যার পাণিগ্রহণ সে করেছে, তার দাবিকে সে অস্বীকার করবে আজ কেমন করে?

অথচ মনের কোথায়ও সে কোন সাড়া পাচ্ছে না। সে কি মন্ত্রোচ্চারণ করে বলেনি, ওঁ মম ব্রতে তে নম হৃদয়ং দধাতু! নেই, নেই—তার হৃদয়মধ্যে নীরজা-সুন্দরীর জন্য বুঝি কোন স্থানই সে দিতে পারছে না। তার মনের সমস্তটুকু স্থান জুড়ে রয়েছে কাদম্বিনী। সহপাঠী যতীশচন্দ্রের সহোদরা কাদম্বিনী। বেথুন স্কুলের ছাত্রী কাদম্বিনী। তার কথা, তার হাসি।

মনে পড়ে যায় মধুসূদনের একটা দিনের কথা।

কাদম্বিনী বলেছিল, মধুসূদনবাবু, দাদা বলছিল আপনার নাকি বিবাহ হয়ে গিয়েছে?

মধুসূদন বিব্রত বোধ করেছিল কাদম্বিনীর কথায়। কি বলবে বুঝতে পারে নি।

—একদিন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন?

—সে তো এখানে থাকে না।

—থাকে না? সে কি!

—বিবাহের পর থেকে সে পিতৃগৃহেই আছে।

—একেবারে বাচ্চা বুঝি?

—হ্যাঁ, মানে—

—এখনো পুতুল নিয়ে খেলা করে বুঝি?

—তা তো জানি না।

—আপনি যান না?

—কোথায়?

—মধ্যে মধ্যে আপনি আপনার শ্বশুরগৃহে যান না?

—না।

—কেন?

—এমনি।

—বৌকে আপনার দেখতে ইচ্ছা করে না, বলুন না তার এখন বয়স কত?

—কার?

—আহা, আপনার স্ত্রীর! হাসতে হাসতে কাদম্বিনী বললে।

—ঠিক জানি না।

—ওমা সে কি? স্ত্রীর খবর রাখেন না?

—এই বোধ হয় তেরোয় পড়েছে।

—তবে তো সে কিশোরী। জানেন মধুসূদনবাবু, আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

—কাকে?

—আপনার স্ত্রীকে। আহা, কি নাম তার?

—নীরজাসুন্দরী।

—বাঃ, বেশ নামটি।

—তুমি মনে মনে যা ভাবছো কাদম্বিনী তা নয়।

—কি নয়?

—সে তোমার মত লেখাপড়াও জানে না, তোমার মত করে কথাবার্তাও বলতে পারে না। তুমি তার সঙ্গে আলাপ করতে যাবে, সে হয়ত একগলা ঘোমটা টেনে বসে থাকবে।

—ওমা, তাই বুঝি!

—তোমাদের মত সে সায়া-কামিজও গায়ে দেয় না।

—তা হোক, তবু তার সঙ্গে আলাপ করব। বললে কাদম্বিনী।

পুরুষের সামনে বেরুতে, কথা বলতে কাদম্বিনীর কোন সংকোচ নেই। মধুসূদন কাদম্বিনীর কাছে চা খেতে শিখেছে। আগে সে কখনো চা পান করত না।

কাদম্বিনী বলেছিল একদিন, আপনি চা খান না, কেমন মানুষ আপনি!

পাশেই বন্ধু যতীশচন্দ্র উপস্থিত ছিল। সে হাসতে হাসতে বললে, অথচ জানিস কাদু, ওর বাবা রীতিমত সাহেব। নিত্য তাঁর বাড়িতে সাহেব-মেমদের

আনাগোনা। খানাপিনা তো লেগেই আছে নিত্যদিন।

—সত্যি মধুসূদনবাবু?

—হ্যাঁ। বলেছিল মধুসূদন, আমার মা ওসব পছন্দ করেন না, তাই—

—জানিস কাদু, মধু ভীষণ মাতৃভক্ত! রোজ সকালে মার পাদোদক নেয়।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, আমি কোন ঠাকুরদেবতা মানি না। মা-বাবাই আমার কাছে সাক্ষাৎ দেব-দেবী। মধুসূদন বললে।

কাদম্বিনী চমৎকার গানও গায়।

ব্রহ্ম-সংগীত ওর কণ্ঠে শুনতে ভারি ভাল লাগে।

হঠাৎ একসময় মধুসূদনের খেয়াল হলো রাত্রির তৃতীয় যামও উত্তীর্ণপ্রায়। ঠায় তখন থেকে সে জানালার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। মধুসূদন পাঠগৃহকক্ষ থেকে বের হয়ে পায়ে পায়ে এসে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

কক্ষের মধ্যে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল মধুসূদন।

পালঙ্কের উপর বসে বাজুতে মাথাটা হেলিয়ে বসে আছে নীরজাসুন্দরী। গুণ্ঠন স্খলিত হয়ে পড়েছে কাঁধের উপর। বক্ষের বাস কিছুটা শিথিল, দু'টি চক্ষু মুদ্রিত। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

নীরজাসুন্দরী সত্যিই সুন্দরী। টানাটানা দুটি ভ্রূ। কপালের ওপরে দু'একটি স্থানভ্রষ্ট কুন্তল এসে পড়েছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মধুসূদন সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখচন্দ্রিমার দিকে। নিজের অজ্ঞাতে বুঝি দু'পা এগিয়েও যায় সামনের দিকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিদ্রাভঙ্গ হলো নীরজার। সম্মুখে সে স্বামীকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, স্খলিত গুণ্ঠন মাথার ওপরে টেনে দেয়।

মধুসূদন কোন কথা বলল না, সোজা গিয়ে শয্যায় গা ঢেলে দিল। নীরজা-সুন্দরী একটু ইতস্তত করে শায়িত মধুসূদনের পদতলে উঠে বসল পালঙ্কের ওপরে নিঃশব্দে। তারপর তার পায়ের উপর কোমল দুটি করপল্লব রেখে বুলাতে শুরু করতেই মধুসূদন তার পা দুটো টেনে নিল।

—ওসব করতে হবে না। আমি ওসব পছন্দ করি না। মধুসূদন বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বললে।

—সব স্ত্রীই তো তাদের স্বামীর পদসেবা করে। মা'র কাছে ঠাকুরমার কাছে শুনেছি। নিম্নকণ্ঠে নীরজা বললে।

—ওসব সেকেলে কুসংস্কার। আমার মা ওসব করেন না।

—আপনি আমার ওপরে ক্রুদ্ধ হয়েছেন বুঝতে পারছি। নীরজা বললে।

মধুসূদনের দিক থেকে কোন সাড়া এলো না।

—আমি অবোধ মেয়েমানুষ, যদি কিছু অপরাধ আমার হয়েই থাকে—

—কোন অপরাধ তুমি করো নি। আমার ঘুম পাচ্ছে, আমাকে এবারে একটু ঘুমাতে দাও।

নীরজা আর স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর দিল না। শয্যা থেকে ভূমিতলে অবতরণ করে ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে নিদ্রা আসে না তার।

১১

খোলা জানালাপথে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া আসছে থেকে থেকে।

আবার বোধ করি ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয় বাইরে। নিদ্রাহীন চক্ষু দুটি নীরজাসুন্দরীর জলে ভরে যায়, বাধাহীন অশ্রুধারা গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করতে থাকে।

ছোটবেলা থেকে নীরজা শিবপূজা করে এসেছে।

তাই বিবাহের সময় তরুণ যুবা মধুসূদনকে দেখে সকলেই বলেছিল, নীরুর আমাদের ভাগ্য ভাল। তাই শিবপূজা করে শিবের মতই স্বামী পেরেছে। এই চার বৎসর প্রতিদিন সে মহাদেবকে অঞ্জলি দান করেছে স্বামীর কল্যাণে।

কত আশা নিয়ে সে স্বামীর ঘর করতে এসেছিল। কিন্তু এ কি হলো, স্বামী তো তার দিকে একটিবার ফিরেও তাকালেন না।

কোথায় সেই মধুর সম্ভাষণ। কোথায় চোখে সেই আনন্দ-দীপ্তি। দু'চোখের দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা। কেন? কেন এ বিতৃষ্ণা? তবে কি তাকে স্বামীর পছন্দ হয় নি?

কি অপরাধ করেছে সে তাঁর চরণে? বিবাহের পর চার বৎসর সে আসে নি। না এলেও মন তো তার এই গৃহেই পড়ে ছিল। সর্বক্ষণ স্বামীর চিন্তাই সে করেছে। মনে মনে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেছে।

চোখে নিদ্রা ছিল না মধুসূদনেরও।

নীরজা শয্যা হতে নেমে ভূ-শয্যায় শয়ন করেছে, তবু সে শয্যাতেই শুয়ে রইল। কেবলই তার মনের পাতায় কাদম্বিনীর ছবি ভেসে ওঠে।

মনে পড়ে কাদম্বিনীর কথা হাসি আর গান। কাদম্বিনীর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ, তাকে দেখে আনন্দ, তার কথা শুনে আনন্দ। কাদম্বিনী যে তার সমস্ত চেতনাকে সম্মোহিত করে রেখেছে।

কেন বিবাহের পূর্বে কাদম্বিনীর সঙ্গে তার পরিচয় হলো না। তবে ত সে অনায়াসেই কাদম্বিনীকেই বিবাহ করতে পারত। নীরজাসুন্দরী তার স্কন্ধে এসে চেপে বসত না। সারাটা জীবন ধরে তাকে এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না।

যাকে সে কোন দিনই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারবে না—তার সঙ্গে সে সারাটা জীবন অতিবাহিত করবে কি করে?

বাকী রাতটুকু বিনিদ্রই কাটল মধুসূদনের।

অবশেষে একসময় জানালাপথে প্রথম উষার আলো এসে উঁকি দিল।

মধুসূদন শয্যা হতে উঠে বসল। নিজের অজ্ঞাতেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অদূরে ভূশয্যায় যেখানে শায়িতা নীরজাসুন্দরী তার প্রতি। ঘুমিয়ে রয়েছে নীরজাসুন্দরী হাতের উপরে মাথা রেখে। গুণ্ঠন স্খলিত হয়ে পড়েছে। চারু কেশভার এলায়িত। দু'চোখের কোণে অশ্রুধারার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

ক্ষণকালের জন্য তাকিয়ে রইলো সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির দিকে নিজের অজ্ঞাতেই যেন মধুসূদন। কিন্তু পরক্ষণেই যেন সজাগ হয়ে ওঠে মধুসূদন। অন্য দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলো। পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

যে স্ত্রীকে সে কোনদিনই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারবে না, তার প্রতি তার কোন দায়িত্ব নেই। গায়ে পিরানটা চড়িয়ে চর্মপাদুকায় পা গলিয়ে মধুসূদন বের হয়ে এলো কক্ষ থেকে।

বাড়ির মধ্যে তখনো কারো নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। দু'একজন দাসদাসী মাত্র জেগেছে।

নীচে নেমে মধুসূদন আস্তাবলের দিকে গেল।

আব্দুল অশ্বের গাত্র মর্দন করছিল। মনিবপুত্রকে সামনে দেখে সে সেলাম দিলে।

—আব্দুল?

—হুজুর!

—গাড়ি জোত, একটু বেরুব।

ঠং ঠং করে ঘণ্টি বাজিয়ে ব্রুহাম গেট দিয়ে বের হয়ে এলো।

—কোথায় যাবো হুজুর ? আব্দুল শুধায়।

—শোভাবাজারে চল—

শোভাবাজারে কোথায় যেতে হবে আব্দুল জানে। যতীশচন্দ্রের গৃহের দিকে ব্রুহামের জেদী আরবী অশ্বযুগল ছুটে চলে।

প্রভাতের শীতল হাওয়া রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত মধুসূদনের চোখে-মুখে তৃপ্তির পরশ বোলায়। কলকাতা মহানগরীর তখনো নিদ্রাভঙ্গ হয় নি ভাল করে।

যতীশচন্দ্রের বাড়ির গেট দিয়ে একসময় ব্রুহাম প্রবেশ করল। আব্দুল কোচবাক্স থেকে অবতরণ করে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

সামনেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। নানা ফুল ও ফলের গাছ। কৃত্রিম ফোয়ারা। বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছিল মধুসূদন। হঠাৎ তার নজরে পড়ল—একটা কামিনী ঝোপের পাশে দণ্ডায়মানা কাদম্বিনীর প্রতি।

পরিধানে একটা চওড়া কালোপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি। গায়ে জ্যাকেট মাথার চুল খোলা—পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে।

পদশব্দে কাদম্বিনী ফিরে তাকাল।

—এ কি, মধুসূদনবাবু! এই সকালে ? দাদা তো এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি। কাদম্বিনী বললে।

মধুসূদন বললে, যতীশ যে এতসকালে শয্যাত্যাগ করে না তা আমি জানি। আমি তার কাছে তো আসি নি—আমি এসেছি তোমার কাছে কাদম্বিনী।

—আমার কাছে!

—হ্যাঁ।

কাদম্বিনী বললে, কেন ?

—কেন তা জানি না, তবে এসেছি—কিন্তু কেন এসেছি এই সকাল বেলাতেই তা তো কই জিজ্ঞাসা করলে না কাদম্বিনী ?

—কেন এসেছেন ?

—জান কাদম্বিনী, কাল সারাটা রাত ঘুমাই নি। মধুসূদন বললে।

—কেন ?

—কেবল ভেবেছি, সারাটা রাত—

—ভেবেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কি ভেবেছেন ?

—ভেবেছি তোমাকে কাদম্বিনী—

—আমাকে! ওমা সে কি!

—হ্যাঁ কাদম্বিনী, কেবল তোমার কথাই ভেবেছি। জানি না কেন। আর কোন কথাই মনে পড়ে নি। কেবল ভেবেছি তোমাকে।

কাদম্বিনী নীরব।

—কাদম্বিনী! মধুসূদন আবার ডাকল।

—বলুন।

—তুমি আমার কথা ভাবো না?

—আমি!

—হ্যাঁ, তুমি ভাবো না আমার কথা?

—ভেবে কি লাভ! কাদম্বিনী বলল।

—কাদম্বিনী?

—আপনারও ভাবা উচিত নয় আমার কথা—

—কি বলছো তুমি?

—আপনি বিবাহিত, আপনার স্ত্রী আছেন—

—স্ত্রী—স্ত্রী—স্ত্রী, কে বললে আমার স্ত্রী আছে! নেই—আমার কোন স্ত্রী নেই।

—আপনি যান মধুসূদনবাবু—

—চলে যাবো?

—হ্যাঁ, যাওয়াই ভাল।

—তুমি—তুমি আমাকে যেতে বলছো কাদম্বিনী?

—যাঁকে বিবাহ করেছেন, ভুলে যাবেন না তাঁর প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে—

—যেতে বলছো—আমি চলে যাচ্ছি কাদম্বিনী, মধুসূদন বলে, তবে এও তুমি শুনে রাখ, তাকে স্ত্রী বলে আমি কোনদিনই গ্রহণ করতে পারব না।

—ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলবেন না।

—কেন বলবো না?

—ওকথা বলা পাপ—আপনি আর এখানে আসবেন না।

—দৃষ্টির বাইরে গেলেই কি তুমি মনে কর কাদম্বিনী, তুমি আমার মন থেকে চলে যাবে!

—কেন বুঝতে পারছেন না মধুসূদনবাবু, আমিও একজন নারী—

—তুমি নারী, তবে পাষাণী ! মধুস্থদন বললে।

ঐ সময় যতীশচন্দ্রকে দেখা গেল। সে ঐদিকেই আসছে।

—মধুস্থদন যে, যতীশচন্দ্র বললে, কি ব্যাপার মধু, এত সকাল !

—যতীশ, আজ ড্রামণ্ড সাহেবের ক্লাস আছে না ? মধুস্থদন বললে।

—হ্যাঁ, মেডিসিনের ক্লাস আছে। বোধ হয় দু'টোয় ক্লাস তাঁর।

—আমি আজ ক্লাসে যাবো না, তুমি নোটটা নিও—আমি তোমার নোটটা দেখে পরে টুকে নেবো।

—কেন, ক্লাসে যাবে না কেন ?

—না। ঐ কথাটা বলবার জন্যই এসেছিলাম যতীশ। আচ্ছা চলি ভাই। কথাটা বলে মধুস্থদন আর দাঁড়াল না, গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

যতীশচন্দ্র যেন একটু অবাকই হয়। মধুস্থদন মাত্র ঐ কথাটা বলবার জন্যই এসেছিল এত সকালে এতটা পথ ! যতীশচন্দ্র ভগ্নীর দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

কাদম্বিনী তখন অন্য দিকে তাকিয়ে।

—কাদু ! যতীশচন্দ্র ডাকল।

—কিছু বলছিলে দাদা ?

—ব্যাপার কি বল তো বোন ?

—কিসের কি ব্যাপার, দাদা !

—আমার মনে হচ্ছে, মধু যেন কি বলতে এসেছিল। না বলে চলে গেল।

কাদম্বিনী কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। তার চোখদু'টো কেবল ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে।

—কি হয়েছে রে কাদু ? যতীশচন্দ্র শুধায়।

—আমি কিছু জানি না দাদা—

—তাই তো ! মধু তো এরকম ব্যবহার কখনো করে না !

—দাদা !

—কি রে ?

—তুমি ওঁর স্ত্রীকে দেখেছো ?

—না তো, কেন রে ?

—না, তাই জিজ্ঞাস করছি।

যতীশচন্দ্র যেন একটু অবাক্ হয়েই ভগ্নীর মুখের দিকে তাকায়।

ইদানীং কেন যেন যতীশচন্দ্রর মনে হয়, তাঁর বন্ধু মধুস্থদন গুপ্তের প্রতি তার বোনের একটা দুর্বলতা আছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দেয় নি।

—কাদু !

—কিছু বলছো দাদা ?

—বাবা তোর বিবাহ স্থির করেছেন, জানিস ?

—বাবা বলেছেন ? কাদম্বিনী শুধায়।

—হ্যাঁ, হাটখোলার দত্তবাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি শুনেছি শীঘ্রই বিলাত যাবে।

—না দাদা—

—কি, না !

—বাবাকে বলো, বিয়ে আমি করবো না। কাদম্বিনী বললে।

—বিয়ে করবি না মানে ?

—না, দাদা।

—বাবা কথাটা শুনলে মনে বড্ড দুঃখ পাবেন।

—উপায় নেই দাদা—

—কিন্তু কেন বলবি তো ! যতীশচন্দ্র প্রশ্ন করে।

—কিন্তু তা আমি বলতে পারবো না। তবে বিয়ে আমি করবো না। কথাটা বলে কাদম্বিনী আর দাঁড়াল না। ধীরপদে অন্দরের দিকে চলে গেল।

যতীশচন্দ্র চিন্তিত হয়।

মধুসূদন গৃহে ফিরে এলো।

গৃহে প্রত্যাগমন করতেই পিতা রামপ্রাণ গুপ্তর সঙ্গে মধুসূদনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

—এই সকালে কোথায় বের হয়েছিলে মধু ?

—একটু কাজ ছিল। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে মধুসূদন অন্দরের দিকে চলে গেল।

মধুসূদন সোজা উপরে এলো। এসে মা'র ঘরে ঢুকল।

কমলাসুন্দরী পালঙ্কের উপর বসে ছিলেন।

পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পুত্রবধূ নীরজাসুন্দরী। মাথায় গুণ্ঠন।

—মা !

—কি রে ?

—ভাবছি বাড়িতে আর থাকবো না—

—বাড়িতে থাকবি না, সে কি কথা রে ?

—বাড়িতে থাকলে পড়াশুনার অসুবিধা হবে।

—অসুবিধা! অসুবিধা আবার কি রে?

—ভাবছি বৈঠকখানা রোডে আমাদের যে বাড়িটা আছে সেখানেই থাকবো। তবে তুমি কিছু ভেবো না মা, মধ্যে মধ্যে আসবো। মধুসূদন বললে।

কমলাসুন্দরী ভাবলেন বোধ হয় বধূমাতা গৃহে থাকলে ছেলের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটবে, তাই সে অন্যত্র চলে যেতে চায়।

—তা কত্তাকে বলেছিস? কমলাসুন্দরী বললেন।

—না, এখনো বলি নি। তবে যাবার আগে বলবো।

—কখন যাবি?

—ভাবছি আজই যাবো।

কথাটা শুনে রামপ্রাণ গুপ্ত কিছু বললেন না। কেবল বললেন, তা তোমার যেখানে সুবিধা হয় সেখানেই যাও। তবে বৌমা আসার জন্য যদি তোমার—

—না বাবা, তা নয়।

—তা কবে যাবে?

—আজই, যদি আপনি অনুমতি করেন।

—তোমার গর্ভধারিণীকে কথাটা বলেছো?

—বলেছি।

ঘরে ফিরে মধুসূদন জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল, নীরজাসুন্দরী এসে পাশে দাঁড়াল।

—আপনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?

মধুসূদন স্ত্রীর দিক তাকাল। মাথায় স্বল্প গুণ্ঠন। পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে নীরজাসুন্দরী।

—হুঁ।

—আমি এসেছি বলে কি চলে যাচ্ছেন?

কণ্ঠস্বরে নীরজাসুন্দরীর কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই।

মধুসূদন বারেক মাত্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করল।

—কিন্তু আমিই বা কোথায় যাবো, আপনি বলুন?

—কে তোমাকে যেতে বলেছে?

—আপনি এভাবে চলে যাওয়ার মানে তো তাই—

—মধুসূদন একটু বিস্মিতই হয়। এ তো কোন গেঁয়ো অশিক্ষিতা মেয়ে

া নয়।

—আমি এলাম আর আপনি চলে যাচ্ছেন, সবাই কি ভাববেন না—আপনার াবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ আমিই!

মধুসূদন কোন জবাব দেয় না।

—আপনি চরণে আশ্রয় না দিলে এ সংসারে আর আমার কোথায় ঠাঁই বলুন া? অনুগ্রহ করে আপনি যাবেন না এভাবে বাড়ি ছেড়ে—আমি আপনাকে কথা চ্ছি, আমার ছায়াও আপনাকে স্পর্শ করবে না,—আমার মুখ আপনি দেখতে বেন না। আমাকে এইভাবে চলে গিয়ে লজ্জায় ফেলবেন না।

—তোমার আবার লজ্জা কিসের?

—এত বুদ্ধি আপনার, এত বিদ্যাবুদ্ধি আপনার আর এই সামান্য কথাটা বুঝতে রছেন না?

—শোন নীরজা, এক বাড়িতে আমাদের দু'জনার একত্র বাস সম্ভব নয়।

—কেন?

—কারণ কখনো জীবনে তোমাকে আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারবো না।

নীরজাসুন্দরী সহসা যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মধুসূদনের পদপ্রান্তে। কান্না- া সুরে বললে, কেন, কেন—বলুন আমি কি অপরাধ করেছি?

—কোন অপরাধ করো নি।

—তবে তবে, আমার কি গতি হবে?

—আমি তো বলছিই—তুমি এ বাড়িতেই থাক, এ গৃহের বধুর মর্যাদা নিয়েই কো।

সহসা নীরজাসুন্দরী উঠে দাঁড়াল।

তার দুই চক্ষে প্রবহমাণ অশ্রু।

—ঠিক আছে আপনি যান, আপনাকে আমি বাধা দেবো না। তবে আমি সতী মায়ের মেয়ে হই, আপনাকে একদিন ফিরে আসতেই হবে।

কথাগুলো বলে গলবস্ত্র হয়ে স্বামীর চরণে প্রণাম করে, ধীরে শান্তপদে নীরজা- দরী কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে ব্রুহামে চেপে যখন মধুসূদন বের হয়ে গেল, দোতলার ালাপথে দাঁড়িয়ে নীরজাসুন্দরী—তার চোখের জল তখন শুকিয়ে গিয়েছে।

—কি অপরাধে তুমি আমায় ত্যাগ করে গেলে তাও বললে না। বেশ বলো । আমি জানতে চাই না। তবে ঠিক জেনো, তোমায় আবার ফিরে আসতেই । আমি অপেক্ষা করবো তোমারই জন্য।

কিন্তু গৃহ ছেড়ে এসেও মধুসূদন যেন মনে শান্তি পায় না।

কেবলই তার একটি কথা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, কাজটা বোধ হয় ভাল হলো না। কিন্তু সে-ই বা কি করতে পারে—এক গৃহে তো নীরজাসুন্দরীর সঙ্গে বাস করা সম্ভব না!

মধুসূদন যতীশচন্দ্রকে বলেছিল সেদিন কলেজে যাবে না, কিন্তু পর পর দশ দিন কেটে গেল সে কলেজে গেল না। অবশেষে আনন্দচন্দ্রই একদিন এসে মধুসূদনের বাসগৃহে উপস্থিত হলো খোঁজ করতে করতে!

—কি ব্যাপার মধু!

—কিসের কি ব্যাপার, আনন্দ?

—কলেজ ছেড়ে দিলে নাকি?

—কেন, কলেজ ছাড়বো কেন?

—তবে কলেজে যাও না যে! আনন্দচন্দ্র প্রশ্ন করে।

—তা আমার এ গৃহের সংবাদ কোথায় পেলে, আনন্দ? পাল্টা প্রশ্ন করে মধুসূদন।

—তোমাদের গৃহে গিয়েছিলাম—

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তোমার পিতাঠাকুরই সংবাদ দিলেন। শুনলাম—

—কি?

—তোমার স্ত্রী এসেছেন, তাই তোমার পড়াশোনার নাকি অসুবিধা হবে—কথাটা তো আমি বিশ্বাসই করি নি।

—কেন?

—কারণ অবিশ্বাস্য বলে কথাটা!

১২

মধুসূদন তাকাল আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে। বললে, কথাটা তুমি বিশ্বাস করো না কেন, আনন্দ?

আনন্দচন্দ্র হেসে বললে, স্ত্রী কাছে থাকলে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটবে, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই। মধু, বাজে কথা ছাড়ো, আসল কথাটা কি বল তো?

—আসল কথাটা আবার কি?

—স্ত্রীকে নিশ্চয়ই তোমার মনে ধরে নি, তাই না মধু?

—না, না। ঠিক তা নয় আনন্দ—মধুসূদন বললে।

—কথাটা এড়াবার চেষ্টা করো না, মধু। তোমার মন যে কোথায় বাঁধা পড়েছে, তা কি আমি জানি না ভাবো?

মধুসূদন সেন চমকে ওঠে, বলে, কি বলছ, আনন্দ!

—যতীশের ভগিনী কাদম্বিনী—

—কে, কে বললে?

—যতীশই বলেছে।

—যতীশ বলেছে তোমায়?

—হ্যাঁ। হাটখোলার দত্তবাড়ি থেকে কাদম্বিনীর সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—কাদম্বিনী বলেছে, সে বিবাহ করবে না।

—কাদম্বিনী বলেছে, সে বিবাহ করবে না?

—তাই তো শুনলাম যতীশের মুখে। সে নাকি চিরকুমারী থাকবে। কেন সে চিরকুমারী থাকতে চায় তুমি জানো? কি, জবাব দিচ্ছ না কেন?

মধুসূদন কি বলবে ভেবে পায় না।

—যতীশের মা কান্নাকাটি করছেন। ঐ তো তাদের একটিমাত্র মেয়ে, কত সাধ ছিল মনে, তাঁদের একটিমাত্র মেয়ে সুন্দরী বিদুষী, মনের মত পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন। শোন মধু, তোমার উচিত কাদম্বিনীকে বুঝিয়ে বলা।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি বললেই সে বিবাহে সম্মতি দেবে।

—আমি বললেই কাদম্বিনী বিবাহে সম্মতি দেবে?

—হ্যাঁ, যতীশের ধারণা তাই, আরো একজন তাই বললেন—

—কে, কার কথা বলছো?

—কাকীমা।

—তিনি—তিনি বলেছেন?

—হ্যাঁ, আমিই যতীশের মুখে সব কথা শুনে তাঁকে বলেছি—

—ছিঃ ছিঃ আনন্দ, এসব কথা তুমি ওঁকে বলতে গেলে কেন?

—যাক গে সে-সব কথা, এখন তুমি কি করবে বল মধু?

—বেশ তাই হবে আনন্দ, আমি বলবো।

—আর দেরি করো না, আজ বা কাল একসময়—

—তাই হবে আনন্দ। মধুসূদন বললে, আমি দু'এক দিনের মধ্যেই সেখানে যাবো।

—ঠিক আছে। কলেজে কবে যাচ্ছো বলো? ড্রামণ্ড সাহেব খুব ভা পড়াচ্ছেন। ওঁর ক্লাসগুলো মিস্ করলে তোমার ক্ষতি হবে। তাহলে এবা উঠি।

—যাবে?

—হ্যাঁ।

—এসো।

আনন্দচন্দ্র মধুসূদনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঐ গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হ এলো। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণপ্রায়। অনেকটা পথ। দ্রুত হেঁটে চলে আনন্দচন্দ্র কলুটোলার দিকে।

কলুটোলায় নিবারণচন্দ্রের গৃহে যখন এসে পৌঁছাল, রাত্রি প্রথম প্রহর গত হয়েছে। এবং সে তখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, কি বিস্ময়কর এক সংবাদ তার জন্য অপেক্ষা করছে!

বাইরের ঘরের বারান্দায় একটা চৌকির উপর বসে গাঁয়ের সনাতনদা একটা থেলো হুঁকোয় তামাকু সেবন করছিল। সনাতনের বয়স হয়েছে, মাথায় লম্বা লম্বা বাবরি চুলে রীতিমত পাক ধরেছে। পরনে মোটা ধুতি, গায়ে একটা পিরান।

সনাতনদাকে আনন্দচন্দ্র প্রথমটায় দেখতে পায় নি, সনাতনদা দেখেছিল আনন্দচন্দ্রকে। বারান্দায় বাইরের ঘরের আলো এসে পড়েছে। বাইরের ঘরে নিবারণচন্দ্র তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে ব্যস্ত।

—কেডা?

থমকে দাঁড়াল আনন্দচন্দ্র সনাতনদার গলার শব্দে।

—কেডা, আনন্দ না?

আনন্দচন্দ্র এগিয়ে এলো, কে সনাতনদা! তুমি কখন এলে?

—এই বেহান বেলায় আয়লাম, বড় জবর খবর আছে ভায়া।

—জবর খবর?

—হ্যাঁ রে। কও দেহি কেমন কতি পার কি খবর আছে!

—বাড়ির সব ভাল আছেন তো সনাতনদা?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সবাই ভাল। তা কতি পারলা না তো। তুমি যে পোলার বাপ হইছো।

পোলা—মানে ছেলের বাপ!

আনন্দচন্দ্রের বুকের ভিতরটা ধক্ করে ওঠে ঐ সংবাদে।: সে পিতা হয়েছে—

সন্তানের পিতা!

অন্নদাসুন্দরী মা হয়েছে। তাদের সন্তান হয়েছে। পুত্র-সন্তান।

—কি ভাই, যাবা না একবার দেশে—পোলার মুখ দেখবা না? সনাতনদা বললে।

—না সনাতনদা, এখন তো যাওয়া হবে না।

—ক্যান, যাবা না ক্যান?

—সামনে পরীক্ষা, তা ছাড়া পুরোদমে এখন মেডিসিনের ক্লাস চলেছে।

—কিন্তু দাদা যে তোমারে একবার যাতি কইছেন!

—না, বাবাকে বলো পুজোর সময় যাবো।

ঘরে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে আনন্দচন্দ্র পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসল ঘরের আলো জ্বালিয়ে। কিন্তু পড়ার বইয়ে মন বসে না।

মন তখন তার পক্ষিরাজের মত ডানা মেলে উড়ে চলেছে সেই নদীর ধারের ছোট গ্রামখানির দিকে, যেখানে আছে তার অন্নদাসুন্দরী।

অন্নদাসুন্দরী মা হয়েছে। তার পুত্রের জননী। কেমন দেখতে হয়েছে সন্তান তার? তার মত, না অন্নদার মত—কার মত মুখখানা তার? তার শ্যামবর্ণ গাত্রবর্ণ পেয়েছে, না অন্নদাসুন্দরীর গাত্রবর্ণ পেয়েছে? ছোট ছোট হাত-পা, মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল!

বুকের মধ্যে কি একটা আবেগ যেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে আনন্দচন্দ্রের। এরই নাম কি অপত্যস্নেহ! সন্তানের প্রতি পিতার মমতা!

কুসুমকুমারী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

—আনন্দ!

—কে, কাকীমা?

কুসুমকুমারী মৃদু মৃদু হাসছে।

আনন্দচন্দ্র দৃষ্টি নত করল। বোধ করি লজ্জায়।

—সংবাদ শুনেছো আনন্দ?

আনন্দচন্দ্র নীরব। সমস্ত বুকখানা জুড়ে রয়েছে তখনো যেন এক অমৃত সাধ।

পরবর্তীকালে আনন্দচন্দ্রের আরো অনেক সন্তান জন্মেছে একে একে। ছয় পুত্র, পাঁচ কন্যা।

ভারতচন্দ্র পৌত্রদের নামকরণ করেছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন, মনোরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, নলিনীরঞ্জন, যামিনীরঞ্জন ও জ্ঞানরঞ্জন।

দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথমা কন্যা কুসুম। তারপর টুবি, টুনী, মেন্না ও ভগবতী।

কিন্তু সেদিন প্রথম পুত্রের জন্মের সংবাদ তার বুকে যে দোলা জাগিয়েছিল, অনুভূতি কখনো ফিরে আসে নি।

কুসুমকুমারীর নামানুসারেই আনন্দচন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কুসুম বলে ডাকতো।

—তা বাড়ি যাবে না একটিবার! কুসুমকুমারী বললে।

—না, কাকীমা। এখন তো যাওয়া হবে না।

—ছেলের মুখ দেখবে না?

কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা বোধ করছিল। আনন্দচন্দ্র কথার মোড় পাল্টে দিল, কাকীমা, আজ মধুর ওখানে গিয়েছিলাম—

—গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—দেখা হলো মধুসূদনের সঙ্গে? কুসুমকুমারী শুধালেন।

—হয়েছে। আনন্দ বললে, আমি তাকে বললাম তোমার কথা—

—শুনে কি বললে সে?

—কাদম্বিনীকে বিবাহের জন্য অনুরোধ জানাবে বললে। আচ্ছা কাকী তোমার কি সত্যিই ধারণা, মধুকে ভালবাসে বলেই কাদম্বিনী বিবাহে অসম্মতি জানিয়েছে?

—আমার তো তাই মনে হয়।

—কিন্তু কাদম্বিনী কি জানত না মধুসূদন বিবাহিত? তার স্ত্রী রয়েছে?

—তবে সে এ কাজ করলো কেন, তাই তো তোমার প্রশ্ন আনন্দ! কুসুমকুমারী শুধালেন।

—তাই। যে ভালবাসা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—

—ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি দিয়ে কি ভালবাসার বিচার চলে সর্বদা, আনন্দ?

—কিন্তু কাকীমা—

আনন্দকে বাধা দিয়ে বললে কুসুমকুমারী, ভালবাসা যে কখন কি ভাবে মানুষের জীবনে আসে কেউ তা বলতে পারে না। তুমি আমার জীবনের কথা জান না!

—কাকীমা?

—আমার বিয়ের আগে কাদম্বিনীর মতই আমিও একজনকে মনে মনে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু তোমার কাকাবাবু যখন আমার বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব তুললেন, বাবা সানন্দে সম্মত হয়ে গেলেন। বাবাকে চিরদিন যমের মত ভয়

র এসেছি, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস কোনদিনই ছিল না। খন মনে মনে স্থির করলাম, এ বিবাহ আমি কিছুতেই করবো না। আমি বিষপান করবো—

—বিষ!

—হ্যাঁ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষপান করতে পারলাম না—

—কেন?

—জানি না কেন, কেন বিষপান করতে পারলাম না! নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ য়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে এলাম এখানে। তারপর কখন কি ভাবে যে ঐ বুড়ো মানুষটার প্রতি মমতা জন্মাল বুঝতেই পারলাম না। মিথ্যা বলবো না আনন্দ, আজ আমি সুখী। দুঃখ কেবল একটাই, স্বামী যে কারণে এই বয়সে দ্বিতীয়বার আমায় বিবাহ করে ঘরে আনলেন, সেই সাধ তাঁর পূরণ করতে পারলাম না আজও। তাই আমি স্থির করেছি—

—কি কাকীমা?

—তোমার কাকাবাবুর আবার বিবাহ দেবো।

—সে কি!

—হ্যাঁ, আনন্দ। মেয়ে আমি দেখছি, মনের মত পাত্রী পেলেই—

—কাকাবাবু সম্মত হয়েছেন?

—না।

—তবে?

—সম্মতি তার আমি ঠিক আদায় করবোই। জান, এসব কথা কেউ জানে না—আজ প্রথম তোমায় বললাম।

আনন্দচন্দ্র কুসুমকুমারীর মুখের দিকে তাকাল।

তার মনে হলো, এ সাধারণ নয়, এক মহীয়সী নারী, স্বর্গীয় তার ভালবাসা।

আনন্দচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে কুসুমকুমারীর পদধূলি নিল।

কুসুমকুমারী বললে, এ কি, এ কি!—

—তোমায় একটা প্রণাম না করে পারলাম না কাকীমা।

বস্তুতঃ কুসুমকুমারী আর আনন্দচন্দ্র প্রায় সমবয়সী। কিন্তু আনন্দচন্দ্রের মনে হলো, স্বর্গীয় এক ভালবাসা ঐ নারীকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছে।

সত্যিই সে প্রণম্য।

আনন্দচন্দ্র বিদায় নেবার পর মধুসূদন অনেকক্ষণ বসে রইলো চৌকিটার

উপরে।

তার মনের মধ্যে যেন আনন্দচন্দ্র একটা ঝড় তুলে দিয়ে গিয়েছে। কাদম্বিনী প্রত্যাখ্যানের পর যে নিরালম্ব শূন্যতা তাকে গ্রাস করেছিল, জীবনটাই ব্যর্থ ব মনে হচ্ছিল, সেখানে যেন একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল আনন্দচন্দ্র।

কাদম্বিনী বিবাহ করবে না বলেছে! আর যতীশচন্দ্রের ধারণা, কারণটা সে-ই! কথাটা যেমন তাকে আনন্দ দিয়েছে তেমনি দিয়েছে একটা ব্যথা।

তার জন্য কাদম্বিনীর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে? তার ভালবাসা তো এত স্বার্থপর নয়?

কি করবে সে? আনন্দ যা বলে গেল, তাই কি সে করবে? তাই তো তার করা কর্তব্য।

সারাটা রাত মধুস্থদন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। অবশেষে স্থির করে, সে বলবে কাদম্বিনীকে। কালই সে যাবে কাদম্বিনীর কাছে।

কিন্তু যাওয়া হলো না মধুস্থদনের পরের দিনই যতীশচন্দ্রের গৃহে। মধুস্থদন স্থির করেছিল, কলেজফেরতা সে যতীশের গৃহে যাবে ক্লাসের শেষে।

ক্লাস শেষ হতে হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ব্রুহাম গাড়িটা মধুস্থদনকে নিয়ে সবে কলেজের গেট পার হয়েছে, উল্টো দিক থেকে আর একটা গাড়ি তার গাড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রবল গতিতে ছুটে এসে। ঐ গাড়ির ঘোড়া দুটো কি কারণে জানি ক্ষেপে গিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটছিল। কোচোয়ান সামলাতে পারে নি।

গাড়িটা এসে একেবারে পাশাপাশি প্রবল ধাক্কা দিল মধুস্থদনের ব্রুহাম গাড়ির গায়ে। মধুস্থদনের গাড়ির চাকা খুলে গাড়িটা একপাশে ছিটকে পড়লো।

দরজা খুলে গেল সেই প্রচণ্ড ধাক্কায়। মধুস্থদন ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়লো। পথচারীরা চিৎকার করে উঠলো, গেল, গেল!

মধুস্থদনকে পথচারীরা যখন তুললো, সে তখন অজ্ঞান। কপাল কেটে রক্তের স্রোত বইছে। সামনেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সকলে ধরাধরি করে জ্ঞানহীন মধুস্থদনকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সার্জেন ডাঃ কিচ্‌লু ছিলেন তখন হাসপাতালে। সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে আসেন।

ডান হাতের হাড় ভেঙেছে, মধুস্থদন তখনো অজ্ঞান।

আবহুলের বিশেষ একটা তেমন চোট লাগে নি। পিঠ খানিকটা ছড়ে গিয়েছিল।

আবদুলই বুদ্ধি করে ছুটে যায় খিদিরপুরে সংবাদটা দিতে। রাত এগারটা নাগাদ আবদুল গৃহে এসে পৌছাল।

সে-রাত্রে আবার রামপ্রাণ গুপ্ত সাহেব-বিবিদের নিয়ে গৃহে পার্টি দিচ্ছিলেন। শহরের নামকরা খেমটাওয়ালী নাচের মুজরা নিয়ে এসেছে।

বিরাট হলঘরটার মধ্যে চার-পাঁচটা ঝাড়বাতি জ্বলছে। বেলোয়ারী পাত্রে সুরা বিতরণ হচ্ছে। খেমটাওয়ালী রোশন গান গাইছে সুললিত কণ্ঠে।

আবদুল সেই সময় ঘরের মধ্যে ছুটে ঢুকে পড়ল, হুজুর, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

আনন্দের আসরে আবদুলের আকস্মিক চিৎকার যেন ছন্দপতন ঘটলো।

রামপ্রাণ গুপ্ত বিরক্ত হন।

—হুজুর, দাদাবাবু—

—কি, কি হয়েছে দাদাবাবুর? শুধালেন রামপ্রাণ গুপ্ত।

—গাড়ি ভেঙ্গে উল্টে পড়ে দাদাবাবু—হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে আবদুল।

ধক্ করে উঠেছে রামপ্রাণ গুপ্তের বুকটা।

—কি, কি হয়েছে দাদাবাবুর?

—খুন—ওঃ, সে কি খুন—

—নেই, বেঁচে নেই?

—জানি না হুজুর, দাদাবাবুকে সবাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

আনন্দের আসর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল। রামপ্রাণ গাড়ি নিয়ে পাগলের মতই তখুনি ছুটলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

সংবাদটা অন্দরেও পৌছে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এবং সংবাদটা পৌছে দেয় কর্তাবাবুর খাস পেয়ারের ভৃত্য শম্ভুচরণ।

সাহেব-বিবিয়া সব দুঃসংবাদে মর্মাহত হয়ে একে একে বিদায় নিল। খেমটা-ওয়ালী রোশনও তার পাল্কিতে চেপে চলে গেল গৃহে। আনন্দ-আসর ছত্রখান হয়ে পড়ে রইলো।

কমলসুন্দরী তাঁর শয্যাগৃহ-সংলগ্ন ঠাকুরঘরে একটা পশমের আসনের উপর বসে আহ্নিক করছিলেন। বাত-ব্যাধিতে প্রায় পঙ্গু কমলসুন্দরীর গতিবিধি বলতে যা সামান্য ছিল তা ঐ ঠাকুরঘর ও শয়নকক্ষ। যেটুকু সময় ঠাকুরঘরে থাকতেন, বাকী সময়টা তাঁর কাটত শয়নকক্ষে শয্যায় শুয়ে বা বসে।

পূর্বে দাসী মোক্ষদাই সর্বক্ষণ কমলসুন্দরীর দেখাশোনা করত। কিন্তু পুত্রবধূ নীরজাসুন্দরী আসার পর থেকে সে-ই দেখাশোনা করে রুগ্না শাশুড়ীর।

পশমের আসনে বসে কমলসুন্দরী পূজা করছিলেন, পাশে বসে ছিল

নীরজাসুন্দরী।

মোক্ষদা শম্ভুচরণের মুখে ঐ দুঃসংবাদটা শুনে ছুটে এলো ঠাকুরঘরে।

—মা, মাগো!

মোক্ষদার ডাকে কমলসুন্দরী ত্রস্তে ফিরে তাকালেন দাসীর দিকে।

—কি, কি হয়েছে?

—দাদাবাবুর গাড়ি চুরমার হয়ে গিয়েছে।

—কি, কি বললি?

—হ্যাঁ, দাদাবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

কমলসুন্দরী হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে আসনের উপরেই লুটিয়ে পড়লেন। নীরজাসুন্দরী তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর মাথাটা কোলে তুলে নেয়।

—মা জ্ঞান হারিয়েছেন। মোক্ষদা তাড়াতাড়ি একটা পাখা নিয়ে এসো!

নীরজাসুন্দরী তৎপর হয়ে ওঠে শাশুড়ীর শুশ্রূষায়।

আর অন্যদিকে হাসপাতালে মধুসূদনের জ্ঞান তখনো ফেরে নি। রামপ্রাণ গুপ্তর ফিটন গাড়ি এসে হাসপাতালে প্রবেশ করল।

আনন্দচন্দ্র হাসপাতালের দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর ফেরে নি গৃহে। আনন্দ এগিয়ে এলো। আনন্দচন্দ্রকে দেখে রামপ্রাণ বললেন, আনন্দ, মধু কেমন আছে?

—এখনো জ্ঞান ফেরে নি। কিছুক্ষণ আগে আমাদের শিক্ষক ড্রামণ্ড সাহেব এসে মধুকে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

—কি, কি বললেন তিনি?

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় যেন রামপ্রাণের কণ্ঠস্বর বুজে আসে।

—তিনি বললেন, মস্তিষ্কে চোট লেগেছে। জ্ঞান ফিরবে কিনা তা তিনি বলতে পারছেন না।

রামপ্রাণ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—বাঁচবে না?

—অত ভেঙ্গে পড়ছেন কেন। বাঁচবে—নিশ্চয়ই বাঁচবে মধু—জ্ঞান আবার ফিরে আসবে।

—মধু, মধু যে আমার ঐ একটিমাত্র সন্তান। রামপ্রাণ বললেন ভগ্নকণ্ঠে।

—আপনি চলুন ভিতরে। আনন্দচন্দ্র বললে।

পাশেই একটা বেঞ্চ ছিল। রামপ্রাণ তারই উপরে উপবেশন করলেন।

—চলুন, মধুকে দেখবেন না ?

—না।

—যাবেন না ?

—না। ওখানে আমি যেতে পারবো না। মধুর গর্ভধারিণী ঐ সংবাদ শুনলে বোধ হয় আর বাঁচবেন না—

—আপনি বিচলিত হবেন না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মধু সুস্থ হয়ে উঠবে আবার।

—তুমি যাও আনন্দ। তুমি মধুর কাছে যাও। আমি এখানেই বসে থাকি।

ঐ সময় মধুর এক সহপাঠী বিশ্বেশ্বর ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, আনন্দ, মধুর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

—এসেছে! লাফিয়ে উঠলেন রামপ্রাণ।

—কে ইনি, আনন্দ ?

—মধুর বাবা।

—ও। কিন্তু ওখানে তো এখন কোন আত্মীয়স্বজনকে ড্রামণ্ড সাহেব যেতে দেবেন না বোধ হয়।

রামপ্রাণ বললেন, একটিবার দেখতে যেতে পারি না ?

—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ড্রামণ্ড সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

একটু পরেই ছেলেটি ফিরে এলো। এসে বললে, চলুন, সাহেব আপনাকে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।

ভোর রাত্রির দিকে কমলসুন্দরীর জ্ঞান ফিরে এলো। তখনো পুত্রবধূর ক্রোড়েই তাঁর মাথা। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হলো, মধু—

পুত্রবধূ ডাকলো, মা।

—কে—বৌমা।

—শ্বশুরঠাকুর এইমাত্র ফিরলেন হাসপাতাল থেকে। এসেই আপনাকে এই অবস্থায় দেখে কবরেজ মশাইকে ডাকতে গেছেন।

—মধু, মধু আমার কেমন আছে ?

—জ্ঞান ফিরেছে।

—ফিরেছে ? আমি যাবো ? আমার বাছাকে দেখতে যাবো, বলতে বলতে উঠে বসবার চেষ্টা করেন কমলসুন্দরী।

নীরজাসুন্দরী বাধা দেয়, না না মা, এখন উঠবেন না।

—আমি যাবো হাসপাতালে, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো বৌমা।

রামপ্রাণ কবিরাজকে সঙ্গে করে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

দিন দুই বাদে।

মধুসূদন তখন অনেকটা সুস্থ। তবে এখনো বেশ কিছুদিন, সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

কাদম্বিনী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

—মধু!

—কে? কাদম্বিনী?

পরিধানে একটা কালোপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি। একটা সাদা জ্যাকেট।

—কেমন আছো? কাদম্বিনী প্রশ্ন করে।

—ভাল। বোস কাদম্বিনী।

কাদম্বিনী পাশেই একটা টুলের উপর উপবেশন করল।

—কাদম্বিনী! মধুসূদন ডাকল।

—বল?

—তোমার কাছেই যাবো বলে সেদিন আমি কলেজ থেকে বের হয়েছিলাম, গেটের সামনেই বিভ্রাট ঘটে গেল।

—আমার কাছে যাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কাদম্বিনী, তুমি নাকি বলেছো তুমি বিবাহ করবে না!

—কে বললে?

—শুনেছি। কথাটা কি সত্য?

—হ্যাঁ।

—না কাদম্বিনী, বিবাহ তুমি করো।

কাদম্বিনী নীরব।

—আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি বিবাহ করো।

নিরুত্তর কাদম্বিনী।

—আমার জন্য যদি তুমি বিবাহ না কর তো জেনো, আমার দুঃখের অবধি থাকবে না কাদম্বিনী।

—আমারও অনুরোধ তুমি বিবাহের কথা আমায় বলো না।

—কাদম্বিনী!

—না মধু, বিবাহ আমি করবো না প্রতিজ্ঞা করেছি।

—কেন, কেন প্রতিজ্ঞা করলে?

—শুধিও না ও-কথা।

১৩

মধুসূদন বললে, কেন, কেন তুমি বিবাহ করবে না বল কাদম্বিনী, আমাকে বলো!

কাদম্বিনী বললে, বললাম তো সেকথা জিজ্ঞাসা করো না।

—তোমার দাদা, মা তাঁরা ভাবছেন—

—কি ভাবছেন?

—তুমি আমারই জন্য বিবাহ করবে না—

—একটা কথার জবাব দেবে, মধু?

—বল!

—সত্যি করে বল, আমি যদি বিবাহ করি তুমি কি সুখী হবে?

—হ্যাঁ হবো, তুমি বিবাহ করলে সত্যিই আমি সুখী হবো।

—সত্যি বলছো মধু, আমার গা ছুঁয়ে বল কথাটা! বলে কাদম্বিনী তাঁর এক-খানা হাত মধুসূদনের দিকে প্রসারিত করে ধরল।

—কিন্তু আমার জন্য তুমি সারাটি জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে তাই বা আমি কেমন করে সহ্য করবো কাদম্বিনী?

প্রসারিত হাতখানি স্পর্শ না করে মধুসূদন ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে কথাগুলো বললে।

—ভয় নেই মধু। জীবনে আর আমি কখনো তোমার সামনে আসবো না।

—কাদম্বিনী!

—হ্যাঁ, আমার উপস্থিতি কখনো তোমার দুঃখের কারণ হবে না।

—কিন্তু আমিই কি আমাকে এ জীবনে আর ক্ষমা করতে পারবো কাদম্বিনী? তা ছাড়া তোমাকেও আমি এ জীবনে ভুলতে পারবো না।

—তুমি বিবাহিত। তোমার স্ত্রী আছে। তার কাছে তুমি ফিরে যাও।

—না।

—তাকে ভালবেসো। তার মধ্যেই তুমি দেখো আমাকে পাবে। নীরজা-সুন্দরীর মধ্যেই তুমি কাদম্বিনীকে পাবে। কেমন, আমার কথা রাখবে তো মধু?

মধুসূদন নীরব।

—বলো মধু, আমার কথা তুমি রাখবে? বিশ্বাস করো, সত্যিই তাহলে আমি সুখী হবো। কথা দাও মধু। তার ত কোন অপরাধ নেই। ভেবে দেখো, সে কেন তোমার স্নেহ পাবে না? কেন স্ত্রী হয়েও তোমার স্ত্রীর অধিকার সে পাবে না? এত বড় শাস্তি কোন্ যুক্তিতে তুমি তাকে দেবে মধু?

—আমি—আমি চেষ্টা করবো কাদম্বিনী—

—চেষ্টা করলেই তুমি পারবে। আজ আমি উঠি।

—যাবে?

—হ্যাঁ, দাদার গাড়ি নিয়ে এসেছি, এবারে যাবো।

—আর কি কখনো দেখা হবে না?

—না, মধু। ভেবে দেখো, দেখা না হওয়াই কি উভয়ের পক্ষে মঙ্গল নয়?

মধুসূদন কোন কথা বললো না।

কাদম্বিনী শয্যার পার্শ্বে যে টুলটির উপর উপবেশন করেছিল, সেই টুল থেকে গাত্রোত্থান করে নিঃশব্দ শান্ত চরণে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রামপ্রাণ গুপ্তর ক'টা দিন যে কিভাবে কেটেছে তা তিনিই জানেন। প্রাণের অধিক ভালবাসতেন তিনি তাঁর ঐ একটিমাত্র সন্তান মধুকে।

খামখেয়ালী ছেলে তাঁর। ছোটবেলা থেকেই তার খেয়ালের অন্ত ছিল না। কখনো কোন ব্যাপারে তাকে বাধা দেন নি রামপ্রাণ। যখন যা চেয়েছে তখুনি সে তাই পেয়েছে।

মধুসূদনও কখনো পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে নি। অবিশ্যি তার কোন কারণও ঘটে নি। ঘটতে দেন নি রামপ্রাণ গুপ্ত।

হিন্দু কলেজে পড়তে পড়তেই মধু সাহেবী-ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল উগ্র রকমের, তাতেও রামপ্রাণ কখনো বাধা দেন নি, বরং প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছেন। যুগ দ্রুত পালটাচ্ছে। রামপ্রাণ তা স্বীকার করতেন, আর করতেন বলেই মধুসূদনের কোন ব্যাপারে কখনো বাধা দেন নি।

বিশেষ করে তাঁর চোখের উপরেই দেখা তাঁর বিশেষ বন্ধু রাজনারায়ণ দত্ত মশাইয়ের একমাত্র পুত্র মধুসূদন দত্তের ব্যাপারটা।

কিন্তু মনে মনে সাহেবী-ভাবাপন্ন হলেও এবং সে ব্যাপারে পুত্রকে প্রশ্রয় দিলেও একটা ব্যাপারে রামপ্রাণ অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন।

সাহেব হলেই যে তোমাকে খৃষ্টান হতে হবে তার তো কোন মানে নেই।

মধুসূদন দত্তের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারটা তিনি কোন দিনই মেনে

নিতে পারেন নি। ধর্মত্যাগ করবো কেন? না, তা করবো না।

পুত্রের ব্যাপারে কেবল ঐ দিকটায়ই যেন তিনি সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা রেখেছিলেন, আর সেই কারণেই ছেলের কিশোর বয়েস উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনোমত পাত্রী নির্বাচন করে পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। পুত্রবধূ রজঃস্বলা হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রবধূকে গৃহে এনেছিলেন।

সেকালের রীতিই ঐ ছিল। বালিকা বয়সে মেয়েদের বিবাহ হতো, তারপর তারা থাকতো পিতৃগৃহে যতদিন না রজঃস্বলা হয়। রামপ্রাণ গুপ্ত একচক্ষু হরিণের মত একদিক থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, অন্যদিক থেকেও যে বিপত্তি ঘটতে পারে ঘুণাক্ষরেও সেটা ভাবেন নি।

পুত্রবধূর কারণেই যে মধুসূদন গৃহত্যাগ করেছে সে কথাটা রামপ্রাণ বুঝতে না পারলেও, কমলসুন্দরী, রামপ্রাণের স্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন। পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে কমলসুন্দরী ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

মধুসূদন গৃহ ছেড়ে চলে যাবার পরই দ্বিপ্রহরের দিকে যখন পুত্রবধূ তাঁর কক্ষে এলো, কমলসুন্দরী তার বিষণ্ন মলিন মুখখানির দিকে তাকিয়ে কাছে ডাকলেন পুত্রবধূকে, আয় আমার পাশে এসে বোস।

নীরজা সচকিত হয়ে ওঠে। সে ধরা পড়ে গেল নাকি শাশুড়ীর কাছে?

সে তাড়াতাড়ি বললে, মহাভারত নিয়ে এসে পড়ে শোনাব মা?

—না, তুই আমার পাশে এসে বোস।

কুণ্ঠিত নীরজাসুন্দরী শাশুড়ীর শয্যার একপাশে এসে উপবেশন করল। কমলসুন্দরী চরম স্নেহে পুত্রবধূর পৃষ্ঠে একখানি হাত রেখে বললেন, হ্যাঁ রে, মুখটা তোর অমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

নীরজাসুন্দরী মাথা নীচু করে থাকে।

—মধু চলে গেল আর তাকে তুই আটকাতে পারলি না।

হঠাৎ দু'ফোঁটা চোখের জল কমলসুন্দরীর পায়ের উপর এসে পড়ল।

—কেন চলে গেল মধু, বল আমায়।

—আমি—

—কি বলেছে মধু?

—মা!

—হতভাগী, এত রূপ নিয়েও স্বামীকে বশ করতে পারলি না!

—না মা না, ওর কোন দোষ নেই, পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে—

—তাই চলে গেল! তার মত মেধাবী ছাত্রের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটবে!

ওরে কত্তা যে তোকে অনেক আশা করে ঘরে এনেছিলেন !

—আমি, আমি কি করবো মা ?

—কিছু তোর করতে হবে না, যা করবার আমিই করবো।

কক্ষের বাইরে ঐ সময় পাদুকার শব্দ পাওয়া গেল। কমলসুন্দরী বুঝলেন, স্বামী আসছেন তাঁর কক্ষে।

সত্যি রামপ্রাণ গুপ্তই এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন, কেমন আছো বড়বৌ

—ভাল, তুমি আজ হাসপাতালে যাও নি ? কমলসুন্দরী শুধালেন।

—সেখান থেকেই তো আসছি। বললেন রামপ্রাণ গুপ্ত।

—মধু কেমন আছে ?

—কাল তাকে গৃহে নিয়ে আসবো। সে অবিশ্যি গৃহে আসতে চায় নি, কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম এখন কিছুদিন তার এখানেই থাকা দরকার।

—বেশ করেছো। দেখো তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—

—বেশ তো বলো।

নীরজাসুন্দরী কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

—কি বলছিলে যেন বড়বৌ ? রামপ্রাণ প্রশ্নটা করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

—দেখো মধুর বোধ হয় নীরজাকে মনে ধরে নি !

—সে কি ! কে বললে তোমায় ?

—কেন, তুমি কি কথাটা বুঝতে পারো নি ?

—আমি—

—বধূমাতা আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সে গৃহ ছেড়ে চলে গেল—

—সে তো বলছিল, তার পড়াশুনার সুবিধা হবে !

—না, বধূমাতার সান্নিধ্য এড়াবার জন্যেই সে চলে গিয়েছে।

—তাই তো—তুমি তো আমায় দেখছি রীতিমত ভাবিয়ে তুললে ! মৃদুকণ্ঠে রামপ্রাণ বললেন।

—ভাবনার কথাই তো। শোন, ওকে আর বৈঠকখানার বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না।

—কিন্তু তাতে করেই কি ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যাবে।

—আসুক তো সে, তারপর দেখি কি করা যায় কমলসুন্দরী বললেন।

—বধূমাতা কি তোমায় কিছু বলেছেন ?

—বলতে হবে কেন, ওর মুখের দিকে তাকিয়েই তো বুঝতে পেরেছি।

—মধু তোমায় কিছু বলেছে ?

—না।

পরের দিন বৈকালের দিকে রামপ্রাণ পুত্রকে হাসপাতাল থেকে গৃহে নিয়ে এলেন।

মধুসূদনের শরীর এখনো বেশ দুর্বল। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন বেশ কিছুদিনের জন্য তার পূর্ণ বিশ্রামের।

রামপ্রাণ স্ত্রীর পূর্ব-পরামর্শমত পুত্রবধূকে ডাকলেন। গুণ্ঠনবতী নীরজাসুন্দরী শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

—মধুর যাবতীয় সেবা-শুশ্রূষা তুমিই করবে বৌমা।

নীরজাসুন্দরী নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল। শয্যায় শায়িত মধুসূদন মনে মনে রীতিমত বিরক্তি বোধ করলেও পিতা বা স্ত্রীর দিকে তাকাল না। রামপ্রাণ কথাগুলো বলে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

পিতা রামপ্রাণ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নীরজাসুন্দরী এগিয়ে এলো, বললে, আপনি উঠছেন কেন, ঠাকুর বলে গেলেন আপনি এখনো অসুস্থ।

—শোন, তোমাকে একটা কথা বলি। পিতাঠাকুর যা বলেছেন বলেছেন, তুমি মায়ের কাছে যাও। আমার দেখাশোনা আমিই করতে পারবো। তুমি বরং শম্ভুচরণকে বলে দাও, শ্রীনিবাসকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিতে।

নীরজাসুন্দরী দেখেছে, ভৃত্য শ্রীনিবাসই মধুসূদনের কাজকর্ম করে এই গৃহে।

নীরজাসুন্দরী বললে, আমি থাকলে ক্ষতি কি ? আমি কি আপনার সেবা করতে পারবো না ?

—দেখো তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, যা বললাম তাই কর।

নীরজাসুন্দরী বুঝতে পারে ঐ ঘরে তার উপস্থিতি স্বামীর অভিপ্রেত নয়। কিন্তু সেও যাবে না স্থির করে, বললে, ঠাকুর আমাকে বলে গেলেন আপনার দেখাশোনা করতে, আমি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবো না।

—তুমি আমার কথা শুনছো না কেন ? মধুসূদনের কণ্ঠস্বর একটু যেন কঠোর শোনায়।

—আপনি উত্তেজিত হবেন না, আপনি সুস্থ নন এখনো, আপনি শয্যায় উঠে বসুন।

মধুসূদন এবারে পূর্ণদৃষ্টিতে নীরজাসুন্দরীর দিকে তাকাল।

নীরজার মাথার গুণ্ঠন খসে পড়েছে। সেও পূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের অজ্ঞাতেই যেন মধুসূদনের দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের ওপরে কিছুক্ষণ নিবদ্ধ হয়ে থাকে। এবারে শ্বশুরগৃহে আসার পর এই প্রথম মধুসূদন যেন নিজ স্ত্রীর মুখের দিতে তাকাল।

মধুসূদন শয্যাগ্রহণ করলো না। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শয্যা থেকে অবতরণ করল।

নীরজা তাড়াতাড়ি বললে, কোথায় যাচ্ছেন? আপনার কি প্রয়োজন বলুন, আমি তো আছি—

মধুসূদনের ইচ্ছা থাকলেও দু'পা হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। দেহের দুর্বলতা তখনো তার সম্পূর্ণ যায় নি। মধুসূদন শয্যার উপরে পুনরায় উপবেশন করে বললে, ঐ আলমারির মধ্যে একটা বোতল আছে এনে দাও।

কক্ষের মধ্যে একটি আলমারি ছিল। মধুসূদন সেই আলমারিটিই দেখিয়ে দিল।

—চাবি?

—চাবি দেওয়া নেই, খোলাই আছে।

নীরজা এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললো। থাক থাক সব বই সাজানো আলমারির মধ্যে।

মধুসূদন বললে, দেখো ঐ দ্বিতীয় তাকে বইয়ের পিছনে বোতলটা আছে।

নীরজাসুন্দরী নির্দিষ্ট স্থান থেকে বোতলটি বের করলো, বিলাতী সুরার বোতল।

জীবনে ইতিপূর্বে কখনো নীরজাসুন্দরী সুরার বোতল দেখে নি। সুরা মানুষে পান করে তা অবিশ্যি সে জানত, কিন্তু নিষ্ঠাবান পিতার গৃহে কখনো যেমন সে ইতিপূর্বে কাউকে সুরাপান করতে দেখে নি, তেমনি দেখে নি সুরার বোতল।

বোতলটি সম্পর্কে কৌতূহল হলেও কোন প্রশ্ন কিন্তু সে করল না। নিঃশব্দে বোতলটি এনে সে স্বামীর হাতে তুলে দিল।

হিন্দু কলেজে পাঠাভ্যাসকালেই মধুসূদন সুরাপানে অভ্যস্ত হয়েছিল, যদিও গৃহের কেউ সে কথা জানত না, জানতেও পারে নি।

একমাত্র কথাটা জানত ভৃত্য শ্রীনিবাস।

—একটা গ্লাস দাও। মধুসূদন বললে।

ঘরের কোণে সরাইয়ের উপরে একটা গ্লাস ছিল, সেটা এনে দিল নীরজাসুন্দরী

স্বামীর হাতে। গ্লাসে সুরা ঢেলে মধুসূদন একটা দীর্ঘ চুমুক দিল।

নীরজাসুন্দরী নীরবে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

—এটা কি জান? সুরা!

—আপনি সুরাপান করেন?

—করি।

—বাবার মুখে শুনেছি—

—কি শুনেছো?

—সুরাপান ভাল নয়।

—তিনি নিশ্চয়ই জানেন না, আজকাল সব শিক্ষিত লোকরাই সুরাপান করে থাকে। বলতে বলতে আবার হাতের গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিল মধুসূদন।

—কি নাম যেন তোমার?

—কেন, আপনার মনে নেই আমার নাম?

—কই না, মনে পড়ছে না তো!

—নীরজা।

—নীর মানে জান?

—জানি, বারি।

—নীরজ শব্দের কোন মানে হয়?

—হয়, পদ্ম।

মধুসূদন বুঝতে পারে ইংরাজী শিক্ষা না পেলেও নীরজা একেবারে মূর্খ নয়, কেমন যেন তার একটু কৌতূহলও হয়। বলে, নীরদ শব্দের কি অর্থ হতে পারে?

—জল দেয় যে, মেঘ।

—কে তোমার নামকরণ করেছেন?

—শুনেছি আমার পিতামহ জগদীশ তর্কবাগীশ—

—নীরজা!

—বলুন?

—তুমি কবি মধুসূদনের কোন কাব্য পড়েছো?

—পড়েছি। তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ—

—বাঃ, মেঘনাদবধ পড়েছো?

—পড়েছি।

ঠিক ঐ সময় কলুটোলার নিবারণচন্দ্র সেনের গৃহে কুসুমকুমারী তার শয়নকক্ষে

বসে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করছিল। রাত্রি অনেক হয়েছে। কুসুমকুমারী পড়ছিল—

—"কেমনে কহিব,
কেন প্রাণনাথ তবে বিলম্বন আজি।
কিন্তু চিন্তা দূর কর, সীমন্তীনি।
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।

নিবারণচন্দ্র এসে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। স্বামীর পদশব্দ শুনে কুসুম-কুমারী হাতের পুস্তকখানি বন্ধ করে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

—কি পড়ছো গো? নিবারণচন্দ্র শুধালেন।

—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য। তা তোমার কাজ শেষ হলো?

নিবারণচন্দ্র মৃদু হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, আপাতত।

—দেখো, কয়েকদিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি—

—ভাবছো তো বলো নি কেন?

—তুমি অসন্তুষ্ট হবে না বলো!

—অসন্তুষ্ট হবো কেন?

—না, তাই বলছি—

নিবারণচন্দ্র শয্যার উপর এসে বসলেন। বললেন, বলো, শুনি তোমার কথা

—তুমি আবার বিবাহ করো।

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে নিবারণচন্দ্র যেন বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান। তাঁর কণ্ঠ হতে কোন স্বর নির্গত হয় না।

—কি বললে?

—তুমি আবার বিবাহ করো। আমিও তোমাকে আজ পর্যন্ত কোন পুত্রসন্তান দিতে পারলাম না!

—ছি, কুসুম—

—ছি কেন, আমার শ্বশুরকুলের পূর্বপুরুষেরা কি একগণ্ডূষ জল পাবেন না?

—মৃত্যুর পরে পরলোকের কথা তো কেউ আমরা জানি না।

—পণ্ডিতরা তো তা বলেন না—

—পণ্ডিতদের কথা বাদ দাও, সহজ বুদ্ধিতে যা বুঝতে পারি—

—আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না। বিবাহ তোমাকে করতেই হবে।

—কিন্তু আবার বিবাহ করলেই যে পুত্র-মুখ দর্শন করতে পারবো তার নিশ্চয়তা

কি ?

—আমি বলছি হবে।

—না, সে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

—তবু তোমায় আবার বিবাহ করতেই হবে। দেখো আমি পাত্রী স্থির করেছি, কন্যাটি সর্বসুলক্ষণা, আমাদের জ্ঞাতির কন্যা—

—বাঃ, পাত্রী পর্যন্ত স্থির করে ফেলেছো !

—হ্যাঁ। ভাবছি খুড়োমশাইকে আসতে লিখবো—

—না কুসুম, পাগলামি করো না। পুত্র হবার হলে তোমার গর্ভেই হতো। পুত্রভাগ্য আমার নেই, আমি জানি—

—ওগো, তুমি অমত করো না।

—কুসুম, তুমি বুঝতে পারছো না—

—পারছি।

—না, তুমি পারছো না।

—শোন আমি স্থির করেছি, আনন্দকে পাঠাবো সংবাদ দিয়ে। শুনেছো বোধ হয়, তার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। সে প্রথমে যাক, পুত্রমুখ দর্শন করে আসুক, অমনি খুড়োমশাইকেও ফরিদপুরে একটা সংবাদ দিয়ে আসবে।

—না না কুসুম, ওসব পরিকল্পনা ত্যাগ করো।

—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে বাধা দিও না। এই কর্তব্যটুকু আমাকে পালন করতে দাও।

নিবারণচন্দ্র এবারে আর স্ত্রীকে বাধা দিলেন না।

মনের মধ্যে কি পুত্রলাভের একটা তৃষ্ণা ছিল না তাঁর ? ছিল। কুসুমকুমারীকে বিবাহ করেছেন—তাও দীর্ঘ আট বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কুসুমকুমারী মা হতে পারল না।

মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল বৈকি।

—তুমি বসো, আমি দিদিকে বলে আসি তোমার আহার্য দিতে। কুসুমকুমারী কক্ষ ছেড়ে চলে গেল।

আর নিবারণচন্দ্র !

তাঁর মনের মধ্যে তখন অন্য চিন্তা।

বয়েস তাঁর তিপ্পান্ন কি চুয়ান্ন হবে।

এমন কি আর বয়স হয়েছে ?

নিবারণচন্দ্র মুখে প্রতিবাদ জানালেন বটে স্ত্রী কুসুমকুমারীর কথার, কিন্তু

অন্তরের মধ্যে তেমন তীব্র প্রতিবাদ ছিল কোথায়? চিরদিন শাস্ত্রের বচন শুনে এসেছেন, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। প্রথমবার সেই ভার্যা যখন তাকে কোন পুত্রসন্তান দিতে পারল না, তখন কুসুমকুমারীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার সময় মনের মধ্যে যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, এবারেও বোধ করি সেই সান্ত্বনাই মনের মধ্যে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করলেন।

সত্যিই তো এত বৎসরে যখন কুসুমকুমারী মা হতে পারল না, তখন কি আর কোন আশা আছে তার দিক থেকে?

কুসুমকুমারী আজ অদ্ব্যর্থ ভাষায় কথাটা প্রকাশ করেছে বটে, কিন্তু তার মনের মধ্যে কি কথাটা কিছুকাল যাবৎই ঘোরাফেরা করছিল না?

অথচ আশ্চর্য, একবারও নিবারণচন্দ্রের মনে হলো না, তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেও তাঁর আশা ফলবতী নাও হতে পারে।

কুসুমকুমারী তার সপত্নীর কক্ষে এসে প্রবেশ করে দেখলো, রত্নাবতী প্রদীপের আলোয় বসে ভাগবত পাঠ করছেন।

—দিদি!

—কে ছোট, আয়। কর্তা কি বহির্মহল থেকে এখনো আসেন নি?

—এসেছেন, তুমি যাও, আমি আসন পেতে দিয়ে এসেছি।

রত্নাবতী চলে গেলেন।

কুসুমকুমারী কিন্তু ঘর থেকে বেরুল না। বুকের মধ্যে তখন তার একটা কান্নার সমুদ্র যেন আথালি-পাথালি করছে। সে একবারও ভাবে নি, স্বামী তার এত সহজে তৃতীয়বার দারপরিগ্রহে সম্মত হয়ে যাবেন।

কথাটা অবিশ্যি কুসুমকুমারীর কখনো মনে হয় নি, কথাটা বলেছিলেন কিছুদিন আগে রত্নাবতীই।

—দেখ কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম তোকে একটা কথা বলবো ছোট—

—কি কথা, দিদি?

—আমাদের শাশুড়ী ঠাকরুণ থাকলে হয়ত আজ কথাটা তিনিই তোকে বলতেন—

—অত কিন্তু করছো কেন দিদি, বলো না কি বলবে।

—বলছিলাম তোর তো কোন সন্তানাদিই হলো না—

—দিদি!

—আট বৎসর তো হয়ে গেল। কর্তার আবার বিবাহ দিলে কেমন হয়?

—এই বয়েসে আবার বিবাহ! কুসুমের বিস্ময়ের যেন অবধি নেই।

—শোন কথা! পুরুষমানুষের আবার বয়স কি রে?

—তা বেশ তো দিদি—

—তাছাড়া ভেবে দেখ, শ্বশুরমশাইয়ের বংশলোপ পেয়ে যাবে একদিন, সাতপুরুষ একগণ্ডুষ জল পাবে না, তৃষ্ণায় হা-হা করে বেড়াবে—

—না দিদি, তা কেন হবে—তুমি ব্যবস্থা করো।

—তোর সেই দূরসম্পর্কীয় খুড়োমশাইয়ের একটি তেরো বৎসরের কন্যা আছে না বলছিলি!

—কার কথা বলছো?

—আরে সেই যে ফরিদপুরের সরস্বতী না কি নাম—

—হ্যাঁ।

—তারই সঙ্গে দেখ না। কাজটা তোকেই চেষ্টাচরিত্র করে সম্পন্ন করতে হবে।

সেই কথাটাই আজ স্বামীর কাছে বলেছে কুসুমকুমারী।

কুসুমকুমারী শহরের মেয়ে, তার বাবা সূর্যকান্ত গুপ্তমশাই এই শহরেরই একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কুসুমকুমারী তাঁর চারটি কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। পাঠশালায় সে তার দাদামশাই সিদ্ধান্তবাগীশের কাছে লেখাপড়া শিখে বৎসর দুই বেথুন স্কুলেও পড়েছিল। তিনটি কন্যার বিবাহ সাধারণ ঘরেই দিয়েছিলেন সূর্যকান্ত। কুসুমকুমারীর রূপ ছিল, সেই রূপের জন্যই নিবারণচন্দ্রের তাকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

সূর্যকান্তও নিবারণচন্দ্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। বৎসর দুই আগে সরস্বতী তার পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল সূর্যকান্তর গৃহে, সেই সময় কুসুমকুমারী তাকে দেখে।

দু' চোখের কোণ ছাপিয়ে জল আসছিল, অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মার্জনা করল কুসুমকুমারী।

১৪

কুসুমকুমারী স্বপ্নেও ভাবে নি তার স্বামীর পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে তাকেই উদ্‌যোগী হতে হবে।

কুসুমকুমারী দেবতা-জ্ঞানে স্বামীকে মনে মনে পূজা ও ভক্তি করতো। সপত্নী রত্নাবতী যখন তার খুড়তুতো বোন সরস্বতীর সঙ্গে তাদের স্বামীর আবার

বিবাহের কথা বললো এবং যুক্তি দেখালো—যে কারণে সে নিজে আগ্রহ করে একদিন কুসুমকুমারীর সঙ্গে স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়েছিল—সেই সন্তান সে যে স্বামীকে দিতে পারে নি এত বছরেও, সেই কারণেই তারই এবারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর তৃতীয়বার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। স্বামীর বংশরক্ষার জন্য তাকেই এবারে অগ্রণী হতে হবে।

কুসুমকুমারী ভাবেন সত্যিই তো।

সে এত বড় স্বার্থপর কেন হবে, তা ছাড়া স্বামীর জন্য সে সব কিছু ত্যাগ করতে পারে, এবং সে স্বামীর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিল মুখে নিবারণচন্দ্র যাই বলুন না কেন, মনের মধ্যে তাঁর পুত্রের আকাঙ্ক্ষা বলবৎ। সে তখন মনে মনে স্থিরসংকল্প করে সরস্বতীর সঙ্গে তার স্বামীর বিবাহ দেবে।

যথারীতি পরের দিন আনন্দচন্দ্র যখন গ্রামের দিকে যাত্রা করছে, কুসুম-কুমারী তখন তাকে তার শয়নকক্ষে ডেকে পাঠান।

আনন্দ কুসুমকুমারীর কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

—আমাকে ডেকেছিলেন কাকীমা!

—হ্যাঁ আনন্দ, তোমাকে আমার একটা কাজ করতে হবে—

—বলুন কি করতে হবে?

—তুমি গাঁয়ে যাচ্ছো আজ?

—হ্যাঁ, একটু পরেই রওনা হবো।

—তোমাকে যাবার পথে ফরিদপুর হয়ে যেতে হবে—

—ফরিদপুর!

—হ্যাঁ, সেখানে আমার এক জ্ঞাতি খুড়োমশাই থাকেন—চন্দ্রকান্ত গুপ্ত, তাঁর নামে একটা চিঠি দেবো। সেই চিঠিটা তোমায় যাবার পথে ফরিদপুর হয়ে খুড়ো-মশাইয়ের হাতে দিয়ে যেতে হবে, পারবে না?

—আজ্ঞে, কেন পারবো না?

কুসুমকুমারী বললে, চিঠিটা প্রয়োজনীয় ও জরুরী। চিঠিটা তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়ে যেতে তোমার ভুল হবে না তো!

—না না, দিন আপনি চিঠিটা কাকীমা।

কুসুমকুমারী একখানা ভাঁজ-করা পত্র আনন্দের হাতে তুলে দিল। বললে এই নাও চিঠি, যত্ন করে রেখো, যেন পথে না হারিয়ে যায়।

—না, হারাবে না।

চিঠিটা জামার ভিতরের পকেটে রেখে আনন্দচন্দ্র কুসুমকুমারীর পদধূলি নিয়ে

কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। আনন্দ জানতও না পত্রের মধ্যে কি লেখা আছে। পড়ে দেখবার কোন কৌতুহলও তার মনের মধ্যে জাগে নি।

কিন্তু পরবর্তীকালে আনন্দ চিঠির বক্তব্য জানবার পর নিজেকে যেন বেশ কিছুটা অপরাধী বোধ করেছিল, প্রস্তাবটা সে-ই নিজে বহন করে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল বলে। এবং সেই অপরাধবোধ থেকে কোনদিন সে মুক্ত হতে পারে নি।

প্রায় বৎসরখানেক বাদে আনন্দ আবার গৃহে ফিরে এলো।

তার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তার বয়স এখন প্রায় তিন মাস। গৃহে পা দিতেই বিন্দুবাসিনী যেন কলকলিয়ে উঠলো আনন্দে।

—দাদা শুনিছো, তোমার ছাওয়াল হইছে!

ক্রমে ক্রমে বাড়ির আর সকলেই এসে আনন্দচন্দ্রকে ঘিরে দাঁড়ায়। বাড়ির মধ্যে যেন একটা আনন্দোৎসব পড়ে যায় নবজাত পুত্র ও তার পিতা আনন্দচন্দ্রকে নিয়ে। কি এক অনাস্বাদিত আনন্দে আনন্দচন্দ্র যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে অসম্ভব একটা লজ্জাও যেন তাকে ঘিরে ধরে। ভাল করে সে তার পুত্রের মুখের দিকে তাকাতেও পারে না।

নিভাননী নবজাতককে কোলে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায় আনন্দর। আনন্দ যেন চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। কেবল বুকের ভিতরটা কি এক আনন্দে বেতস পাতার মত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

রাত্রে সেই ঘরে দেখা হলো আবার স্ত্রীর সঙ্গে। পুত্রের জননী অন্নদাসুন্দরীর সঙ্গে।

ঘরের কোণে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। অন্নদা শয্যায় শায়িত পুত্রের কাছে বসেছিল মাথায় গুণ্ঠন তুলে। সন্তর্পণে দরজায় অর্গল তুলে দিয়ে আনন্দচন্দ্র স্ত্রীর সামনে এসে শয্যায় উপবেশন করল। এবং একবার ভাল করে তাকাল তার পুত্রের মুখের দিকে।

—দেখি দেখি বৌ, ওকে একটু আমার কোলে দাও।

অন্নদা বললে, ঘুমুচ্ছে যে—

—তা হোক, দাও।

—জেগে যাবে।

—জাগুক, দাও আমার কোলে।

অন্নদা সন্তর্পণে পুত্রকে স্বামীর প্রসারিত দুই বাহুর মধ্যে তুলে দিল।

নবজাতকের গা থেকে যেন কেমন একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। নাসারন্ধ্রে সেই গন্ধটা এসে প্রবেশ করে।

শিশুর মুদ্রিত আঁখি দুটির দিকে গভীর মমতায় তাকিয়ে থাকে আনন্দ নির্নিমেষে। পুত্র—তার পুত্র—তার আত্মজ।

সে আজ পিতা। সন্তানের পিতা।

সেদিনের সেই আনন্দ ও অনুভূতি যেন কোনদিন আর পায় নি আনন্দচন্দ্র। পরবর্তীকালে তার আরো পাঁচটি পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তান হয়েছিল, কিন্তু সেই রাত্রের সেই আনন্দানুভূতি সে পায় নি আর।

—এর কি নাম রেখেছি জানো?

—কি গো। অন্নদা শুধাল।

—দক্ষিণারঞ্জন।

—সত্যি! ঠাকুরও তো ঐ নাম রেখেছেন!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দক্ষিণ দিকের ঘরে ও জন্মেছে বলে ঠাকুর ওর নাম রেখেছেন দক্ষিণারঞ্জন।

—আশ্চর্য, বাবা আমার মনের কথাটি জানলেন কি করে! আনন্দচন্দ্র বললে।

আরো একটা ব্যাপার, সেরাত্রে অন্নদাসুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আনন্দচন্দ্র যেন উপলব্ধি করতে পারে, কিশোরী অন্নদা যেন রাতারাতি জননীর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিতা হয়ে গিয়েছে।

সে আর বধূ নয়, সে মাতা। সে জননী। এবং সেও আজ সন্তানের পিতা।

সন্তানের পিতৃত্বে যে এত আনন্দ কে জানত। রাতারাতি যেন বিরাট এক দায়িত্ব তার কাঁধের উপর এসে পড়েছে। বিরাট কর্তব্যের এক গুরুভার।

দিনদশেক বাদেই আনন্দচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে এলো। এবং ফিরে এসেই সে সংবাদটা পেল। খুড়োমশাই নিবারণচন্দ্র আবার বিবাহ করেছেন।

সংবাদটা শুনে আনন্দচন্দ্র যেন একটু বিস্মিতই হয়। সংবাদটা সেইদিন রাত্রে কুসুমকুমারীর মুখ থেকে সে শুনল।

রাত্রে যখন সে বিশ্রাম নিচ্ছে, কুসুমকুমারী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

—আনন্দ?

আনন্দ তাড়াতাড়ি শয্যার উপরে উঠে বসে।

—কাকীমা!

—বাড়ির সব ভাল?

—হ্যাঁ!

—ছেলের মুখ দেখলে ?

লজ্জায় আনন্দচন্দ্র মুখ নীচু করে।

—কেমন হয়েছে দেখতে ?

আনন্দচন্দ্র নীরব।

—আমি কাল বাপের বাড়ি যাচ্ছি—

—বাপের বাড়ি যাচ্ছেন !

—হ্যাঁ।

—আবার কবে আসবেন কাকীমা ?

—দেখি। জানো আনন্দ, নারীজন্মের সার্থকতা একমাত্র সে যখন পুত্রের জননী হয়। তোমার স্ত্রী সত্যিই সৌভাগ্যবতী, পুত্রের জননী হয়েছে সে। বন্ধ্যা নারীর জীবনের কোন মূল্য নেই।

আনন্দ কুসুমকুমারীর কথাটার ভাবার্থ ঠিক গ্রহণ করতে পারে না যেন। সে বিস্ময়ে কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দু'চোখে জল।

—আমাকে তোমার খুড়োমশাই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন পুত্রলাভের আশায়, কিন্তু আমিও তাকে সন্তান দিতে পারলাম না। তাই—

—কাকীমা !

—তোমার খুড়োমশাই আবার বিবাহ করেছেন—

—খুড়োমশাই বিবাহ করেছেন।

—হ্যাঁ, আমারই এক জ্ঞাতি বোনকে। সরস্বতী যেন তোমার খুড়োমশাইয়ের মনস্কামনা এবার পূর্ণ করতে পারে। আমি কাল প্রত্যুষেই যাত্রা করছি, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না তাই এসেছিলাম।

আনন্দচন্দ্র কেমন যেন বিমূঢ়ভাবে সেই বিষাদপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুসুমকুমারী অঞ্চলপ্রান্ত থেকে একটি সরু সোনার হার বের করল। তারপর বললে, আনন্দ এই হারটি রাখো, তোমার পুত্রের মুখদর্শন করা তো আমার হলো না, এই হারটি তাকে দিও, আমার আশীর্বাদ।

পরের দিন থেকে আনন্দচন্দ্রের জীবন আবার পূর্বের খাতে বইতে শুরু করল। কলেজে যায়, পাঠ্যাভ্যাস করে মনোযোগ সহকারে। তার উপরে দায়িত্ব এসেছে, সে পিতা হয়েছে, তাছাড়া এবারে যেন দেশে গিয়ে দেখে এলো ভারতচন্দ্র বেশ বুড়িয়ে গিয়েছেন।

সংসারের গুরুভার টানতে টানতে যেন আজ তিনি ক্লান্ত। তাকে তাড়াতাড়ি সংসারের হাল ধরতে হবে।

ভারতচন্দ্রও আসার সময় বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি ডাক্তারিটা পাস করে এসে গাঁয়ে বোস, আমি থাকতি থাকতি এখানে এসে বসতি পারলে আমার রোগীপত্তরগুলো তুমি পাবা।

আনন্দচন্দ্র বাংলাবিভাগে পড়তো।

সেদিন দ্বিপ্রহরে অনেকদিন বাদে মধুসূদনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাত্র দিনকয়েক হলো মধু আবার কলেজে যাতায়াত শুরু করেছে।

—মধু যে, কেমন আছো?

—ভাল।

মধুর মুখেই শুনলো আনন্দ, মধু আবার খিদিরপুরের গৃহ থেকেই কলেজে যাতায়াত শুরু করেছে রামপ্রাণ গুপ্তের নির্দেশে। বললে, বাবা কিছুতেই সম্মতি দিলেন না, বললেন, বাড়ি থেকেই পড়াশুনা করবে, কিন্তু পড়াশুনা আমার কিছুই হচ্ছে না।

—কেন?

—না, পড়ায় যেন মনই বসাতে পারছি না।

আনন্দর কি মনে হলো। প্রশ্ন করলে, তোমার স্ত্রী এখন কোথায় মধু?

—বাড়িতেই আছে।

আনন্দ বললে, তা পড়াশুনা হচ্ছে না কেন?

—কি জানি কেন মন বসাতে পারছি না!

আর বেশী কথা হলো না। মারট সাহেবের ফার্মাকোলজীর ক্লাস ছিল, মধু চলে গেল।

আনন্দ মড়াকাটা ঘরের দিকে এগুলো।

কলেজে আনন্দর আরো একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত। আনন্দর চাইতে বয়সে দেবেন্দ্র বৎসর-দুই বড়ই হবে। তার গৃহের অবস্থাও ভাল। তার বাপ একজন মুৎসুদ্দি, প্রচুর উপার্জন করেন। হাটখোলায় বাড়ি। কম্পাউণ্ড ধরে এগুতে এগুতে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আনন্দ বললে, এদিকে কোথায় যাচ্ছো? ক্লাসে যাবে না?

—না।

—ক্লাস কামাই করবে?

—দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছি।

—দক্ষিণেশ্বরে! হঠাৎ সেখানে কেন হে? কোন আত্মীয়ের বাড়ি?

—না।

—তবে?

—রানী রাসমণির মন্দিরে নাকি একজন পাগলা ঠাকুর এসেছেন—

—পাগলা ঠাকুর!

—হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। তিনি নাকি ভগবানের দর্শন পেয়েছেন।

—ভগবানের দর্শন!

—হ্যাঁ। শোন নি তাঁর নাম?

—না তো!

—কেশব সেন, নাট্যকার ও নট গিরিশ ঘোষ সেখানে তো নিয়মিত যান—

—ঐ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের কেশব সেন মশাই?

—হ্যাঁ। যাবে?

—না ভাই, ক্লাস কামাই হবে।

আনন্দচন্দ্র কথাগুলো বলে ক্লাসের দিকে পা বাড়ালো।

সেদিন যায় নি বটে আনন্দচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে, বৎসর খানেক বাদে গিয়েছিল। এবং সেইদিনই আনন্দচন্দ্র বুঝতে পেরেছিল—

যুগ যুগ ধরে মানুষ জন্মাচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে। মানুষের এই জন্ম-মৃত্যুর মিছিলের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ এমন এক এক জনের আবির্ভাব ঘটে যিনি এই জানা মিছিলের থেকে স্বতন্ত্র। বিশেষভাবে যার আবির্ভাব এক বিশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে আসে।

একক, অনন্য।

একটা যুগের একটা সম্ভাবনার প্রবর্তক তাঁরা। তাঁরা সেই চিরন্তন মিছিলের নতুন বার্তাবহ।

নতুন বাণী শোনাতে তাঁদের আবির্ভাব।

আর যেদিন আনন্দ সেখানে গিয়েছিল, সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেশব সেন।

রামকৃষ্ণ বলছেন তখন, দুধ কেমন, না ধোবো-ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। যিনি নিত্য তিনি ব্রহ্ম, যিনি লীলা তিনিই কালী। কালীই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই কালী।

কেশব সেন বললেন, কালী অত কালো কেন?

ঠাকুর বললেন, কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো না। দেখো আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ, কাছে গিয়ে দেখ কোন রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ কোন রঙ নেই। বলতে বলতে ঠাকুর গান ধরলেন।

মা কি আমার কালো রে,
কালো রূপে দিগম্বরী
হৃৎপদ্ম করে আলো রে!

কি এক অপূর্ব ভাব নিয়ে আনন্দচন্দ্র সেদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এসেছিল।

পুরোপুরি সাহেবীভাবাপন্ন মধুসূদন। আনন্দর মুখে সেদিন সে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল এবং এক অতিমানবকে দেখে এসেছে শুনে হাসল।

আনন্দ বললে, হাসছো যে?

—হাসি পেল তাই হাসলাম। মধু বললে।

—কেন, হাসি পেল কেন?

—হাসি পেল তোমার কথা শুনে, তাই হাসলাম। বললে মধু।

—তাই তো শুধাচ্ছি, কেন হাসি পেল?

—তোমার মানুষের উপরে দেবতার আরোপ—

—একবার চল না দেখবে তাকে মধু!

—দেখে কি হবে?

—তোমার আরাধ্য কবিবর মধুসূদন দত্তও তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, জানো?

—বাজে কথা বলো না—

—শুধু তিনিই নন, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও গিয়েছিলেন।

—গেলেও কিছু হবে না হে। মধু বললে। তুমি তো জান আনন্দ, আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মেরই অনুগত। তিনি কি বলেন জানো, চাই ব্রহ্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা। জড়ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করার সারমর্মই হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম।

—ঐ তোমাদের বিজয়কৃষ্ণর কথা বলছো! যিনি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বের হয়ে ধর্মপ্রচার করে বেড়াচ্ছেন!

—হ্যাঁ।

আনন্দ আর তর্ক করলো না।

আসলে সে বুঝতে পেরেছিল, মধু কি এক যন্ত্রণা যেন দিবারাত্রি বহন করে বেড়াচ্ছে নিজের মধ্যে। আনন্দ নিঃশব্দে অতঃপর স্থানত্যাগ করে চলে গেল।

মধুর ল্যাণ্ডোগাড়ি কলেজের সামনে অপেক্ষা করছিল, সে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

খিদিরপুরের গৃহেই সে আছে বটে। কিন্তু সেও রাত্রিটুকু। ভোর হতে-না-হতেই কলেজে চলে আসে। ফেরে সেই রাত আটটায়-ন'টায়।

রামপ্রাণ ও কমলাসুন্দরী জানেন ছেলে তাদের বৌ নিয়ে ঘর করছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? বস্তুতঃ এক গৃহে বাস করলেও, কতটুকু সম্পর্ক তার স্ত্রী নীরজা-সুন্দরীর সঙ্গে?

যে সময়টুকু সে গৃহে থাকে, বই নিয়েই কাটিয়ে দেয়। নীরজাসুন্দরীর সঙ্গে ক'টা কথাই বা তার হয়! অথচ নীরজাসুন্দরী সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে ছায়ার মত ঘোরে।

পড়ার ঘরে সে বসে মোটা মোটা বই পড়ে। শয়নকক্ষে নীরজাসুন্দরী ভাগ-বত বা রামায়ণ পাঠ করে, স্বামীর পদশব্দ পেলেই সে আলো নিভিয়ে দিয়ে গিয়ে ভূশয্যায় শুয়ে পড়ে।

সেরাত্রে পাঠের মধ্যে এমন মগ্ন হয়েছিল নীরজাসুন্দরী যে স্বামীর আগমনটা সে জানতে পারে নি।

মধু ঘরের মধ্যে ঢুকে পাঠরতা স্ত্রীকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

—কি পড়ছো?

মধুর প্রশ্নের চমকে মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে তাকাল নীরজাসুন্দরী স্বামীর মুখের দিকে।

—কি পড়ছিলে?

—কালিদাসের কুমারসম্ভব।

—সংস্কৃত কাব্য তুমি পডতে পারো?

—পারি।

—বুঝতে পারো?

—পারি।

—ওর চাইতেও ভাল ভাল কাব্য ইংরাজীতে আছে, জানো?

—কার লেখা?

—সেক্সপীয়ার নামে এক কবির—

—আমি তো ইংরাজী জানি না। নীরজাসুন্দরী বললে।

—পড়বে ইংরাজী ?

—আপনি যদি বলেন—

—কেন, ইংরাজী শিখতে তোমার ইচ্ছা হয় না ?

—আপনার ইচ্ছা হলে আমি পড়বো।

—কেন, তোমার নিজের থেকে ইচ্ছা নেই ?

নীরজাসুন্দরী স্বামীর কথার কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

—পড়বে, শিখবে ইংরাজী ?

—পড়বো, শিখবো।

—বেশ, আমি ব্যবস্থা করবো।

কথাগুলো বলে মধু গিয়ে শয্যার উপর শয়ন করল।

নীরজা উঠে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল।

শয্যায় গিয়ে শয়ন করে নীরজা, কিন্তু ঘুম আসে না।

১৫

কতকটা ঝোঁকের মাথায়ই মধুসূদন স্ত্রীকে ইংরাজী পড়ার জন্য বলেছিল। এবং রাত্রের সে কথা পরের দিন সে ভুলেও গিয়েছিল।

কিন্তু নীরজাসুন্দরী কথাটা ভোলে নি। প্রকৃত সহধর্মিণী হতে হলে যে সর্বতোভাবে স্ত্রীকে স্বামীর অনুগামিনী হতে হয় পণ্ডিত বাপের কাছে নীরজা সেই শিক্ষাই পেয়েছিল।

স্বামী যে তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন নি, বুদ্ধিমতী নীরজার সে কথা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় নি। কিন্তু সে আর কি করতে পারে। মনে মনে কেবলই ভেবেছে সে হয়ত সেই স্বামীর যোগ্য নয়। স্বামীর কোন অপরাধ নেই। স্বামী যেমনটি চান হয়ত সে তেমনটি নয়।

স্বামী তাকে পছন্দ করেন না, তাই সে নিজেকে সর্বদা আড়ালেই রাখবার জন্য সচেষ্ট। আড়ালে থাকলেও তার সদাজাগ্রত দু'টি চক্ষু সর্বদা যেন সজাগ হয়ে থাকত।

স্বামী প্রচণ্ড সাহেবীভাবাপন্ন। ইংরাজীতে ছাড়া বড় একটা কথাই বলে না। হয়ত সে ইংরাজী জানে না বলেই স্বামীর তাকে পছন্দ হয় নি। স্বামীরই যখন ইচ্ছা সে ইংরাজী শিক্ষা করবে মনে মনে স্থির করে।

দিন দুই পরে সে নিজেই সেদিন সন্ধ্যার পর মধুসূদন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে বললে, আপনি যে সেদিন বলেছিলেন—

ভ্রূ কুঞ্চিত করে মধুসূদন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল. কি বলেছিলাম ?

না, মানে আপনি—

কি বলেছিলাম তা বলবে তো ?

আপনি বলেছিলেন আপনি আমার ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

সত্যিই তুমি ইংরাজী শিখতে চাও ?

চাই।

ঠিক আছে কাল বই নিয়ে আসবো। কিন্তু বড় কঠিন ভাষা।

তা হোক।

মধুসূদন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল, সেখানে কেবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই নয়—একটা প্রত্যয়ের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেল মধুসূদন।

মধুসূদন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়েই পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরের দিন মধুসূদনের কলেজ থেকে ফিরতে একটু দেরিই হলো, ঘরের মেঝেতে বসে নীরজা কুমারসম্ভব কাব্য পড়ছিল। পদশব্দে তাড়াতাড়ি হাতের বই মুড়ে উঠে দাঁড়াল।

মধুসূদন একটা চটি বই স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরলো। বললে, এই নাও।

নীরজা হাত পেতে নিল বইখানা।

প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক।

ফার্স্ট বুক ?

হ্যাঁ, বইটা ভাল করে পড়লেই তুমি ইংরাজী শিখতে পারবে।

কিন্তু—

কি, বল ?

আমি তো ইংরাজী অক্ষর চিনি না।

চলো আমার পড়ার ঘরে, তোমাকে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেবো।

শুরু হলো নীরজাসুন্দরীর ইংরাজী পাঠাভ্যাস।

মধুসূদন দেখলো অসাধারণ বুদ্ধিমতী নীরজাসুন্দরী। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফার্স্ট বুকের পাতা থেকে ইংরাজী অক্ষরগুলো শিখে নিল নীরজাসুন্দরী।

বাঃ, চমৎকার! তোমার হবে—মধুসূদন বললে।

এক মাসের মধ্যেই নীরজা ঘোড়ার গল্পের পাতায় চলে গেল।

মধুসূদনেরও যেন কেমন নেশায় পেয়ে যায়। সে স্ত্রীকে ইংরাজী শিখাবার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু সে নেশা মধুর বেশী দিন থাকে না। মাস তিনেকের মধ্যে ভাটা পড়ে। নীরজা অপেক্ষা করে বসে থাকে, কিন্তু মধুসূদনের ঘর থেকে তার ডাক আসে না।

মধুসূদন আবার তার কলেজের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাস দুই বাদেই তার পরীক্ষা।

ঐ সময় হঠাৎ এক দ্বিপ্রহরে ছুটির দিন একটা ল্যাণ্ডো গাড়ি এসে রামপ্রাণ গুপ্তের দরজার সামনে দাঁড়াল। দারোয়ান ভৃত্যের দল এক মহিলাকে ল্যাণ্ডো থেকে অবতরণ করতে দেখে বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

কাদম্বিনী—কাদম্বিনীকে তো কেউ কখনো দেখে নি!

তা ছাড়া অল্প বয়সের মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই, গায়ে জ্যাকেট, পরনের শাড়ি কুচি দিয়ে পরা। মাথায়ও সিন্দুর নেই। গায়ে কোন অলংকার নেই।

ওহে শোন, এইটাই তো মধুসূদনবাবুর বাড়ি? একজন ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে কাদম্বিনী।

আজ্ঞে—ভৃত্য বললে।

আর একজন বললে, তা দাদাবাবু তো বাড়িতে নেই!

বাড়ি নেই?

না।

আজ ছুটির দিনেও তিনি নেই।

না।

অতঃপর কাদম্বিনী যেন কি ভাবলো মুহূর্তকাল, তারপর বলে, বৌঠাকরুন আছেন?

হ্যাঁ, বৌদিমণি আছেন।

তাঁর সঙ্গে একটিববার দেখা হতে পারে?

ভৃত্য বললে, খবর দিচ্ছি অন্দরে। তা কি বলবো, আপনি কোথা হতে আসছেন, কি নাম?

তিনি হয়ত আমার নাম বললে চিনবেন না, কাদম্বিনী বললে, বরং তাঁকে গিয়ে বলো একজন স্ত্রীলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আপনি আজ্ঞে বাইরের ঘরে বসেন, আমি অন্দরে এত্তালা পাঠাচ্ছি। ভৃত্য সবিনয়ে বললে।

তাই যাও।

ভৃত্য চলে গেল অন্দরের দিকে, অন্য একজন কাদম্বিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

নীরজাসুন্দরী তার ঘরে বসে ইংরাজী লেখা মক্স করছিল, দাসী এসে ঘরে ঢুকল।

বৌরানী!

নীরজা মুখ তুলে তাকাল, কি রে?

একজন স্ত্রীলোক ল্যাণ্ডো গাড়িতে চেপে এসেছেন, দাদাবাবুকে খুঁজছিলেন।

দাদাবাবু তো নেই।

তা বলেছিল রাম, তা তিনি বলছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

নীরজা রীতিমত বিস্মিত হয়। বলে, আমার সঙ্গে!

হ্যাঁ। রাম তো তাই বললে।

কোথা থেকে এসেছেন তিনি?

অতশত জানি না।

জানিস না?

না। বলেছে নাকি নাম বললে আপনি চিনবেন না—

কত বয়স রে?

তা তোমার চেয়ে বয়েসে বড় বলেই মনে হয়, রাম যা বললে কোঁচা দিয়ে শাড়ি পরা, গায়ে লেসের জ্যাকেট।

নীরজাসুন্দরী মনে মনে ভাবে, কে হতে পারে স্ত্রীলোকটি?

হ্যাঁরে সুখী, সঙ্গে আর কেউ আছে তাঁর? নীরজা প্রশ্ন করে।

না গো বৌরানী, একাই তো এসেছে শুনলাম।

হুঁ। আচ্ছা যা ঠিক আছে, এ ঘরে তাঁকে পাঠিয়ে দে; এক কাজ কর, সঙ্গে করে গিয়ে তাঁকে এ ঘরে নিয়ে আয়।

সুখী চলে গেল।

নীরজা তখনো ভাবছে, কে হতে পারে স্ত্রীলোকটি! তার স্বামীকে নিশ্চয়ই চেনে, নচেৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন কেন?

অল্পক্ষণ পরেই সুখদার সঙ্গে কাদম্বিনী এসে ঘরে ঢুকল।

হাত তুলে নমস্কার জানাল, নমস্কার।

নমস্কার।

কাদম্বিনী চোখ চেয়ে দেখছিল নীরজাসুন্দরীকে। এই নীরজাসুন্দরী, মধুসূদনের স্ত্রী! গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চনের মত, সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর, মাথায় গুণ্ঠন তোলা, গা-ভরতি গহনা।

বয়সও বেশী বলে মনে হয় না।

কিশোরী।

কাদম্বিনী মৃদু হেসে বললে, চিনতে পারছেন না তো! ভাবছেন কে আমি; সত্যি আপনি তো আগে আমাকে কখনো দেখেন নি।

মৃদুকণ্ঠে নীরজা বললে, কে আপনি?

আমি—

ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

হ্যা! তা মধুসূদনবাবু কখন ফিরবেন?

তা তো জানি না।

স্ত্রী আপনি তাঁর, জানেন না কখন তিনি ফিরবেন? যাক গে সে কথা. আমার নাম কাদম্বিনী। মধুসূদনবাবুর এক বন্ধুর বোন আমি। শোনেন নি বোধ হয় আমার নামটা কখনো?

না।

ঐ সময় কাদম্বিনীর নজরে পড়লো মেঝেতে রাখা খাতাটার উপর, যে খাতায় নীরজা ইংরাজী লেখার মক্স করছিল একটু আগে।

ঐ খাতাটা কার?

আমার।

আপনি ইংরাজী ভাষা জানেন?

না, শিখছি।

শিখছেন?

হ্যাঁ।

মধুবাবু বুঝি আপনাকে ইংরাজী শেখাচ্ছেন?

কোন জবাব দেয় না নীরজা। চুপ করে থাকে।

আচ্ছা, এবার আমি চলি।

চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন বললেন না তো?

কাদম্বিনী মৃদু হাসলো। বললে, যে জন্য এসেছিলাম সে কাজ আমার হয়ে

গিয়েছে। কেন এসেছিলাম জানেন?

কেন?

আপনাকে একটিবার দেখতে, পরিচয় করতে!

আমাকে দেখতে?

হ্যাঁ।

কেন?

কি জানি কেন, তবে আপনাকে একটিবার দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল। আপনি ভাগ্যবতী, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি স্বামী-সোহাগিনী হোন। ঐ দেখুন, কথায় কথায় আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি—

আমার নাম?

হ্যাঁ।

নীরজাসুন্দরী।

আচ্ছা চলি, কেমন?

উনি এলে কি বলবো?

কি আবার বলবেন! কিছু বলবেন না।

কিছু বলবো না?

না।

কেন?

আমার অনুরোধ। কথাটা যেন সে কোনদিন না জানতে পারে।

কেন?

রাখবেন তো আমার অনুরোধটা!

নীরজা কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

কাদম্বিনী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নীরজা এসে জানালার সামনে দাঁড়াল। একটু পরে দেখতে পেল কাদম্বিনী ল্যাণ্ডোতে উঠে বসল। গাড়িতে ওঠবার আগে একবার পিছন ফিরে তাকাল।

নারীমনের স্বাভাবিক অনুভূতি থেকেই নীরজা বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। কাদম্বিনী ভালবাসে মধুসূদনকে। যদিও আজ পর্যন্ত কখনো সে কাদম্বিনীর নামটা তার স্বামীর মুখ থেকে শোনে নি, তা হলেও কাদম্বিনীর ঐ গৃহে আসার ব্যাপারটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেবল কাদম্বিনীই যে মধুসূদনকে ভালবাসে তাই নয়, মধুসূদনও কাদম্বিনীকে ভালবাসে।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল নীরজাসুন্দরীর কাছে। ঐ কাদম্বিনীর জন্যই সে তার স্বামীর হৃদয়ে স্থান পায় নি। নীরজাসুন্দরীর মনে হয়, স্বামী তাঁর সে কথা মুখ ফুটে বললেন না কেন?

সে কি স্বামীর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত?

তার স্বামী যাকে নিয়ে সুখী হোন, সুখী হোন তিনি।

বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা কান্না উথলে উঠতে থাকে।

মিথ্যা—মিথ্যা তার জীবন।

স্বামীই যদি তাকে না গ্রহণ করলেন, এ জীবনের তার মূল্য কি? এই সংসারেই বা তার কিসের অধিকার? আর লেখা মক্স করা হল না নীরজাসুন্দরীর।

জীবনটাই আজ মিথ্যা বলে মনে হয়।

আর কাদম্বিনী!

ছুটন্ত ল্যাণ্ডো গাড়ির মধ্যে বসে বসে কাদম্বিনী ভাবছিল।

মধুসূদনের সঙ্গে দেখা করতে যাবার দুর্মতি কেন তার হয়েছিল! সে তো সেদিন হাসপাতালে স্পষ্ট করেই বলে এসেছিল, আর তাদের উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হবে না। মনকে তো সেইভাবেই তৈরি করবে বলে মনস্থ করেছিল তারা কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে কেন সে আবাব ছুটে গিয়েছিল মধুসূদনের গৃহে একটিবার তাকে শেষ দেখা দেখে যাবার জন্য?

মধুসূদন বিবাহিত। তার স্ত্রী আছে ঘরে। সে তো মনে মনে চেয়েই ছিল তারা সুখে ঘর করুক। সে সংসারে সে তার ছায়া ফেলবে না।

সত্যি নীরজা কী ভাবলো কে জানে?

বড় সরলা মেয়েটি।

আর এও বুঝেছে কাদম্বিনী, নীরজা তার স্বামীকে ভালবাসে। আর ভাল বাসবেই বা না কেন? অমন স্বামী পেলে কোন্ মেয়ে না সুখী হয়?

একসময় ল্যাণ্ডো গাড়ি এসে তাদের বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকে গাড়িবারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির সহিস আবদুল এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

কাদম্বিনী গাড়ি থেকে নেমে গাড়িবারান্দায় উঠতেই থমকে দাঁড়াল।

গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে মধুসূদন।

কাদম্বিনী!

মধুসূদন ডাকলো।

এ কি, তুমি?

হ্যাঁ, আমি। এসে শুনলাম তুমি কোথায় বের হয়েছো, তাই চলে যাচ্ছিলাম।

এসো ঘরে এসো।

কাদম্বিনী শান্ত গলায় বললে।

দুজনে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ করল।

ঘরে ঢোকার সময়ই গন্ধ পেয়েছিল কাদম্বিনী।

মধুস্দনের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি drink করেছো?

মধুস্দন কাদম্বিনীর মুখের দিকে তাকাল।

মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ করেছি। -

দিনের বেলাতেও তুমি মদ্যপান করো মধু?

করি তো। **Is there any harm?**

কাদম্বিনী মধুস্দনের কথার কোন জবাব দিল না। কেবল নিজে একটা কেদারায় বসে অন্য একটা কেদারা দেখিয়ে মধুকে বললে, বোস মধু।

মধুস্দন কেদারাটায় বসে বললে, কই আমার কথার তো জবাব দিলে না কাদম্বিনী?

কাদম্বিনী নীরব।

মধুস্দন বললে, দিনের বেলা কখনো আমি drink করতাম না। আজকাল করি।

কেন?

বুঝতে পার না তুমি?

না।

এ জীবনে আর আমার কি মূল্য আছে? জান drink করি আমি তোমাকে ভুলে থাকতে চাই বলে—

মধু, একটা কথা বলবো?

বল।

তোমার কিসের দুঃখ?

একদিন হয়ত সত্যই কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু যত দূরে তাকাই কেবল দুঃখ আর দুঃখ।

মধু, আমার একটা কথা শুনবে?

শোনবার মত হলে শুনবো।

তোমার স্ত্রীর প্রতি তুমি অবিচার করছো—

Please no advice!

অ্যাডভাইস নয়, আমার অনুরোধ, তুমি নীরজাসুন্দরীকে অবহেলা করো না।

কাদম্বিনী, তুমি তার নাম জানলে কি করে? আমি তো কখনো বলিনি?

না, বলো নি।

তবে?

আমি আজ তার কাছেই গিয়েছিলাম।

সে কি!

হ্যাঁ। অবিশ্যি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই তোমার গৃহে গিয়েছিলাম—

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ! গিয়ে শুনলাম তুমি গৃহে নেই, তখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা করি।

নীরজার সঙ্গে তুমি দেখা করেছো?

হ্যাঁ। বড় ভাল মেয়ে।

কিন্তু কেন—কেন গিয়েছিলে আমার গৃহে?

আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি মধু।

চলে যাচ্ছো! কোথায়?

সে জানাবে তোমার প্রয়োজন নেই। যাবার আগে শুধু একটা অনুরোধ জানিয়ে যাবো তোমাকে, নীরজাকে তুমি অবহেলা করো না, তাকে ভালবাসো, দেখবে তোমার সব অভাব সব দুঃখ—

এই কথাগুলো বলবার জন্যই কি তুমি আজ আমার গৃহে গিয়েছিলে?

না। বললাম তো শেষবারের মত দেখা করবার জন্য—

সত্যিই কি তার কোন প্রয়োজন ছিল কাদম্বিনী?

ছিল। যাক গে, তোমার ওখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম, গিয়ে ভালই করেছি। না গেলে তো নীরজাকে দেখতে পেতাম না। তাকে চিনবার অবকাশ হতো না। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারবো।

কাদম্বিনী, তুমি কি মনে করো আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেলেই আমি তোমাকে ভুলে যাবো!

যাবে।

যাবো!

হ্যাঁ। ভুলতে তোমাকে হবেই মধু। **It is better we forget each other**! তা ছাড়া—

তা ছাড়া?

একটি নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করবার অধিকার তোমারও নেই, আমারও নেই। নীরজা বড ভাল মেয়ে মধু, ওকে কষ্ট দিও না।

যেখানে ভালবাসা নেই—

ছি ছি, বলতে তোমার লজ্জা বা দ্বিধা হলো না! সে না তোমার বিবাহিতা স্ত্রী!

বিবাহটা আমার ইচ্ছায় হয় নি। So I don't have any responsibility!

পাগল তুমি।

না পাগল নয়, যা সত্যি তাই বলছি।

আমি আশা করবো, কিছুক্ষন স্তব্ধ হয়ে থেকে ধীর শান্ত গলায় কাদম্বিনী বললে, তোমার এ ভুল একদিন ভাঙবে। সেদিন বুঝতে পারবে, আমার কথা কত সত্য।

কথাগুলো বলে কাদম্বিনী উঠে দাঁড়াল।

চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

কবে যাবে?

জানাবো তোমায়।

জানাবে?

হ্যাঁ, তুমি জানতে পারবে।

কাদম্বিনী আর দাঁড়াল না। শ্লথ পায়ে কক্ষ ত্যাগ করে গেল।

মধুসূদন তার পরও অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত কেদারাটার উপর বসে রইলো। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়াল।

মধুসূদন সন্ধ্যানাগাদ ফিরে এলো গৃহে।

নীরজা তখন ঘরে ছিল না।

মধুসূদন নিজের পাঠকক্ষে ঢুকে একটা আরামকেদারা টেনে নিয়ে বসল। একটা নিদারুণ বিতৃষ্ণায় নীরজার প্রতি সে যেন ছট্‌ফট্‌ করছিল।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মধুসূদনের যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভৃত্য একটা জ্বলন্ত সেজবাতি হাতে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। কোন কথা না বলে বাতিটা টেবিলের ওপরে বসিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মধুসূদন জানত না সেরাত্রে রামপ্রাণ নিজগৃহে সাহেব-সুবোদের নিয়ে নাচগান ও খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বহির্মহলে তখন সাড়া পড়ে গিয়েছে।

গানবাজনার শব্দ আসছিল জানালাপথে। মধুসূদনের বিরক্তি বোধ হয়। উঠে জানালাটা বন্ধ করতে যাবে, জলখাবারের থালা হাতে নীরজাসুন্দরী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

পদশব্দে ফিরে তাকিয়ে স্ত্রীকে দেখে মধুসূদনের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো।

আজ কেউ এসেছিল এ বাড়িতে?

মধুসূদন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

নীরজা বললে, হ্যাঁ।

কে?

কাদম্বিনী দেবী।

তুমি তো তাকে চিনতে না?

না, তিনিই পরিচয় দিলেন।

কি বললে সে?

কই কিছু তো না।

কিছু বলে নি?

না।

তার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের কথাটা সে বলে নি?

না।

যাক ভালই হল—

কি?

তুমি সব জানতে পারলে।

আপনার জলখাবার এনেছি। নীরজা বললে।

মধুসূদন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

সে মুখে রাগ হিংসা অভিমান কিছুই যেন নেই।

যেন কঠিন এক প্রতিমার মুখ।

১৬

বস্তুতঃ মধুসূদন স্ত্রী নীরজাসুন্দরীর কথা শুনে ও কঠিন মুখখানার দিকে তাকিয়ে কেমন বুঝি একটু বিস্মিতই হয়। একজন সামান্য গোঁড়া মেয়ের মনের কাঠিন্যের সংবাদ পেয়ে তার যেন সত্যিই বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

নীরজাসুন্দরী আর কোন কথা বললো না, জসখাবারের থালা ও জলের গ্লাস সামনের টেবিলের ওপরে রেখে নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হতেই মধুসূদন ডাকল, শোন !

স্বামীর ডাক শুনে নীরজাসুন্দরী দাঁড়াল।

তোমার কি কিছুই বলবার নেই, নীরজা ? মধুসূদন বললে।

নীরজাসুন্দরী নীরব।

কাদম্বিনীকে আমি ভালবাসি—

নীরজাসুন্দরী একটিবার মাত্র স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করল।

দেখ আজ তোমাকে একটা কথা বলি, কাদম্বিনীকে আমি ভালবাসি। সে-ই সর্বক্ষণ আমার সমস্ত মনটা জুড়ে আছে। তুমি আমার স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী, আমি বুঝি তোমার প্রতি আমার কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্য থেকে হয়ত প্রতি মুহূর্তেই আমি বিচ্যুত হচ্ছি। কোন ধর্ম না মানলেও আমি এটা বুঝি যে, তোমার প্রতি আমি অবিচার করছি কিন্তু কি করবো বলো—কাদম্বিনীর জায়গায় তোমাকে কিছুতেই আমি বসাতে পারছি না। তুমি বুদ্ধিমতী বুঝতে পেরেছি—কাজেই সব কিছু তুমি নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এখন তুমিই বলো, আমি কি করবো ?

আমার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন গলায় কথাগুলো বলল নীরজাসুন্দরী।

চিন্তা করবো না।

না।

কিন্তু—

আপনি ইচ্ছা করলে কাদম্বিনীকে বিবাহ করতে পারেন।

নীরজা !

কেবল একটা অনুরোধ—

অনুরোধ ?

হ্যাঁ, এই গৃহ থেকে আমাকে অন্যত্র কোথাও যেতে বলবেন না।

না না, সে কি ! অমন কথা আমি বলবো কেন—এ তোমার নিজের গৃহ—

আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ যদি জানাই তো আশ্চর্য হবেন না—

না না, বলো।

আপনার সেবার অধিকারটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আপনার বিরক্তিভাজন যাতে না হতে হয় সর্বক্ষণ আমি আপ্রাণ

চেষ্টা করবো, সতর্ক থাকবো।

কথাগুলো শান্ত ধীর স্বরে বলে নীরজাসুন্দরী ধীরপায়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

মধুসূদন আর একটি কথাও বলতে পারে না।

নীরজা যেন তার সমস্ত ধ্যানধারণাকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে গেল। এক মহীয়সী নারীর পর্যায়ে সে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল।

মধুসূদন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

সামনে থালায় জলখাবার যেমন নীরজাসুন্দরী রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে রইলো।

সে-সব স্পর্শ করতেও যেন ভুলে গেল মধুসূদন।

মধুসূদন ভেবেছিল তার ঐ কথাগুলো শুনে নীরজাসুন্দরী কান্নায় হয়ত ভেঙে পড়বে। হিন্দুর ঘরের অসহায় বধূ, তা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে! চিরদিন যারা স্বামীর পদাশ্রিতা, চিরদিন তারা মুখ বুজেই থাকে। একসময় তো ঐ বধূরাই স্বামীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতায় তার সহগামিনী হতো।

অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্না—চিরটাকাল তো ঐ জীবনের সঙ্গেই পরিচিত।

কিন্তু নীরজাসুন্দরী যেন তার এতকালের জানাটাকে ধূলিসাৎ করে নিজ মর্যাদা ও পরীক্ষায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেল।

অবিশ্যি সাধারণ হিন্দুর ঘরের মেয়ের মত নীরজাসুন্দরী একেবারে অশিক্ষিতা নয়। সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা সাহিত্য সে পড়েছে পিতৃগৃহে। বেথুন কলেজে শিক্ষার সুযোগ না পেলেও শিক্ষার আলোকস্পর্শ সে পেয়েছে।

নিজের আত্মগত চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল মধুসূদন, এবং কতক্ষণ যে ঐভাবে বসেছিল তাও জানে না, একসময় আবার ঘরের মধ্যে নীরজাসুন্দরীর আবির্ভাবে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল।

এ কি! আপনি খান নি?

ও, তুমি—হ্যাঁ, এই যে খাচ্ছি—

না, এগুলো সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আপনি বসুন, আমি নূতন করে আবার খাবার প্রস্তুত করে আনছি। দেরি হবে না—বলে নীরজাসুন্দরী থালাটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে পড়ল মধুসূদনের কাদম্বিনীকে।

কাদম্বিনী হঠাৎ তার গৃহে আজ এসেছিল কেন?

ইতিপূর্বে কখনো তো সে এ গৃহে আসে নি!

আজ এমন কি ঘটল যে সে এখানে এসেছিল, এবং তার দেখা না পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গেই বা দেখা করে গেল কেন ?

ভৃত্য এসে ঐ সময় ঘরে প্রবেশ করল।

দাদাবাবু!

কি রে ?

একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কে—কি নাম বললে ?

নাম তো শুধাই নি। শুধিয়ে আসবো ?

না। বসতে দিয়েছিস তাঁকে ?

হ্যাঁ, নীচের ঘরে বসে আছেন।

তুই যা, আমি আসছি।

ভৃত্য চলে গেল। মধুসূদনও যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

নীচের ঘরে গিয়ে দেখে সুরেন্দ্র শীল। এককালে কিছুদিন হিন্দু কলেজে তার সঙ্গে পড়েছে।

শীলেদের বাড়ির ছেলে।

সুরেন্দ্র!

এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল—

খুব খুশী হয়েছি ভাই, মধুসূদন বললে।

তুমি আমাকে চিনতে পারবে ভাবতে পারি নি!

কেন ?

কত বছর আগেকার কথা তো, আমি অবিশ্যি তোমার সব সংবাদই জানি, রাখিও—তুমি তো মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ছো ?

হ্যাঁ। তা তুমি আজকাল কি করছো ?

কি আর করবো, বাবার সঙ্গে তাঁর ব্যবসায় যোগ দিয়েছি।

তা এদিকে কোথায় এসেছিলে সুরেন ?

ফোর্ট উইলিয়ামে এসেছিলাম—

সেখানে কেন ?

ওখানে কাঁচা তরিতরকারী সাপ্লাই করবার জন্য কনট্রাক্টটা নিতে। দেখলাম জানাশোনা না থাকলে, কারো সুপারিশ না থাকলে কাজ হয় না। তা তোমার পিতৃদেবের তো গোরাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে—তোমার পিতৃদেবকে যদি একটু আমার হয়ে অনুরোধ করো মধুসূদন—

দু-একদিন পরে এসো, বাবাকে বলে দেখবো—

না ভাই, কাজটা তোমাকে করতেই হবে।

বলবো।

তা চল না, আমি সোজা আমার বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে যাচ্ছি—আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, চলো না।

না।

ভাল গান শোনাবো।

না ভাই। আমার সামনে পরীক্ষা, পড়াশুনা করতে হবে।

সুরেন্দ্র তাচ্ছিল্যভাবে বললে, আরে দূর, পড়াশুনা তো আছেই। তোমাদের মত ভাল ছেলেদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জীবনটা কেবল পড়াশুনাই নয় হে, জীবনে আনন্দ বলেও একটা বস্তু আছে। চল চল।

না, ভাই—

শোন তাহলে তোমাকে বলি, গরাণহাটার দত্তদের মানে বড়বাবুর মেয়েমানুষটিকে আমি আমার বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে এনে রেখেছি। যেমন নাচে তেমনি ঠুংরী গায়—মনপ্রাণ তোমার একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবে, চল চল।

না ভাই, ক্ষমা করো।

বাগানবাড়িতে যেতে বুঝি তোমার আপত্তি ?

না, তা নয়।

তবে ?

বললাম তো পরীক্ষা কাছে—

তাহলে চল স্টার রঙ্গমঞ্চে। গিরিশ ঘোষের চৈতন্যলীলা নাটক হচ্ছে সেখানে। বিনোদিনী যা একটো করেছে না—নিমাই সেজেছে।

শুনেছি নাটকটার কথা। যাবো একদিন পরে—আজ না।

তবে চলি।

সুরেন্দ্র চলে গেল।

মধুসূদন আবার দোতলায় নিজের ঘরে চলে এলো।

এই বাগানবাড়ি আর মেয়েমানুষ আজকালকার ধনী লোকেদের যেন এক বিচিত্র বিলাস। মধুসূদন আদৌ ঐ ব্যাপার দুটো পছন্দ করে না। কিন্তু পড়াও আজ হবে না। মনটাই যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। পড়ায় মনও বসবে না। সুরেন্দ্র যা বলে গেল, আজ স্টারে নাটক দেখতে গেলে কেমন হয় !

ঐ সময় নীরজাসুন্দরী এসে ঘরে ঢুকল।

আপনার খাবার কি আনবো ? নীরজাসুন্দরী বললে।

না, এখন আর খাবো না।

মধুসূদন ভৃত্যকে ডেকে ল্যাণ্ডো বের করতে বললে।

পোশাক বদল করে মধুসূদন প্রস্তুত হল।

মধুসূদন যখন থিয়েটারের সামনে গাড়ি থেকে নামল, থিয়েটার তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা বক্সের টিকিট কেটে মধুসূদন হলে গিয়ে ঢুকল।

থিয়েটারের সেদিন এক বিশেষ রজনী। দক্ষিণেশ্বর থেকে পরমহংসদেব এসেছেন থিয়েটার দেখতে। মধুসূদন আজ পর্যন্ত কখনো পরমহংসদেবকে দেখে নি।

অনেকের মুখে নামই কেবল শুনেছে। উনি নাকি মা-কালীর সঙ্গে কথা বলেন। কেশব সেন মশাই একদিন বলেছিলেন, উনি একজন মহাসাধক—

হঠাৎ নজরে পড়লো মধুসূদনের, উলটোদিকের বক্সে বসে একজন। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাটা, একমুখ দাড়ি, গায়ে একটা কালো কোট—বোধ হয় পরনের ধুতিটা গলায় চাদরের মতো পরা।

তন্ময় হয়ে তিনি থিয়েটার দেখছেন।

ড্রপ পড়লো। গিরিশ ঘোষ এলেন ঐ বক্সে।

ঠাকুর !

কে গো, গিরিশ ?

কেমন লাগছে ?

আহা, আসল-নকল এক হয়ে গেছে গো। আসল-নকল এক হয়ে গেছে।

কথাটা মধুসূদনেরও কানে যায়।

মধুসূদন যেন চমকে ওঠে, তবে কি উনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব !

অনেক রাত্রে মধুসূদন থিয়েটার দেখে ফিরে এলো।

নীরজাসুন্দরী তখনো জেগে ছিল।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। নীরজাসুন্দরী স্বামীর প্রত্যাগমনের অধীর প্রতীক্ষায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে দৃষ্টি মেলে। গাড়ির শব্দ একটা পাওয়া গেল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ। ঐ বোধ হয় আসছেন তিনি।

ভৃত্য গোপাল বাইরের বারান্দায় প্রতীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে এসে ডাকল নীরজাসুন্দরী, গোপাল—এই গোপাল !

গোপাল নীরজাসুন্দরীর ডাকে ধড়ফড় করে উঠে বসে, কিছু বলছিলেন বৌরানী ?

দেখ গিয়ে নীচে, তোমাদের দাদাবাবু বোধ হয় এলেন।

গোপাল নীচের দিকে চলে গেল।

ততক্ষণে গাড়িটা এসে থেমেছে দেউড়িতে।

ল্যাণ্ডো থেকে নেমে মধুসূদন একবার তাকাল ভৃত্যের দিকে, তারপর সোজা ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে গেল।

ঘরে ঢুকেই মধুসূদন দেখলো, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নীরজাসুন্দরী।

এ কি, তুমি এখনো শুতে যাও নি ?

সন্ধ্যায় তো কিছু না খেয়েই চলে গিয়েছিলেন, খাবার দিই ?

মধুসূদন একবার তাকাল স্ত্রীর মুখের দিকে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, দাও।

নিজের শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর বসে নিবারণচন্দ্র আলবোলায় তামুক সেবন করছিলেন। রাত অনেক হয়েছে, কিন্তু এখনো সরস্বতী তার নবপরিণীতা স্ত্রী শয়নকক্ষে আসে নি।

মৃদু পদশব্দে নিবারণচন্দ্র সটকা থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, কে, ছোটগিন্নী ?

আমি !

কে ?

আমি কুসুম—

ও, মেজগিন্নী! এসো এসো। তোমার তো আজকাল আর দর্শনই পাওয়া যায় না !

একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

কথা—কি কথা, বলো ?

আমি পিত্রালয়ে যাবো।

পিত্রালয়ে, তা হঠাৎ ?

তোমার অনুমতি চাইতে এলাম—

তোমার কোন ইচ্ছায় তো আমি আজ পর্যন্ত কখনো বাধা দিই নি মেজগিন্নী !

না, বাধা দাও নি।

তবে ? তা কবে যেতে চাও ?

যত শীঘ্র সম্ভব।

হুঁ। তা একটা কথা বলছিলাম—

বল ?

ছোটগিন্নী একেবারে ছেলেমানুষ এখনো, সংসারের কিছুই সে জানে না, একেবারে বালিকা।

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকা গৃহিণী হয়ে যায়।

না, না—ও একেবারে বালিকা।

দুদিনেই সব শিখে নেবে, বুঝে নেবে। কারো কিছু দেখাবার বা শেখাবার প্রয়োজন হবে না। তা ছাড়া দিদি তো রইলেন, তিনি—

সে তো তুমি জান, থেকেও নেই। তার ঠাকুরঘর আর গৃহদেবতা নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত, তোমার হাতেই তো সংসার, তুমি সংসার না দেখলে কবে ভেসে যেতো।

ও তোমার ভুল।

ভুল!

হ্যাঁ, দিদির পর যেমন আমি সব দেখেছি, আমার অবর্তমানেও ঐ ছোটই সব দেখাশোনা করতে পারবে, ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।

কিন্তু এখন—মানে এই সময় না গেলেই কি নয় তোমার মেজগিন্নী?

আমি মনস্থির করে ফেলেছি একপ্রকার।

তবে আর কি বলবো। তা কবে যেতে চাও?

বললাম তো যত শীঘ্র সম্ভব, পরশু বা তার পরের দিন।

তা কবে আবার ফিরবে?

আমি আর ফিরবো না।

নিবারণচন্দ্র যেন চমকে কুসুমকুমারীর মুখের দিকে তাকান। কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, ফিরবে না মানে?

ফিরবো না, তাই বললাম।

এখানে আর ফিরে আসবে না তুমি—কেন, কেন মেজগিন্নী, তুমি কি তাহলে আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছো চিরদিনের মত?

না না—

তবে?

এ সংসারের প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে, তাই চলে যাচ্ছি—তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি—ছোটর ছেলে হলে তার অন্নপ্রাশনের সময় আসবো—সংবাদ পেলে যেখানেই থাকি না কেন।

মেজগিন্নী!

বল।

আমি তো আবার বিবাহ করতে চাই নি। তুমিই তো একপ্রকার জোর করে

এই বিবাহ দিলে।

ও কথা বলছ কেন ?

তা তুমি এভাবে চলে যাচ্ছো কেন ?

বললাম তো একটু আগে, এ সংসারের প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে।

কুসুম !

বল।

তুমি যদি বল তো—

কি ?

ছোট বৌকে তার পিত্রালয়ে কালই পাঠিয়ে দেবো।

ছি ছি! অমন কথাও বলো না। ও বলাও পাপ—শোনাও পাপ। আমি চলি—কুসুমকুমারী নিবারণচন্দ্রের শয়নকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

একটু পরেই সরস্বতী এলো ঐ কক্ষে।

ছোটগিন্নী এসো।

সরস্বতী এসে পালঙ্কের সামনে দাঁড়াল। মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

বোস, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।

সরস্বতী কিন্তু বসলো না। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়েই থাকে।

মেজগিন্নী চলে যাচ্ছেন শুনেছো ?

সরস্বতী নীরব।

চিরদিনের মতই মেজগিন্নী এ সংসার থেকে চলে যাচ্ছেন।

আমি কি করব ? মৃদুকণ্ঠে সরস্বতী বললে।

একমাত্র তুমিই তাঁর যাওয়া বন্ধ করতে পারো।

আমি !

হ্যাঁ, তুমি যদি তাকে না যেতে দাও।

আপনি আমাকে বলে দিন কি করতে হবে ?

বললাম তো তুমি তাকে যেতে দেবে না। পারবে না তাঁকে ধরে রাখতে ?

বলবো তাঁকে।

বলবো নয়, যেমন করে হোক তাঁর যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

আমি যাবো তাঁর ঘরে ?

এখন না। কাল সকালে বলো।

কেন তিনি চলে যাবেন ?

তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না ছোটগিন্নী।

পরের দিন সকালেই সরস্বতী কুসুমকুমারীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। কুসুম-কুমারী তখন জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল।

মেজদিদি!

কে? ছোট, আয়!

তুমি চলে যাচ্ছো?

কে বললে রে?

ঠাকুর বললেন কাল রাতে।

হ্যাঁ রে—আমি চলে যাচ্ছি।

কেন মেজদিদি, কেন তুমি চলে যাবে?

চিরকালের জন্য তো যাচ্ছি না রে। তোর কোল জুড়ে যখন একটি সোনার চাঁদ আসবে তখন আবার আসবো।

না মেজদিদি, তুমি যেতে পারবে না।

ছোট আমাকে বাধা দিস নে ভাই। আমার থাকার উপায় নেই।

আমি কি কোন অপরাধ করেছি?

না না, সে কি!

সরস্বতীর চোখে জলের ধারা।

ছি, কাঁদে না। কাঁদতে নেই। একদিন বুঝবি আমি চলে গিয়ে ভালই করেছিলাম। বলতে বলতে অঞ্চলপ্রান্তে সরস্বতীর চোখের জল মুছিয়ে দিল কুসুমকুমারী।

বস্তুতঃ কুসুমকুমারী জানত—সে থাকলে স্বামীর কাছ থেকে সরস্বতীর যতটুকু প্রাপ্য সে পাবে না। সর্বক্ষণ তাকে আড়াল করে সে-ই থাকবে মধ্যবর্তিনী। তাই সে আবার স্থিরসঙ্কল্প করেছিল সে চলে যাবে।

১৭

কলকাতা শহরে ঐ সময়ে একদিকে যেমন ইংরাজদের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কায়েমী হতে চলেছে—ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজদের আচারনীতি পঠনপাঠন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে চলেছে—তার পাশাপাশি তখন শুরু হয়েছে ধর্মের সংস্কার, ব্রাহ্ম ধর্মের ক্রমশঃ বিস্তার—নিঃশেষিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঙ্কালের উপর নতুন এক সমাজ ও ধর্ম বুঝি পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজেদের মধ্যে।

কিছুকাল আগে সিপাহী বিদ্রোহ নামে এক অধ্যায়ের শেষে রানী ভিক্টোরিয়া

দেশের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।

আসলে বোধ হয় ওটাই ছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আত্মোপলব্ধির প্রথ সংগ্রাম প্রথম পদক্ষেপ, যদিও সেটা স্পষ্ট রূপ সেদিন পায় নি। কারণ বিদ্রোহের আগুন সেদিন ভারতীয় সিপাহীরা জ্বেলেছিল তার পশ্চাতে সেদি কোন মহত্তর প্রতিজ্ঞা বা মহৎ প্রাপ্তির কোন ইংগিতই ছিল না।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একশ্রেণীর সেপাইয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রাম বা বিদ্রোহ— তদানীন্তন ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে—যার মূল কথা ছিল নিজ নিজ স্বার্থ ও নিজ নিজ সুবিধা প্রাপ্তির স্থূল আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

ইংরাজ শাসকের জোরজবরদস্তি থেকে মুক্তি পাবার একটা ইচ্ছা বা তুচ্ছ প্রচেষ্টা, হয়ত কিছুই নয়।

কিন্তু ঐ বিদ্রোহের বা সংগ্রামের মূলে সেদিন যাই থাক, ক্রমশঃ দেখা যেতে লাগল ভারতের সামাজিক কাঠামো ও পরিবেশে আসতে শুরু করেছে একটা পরি- বর্তন, একটা পরিবর্তনের সূচনা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে এবং যার প্রথম প্রকাশ আরো বেশ কিছুকাল আগেই ধর্মের মূলে একটা আঘাত হানার এবং সেদিন যিনি হাল ধরেছিলন তিনি ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐ ক্রমবর্ধমান খৃষ্টধর্মের প্রভাব বিস্তার সেদিনের ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন—ধর্মের একটা শক্ত আবরণ ও সেই সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার। মূলতঃ যার গোড়াপত্তন হিসাবে ধরা যেতে পারে ইংরাজী শিক্ষা।

রামমোহনের প্রবর্তিত ধর্ম আনলো সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে পরি- বর্তনের সূচনা। তবে দুটো ব্যাপার রামমোহন সঠিক ভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। ধর্মের দিকটা এগুতে লাগল—তারপর এলেন বীরসিংহ গ্রামের কর্মিতকর্মা পুরুষটি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি আনলেন নতুন এক শিক্ষার আলো। পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে উঠলো।

কথিত আছে রামমোহনের যেদিন সুদূর ইংলণ্ডে মৃত্যু হয় সেই দিনই অষ্টম- বর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রাম থেকেদীর্ঘপথ হেঁটে পিতার সঙ্গে এসে কলকাতা মহানগরীতে এসে পা রাখলেন, ইংরাজী বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হতে হতে।

এলো শিক্ষার নতুন আলোর সম্ভাবনা।

রাস্তার পাশে পাশে যে মাইলস্টোনগুলো পোঁতা ছিল—যার গায়ে খোদিত ইংরাজী ক্রমিক নম্বর এক, দুই, তিন—ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ইংরাজী গাণিতিক সংখ্যার

ভ পরিচয় ঘটে গেল। বালকের প্রথম পরিচয় ইংরাজী অক্ষরের সঙ্গে।

সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য সর্বতোভাবে যে শিক্ষার য়োজন ছিল, সেটা ক্রমশঃ সম্ভব হয়ে উঠতে লাগলো ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে। ারণ বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন, শিক্ষাই হচ্ছে কোন একটা জাতির জাগরণের ল মন্ত্র।

এলো বর্ণ-পরিচয়, কথামালার গল্প, উপক্রমণিকা। এবং শিক্ষাকে জনপ্রিয় রবার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নানা পরি-র্তনের মধ্য দিয়ে দীপের শিখাগুলো জ্বালিয়ে দিতে লাগলেন একের পর এক।

ওঁর চারপাশে তখন অনেক মনীষীর ভিড়, কলকাতা শহরের নবযুগের তিহাস তাঁরাই রচনা করেছেন। শিক্ষা আর ধর্ম—পাশাপাশি চলতে লাগলো ক অদ্ভুত অগ্রগতি। যে ধর্ম একদিন ছিল এ দেশে অর্ধশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিপয় ব্রাহ্মণদের হাতে, সেই ধর্মের মূলে প্রথম আঘাত এসেছিল এ দেশে ংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খৃষ্টধর্মের প্রভাবেই। যে প্রভাবের র্ণাবর্তে পড়ে সেদিন অনেকেই ঐ খৃষ্টধর্মের শিকার হয়েছিলেন প্রথম প্রথম।

রামমোহন সেই খৃষ্টধর্মের মূলে প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। তিনি দিলেন থের সন্ধান। তারপর একে একে এসে ঐ পথে ভিড় করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি। তাঁরা মুক্তির পথ বাতলালেন—ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন রে।

কিন্তু তাঁরা প্রথমটায় জানতেও পারেন নি—আর এক যুগপ্রবর্তক—ধর্মের হ ব্যাখ্যা দিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে জানবাজারের াণী রাসমণির ভবতারিণীর মন্দিরে। আবির্ভাব ঘটেছে পরমহংসদেব রামকৃষ্ণের।

দক্ষিণেশ্বরের বাণী এসে ক্রমশঃ লোকের মুখে মুখে পৌঁছাতে লাগল নিকটবর্তী কলকাতা মহানগরীতে। আহ্বান কানে শুনলেন তাঁর অনেকেই—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ—সেখানে যাতায়াত শুরু করে দিল সকলে।

দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর।

কোন শিক্ষার পটভূমি নেই, কোন বিদ্যালয় বা কলেজে পাঠগ্রহণ নেই—অথচ কি আশ্চর্য—জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যা তাঁর করায়ত্ত।

আনন্দচন্দ্র যুবক। আনন্দচন্দ্র সেই যুগের—সেই সময়ের হয়ে—তাঁদেরই পাশে পাশে তখন। বিপ্লবের সেও হয়েছিল একজন অংশীদার। গাঁয়ের সেই কিশোরটি তখন পূর্ণ যুবাপুরুষ। যুবক আনন্দচন্দ্র ঐ বিপ্লবের সরিক হলেও, মধ্যে মধ্যে

যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়তো, সংস্কারের বন্ধনগুলোর মধ্যে থেকে যখন একা ছুটি খুলে যাচ্ছে—আনন্দচন্দ্র সেন আরো সচেতন হয়ে উঠছে।

অনেকদিন পরে আনন্দচন্দ্রকে যেতে হয়েছিল একদিন দর্মাহাটায় কার্যোপলক্ষে

সেই মল্লিকবাড়ি তখনো তেমনি আছে। মল্লিকবাড়িতে প্রবেশের সেই বিরাট দু'পাল্লাওয়ালা সেগুন কাঠের দরজা এবং দরজা পার হয়েই বহির্মহল অন্দরের প্রবেশমুখে বিরাট নাটমন্দির—রাধামোহনের মন্দির।

কিন্তু রাধারমণ মল্লিক মশাই এই কয় বৎসরেই যেন কেমন অকালে বুড়িয়ে গিয়েছেন এবং বাতব্যাধিতে কিছুটা চলচ্ছক্তিহীন—পঙ্গু।

ভবতারিণী দেবী কাশীবাসিনী হয়েছেন। গৃহের কর্ত্রী এখন অন্নপূর্ণা। একমাত্র কন্যা সুহাসিনী তো কবেই মারা গিয়েছে সর্পদংশনে।

আনন্দচন্দ্র সোজা অন্দরমহলেই গিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু অত বড় বাড়িটা যেন কেমন সাড়াশব্দহীন নিষ্প্রাণ।

অন্দরে মল্লিক মশাইয়ের শয়নকক্ষের সামনের বারান্দায় অন্নপূর্ণা একটা মাদুর বিছিয়ে রামায়ণ পাঠ করছিল।

কাকীমা!

কে? অন্নপূর্ণা চোখ তুলে তাকালেন।

কাকীমা, আমি আনন্দ।

আনন্দ! এসো বাবা।

আনন্দ অন্নপূর্ণার পদধূলি নিল।

বেঁচে থাকো বাবা। তুমি কি এখান থেকে চলে গিয়েছো?

না কাকীমা, আমি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ছি—সামনের বছর পাশ দিয়ে বেরুবো।

সেই যে চলে গেলে, আর এলে না!

আপনাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের পর আমি আর আসতে পারলাম না কাকীমা।

তা এখন কোথায় আছো?

কলুটোলায় আমার এক জ্ঞাতি খুড়োর গৃহে। কাকামশাই কেমন আছেন?

সে মানুষটা কি আর বেঁচে আছে বাবা, খুকীর অকালমৃত্যুর পর শোকে যেন একটু একটু করে কেমন হয়ে গেলেন—যাও না, ঐ তো শয়নঘরেই আছেন।

ব্যবসা কি কাকামশাই বন্ধ করে দিয়েছেন?

সুধাকান্তকে তোমার মনে আছে ?

আছে বৈকি।

তোমার কাকামশাইয়ের অসুস্থতার সুযোগে সে একটু একটু করে সব গ্রাস করেছে।

কি বলছেন ?

আর কি বলছি! মানুষ যে এমন অকৃতজ্ঞ বিবেকশূন্য হতে পারে—তোমার কাকামশাইয়ের কিছু পৃথক সঞ্চিত অর্থ ছিল, গত দুই বৎসর ধরে তাই ভাঙিয়ে চলেছে। কিন্তু তাও বোধ হয় আর চলবে না, কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আজ প্রায় তলানীতে এসে ঠেকেছে।

কার সঙ্গে কথা বলছো বড় বৌ ? কে ? ঘরের মধ্যে থেকে রাধারমণ মল্লিকের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

অন্নপূর্ণা বললে, আনন্দ এসেছে।

আনন্দ !

যাও আনন্দ, ঘরের মধ্যে যাও। তোমার কাকামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এসো।

আনন্দ গিয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল যেন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে।

বিরাট একটা পালঙ্কের উপরে রাধারমণ মল্লিক বসে ছিলেন বিরাট একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। ঘরের কোণে প্রদীপদানে প্রদীপ জ্বলছে ঐ দিনমানেও। তারই স্বল্প আলোয় ঘরটি মৃদু আলোকিত, কেমন যেন করুণ বিষণ্ণ।

সেই আলোয় আনন্দ দেখলো রাধারমণ মল্লিককে।

এই কি সেই দশাসই পুরুষসিংহ রাধারমণ মল্লিকমশাই, যাঁকে সে কয়েক বৎসর পূর্বেও দেখেছে! মাথার বাবরী চুল সব শ্বেতশুভ্র। দেহ কৃশ। রুগ্ন। চোখের দৃষ্টি মনে হল ক্ষীণ।

আনন্দ প্রণাম করলো।

থাক, থাক। সেই যে তুমি প্রায় বৎসর তিনেক আগে চলে গেলে. আর এলে না ?

আনন্দ কি আর বলবে, চুপ করে থাকে।

দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতায় কোথায় দালানের কোন কার্নিসের আড়াল থেকে একটা কবুতর গুঞ্জন করে চলেছে। স্তব্ধ নির্জন ঐ বিরাট দালানে যেন কেমন করুণ মনে হয়।

তুমি কি শহরেই আছো ? মল্লিকমশাই শুধালেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা কোথায় আছো?

কলুটোলায় এক জ্ঞাতি খুড়োমশাইয়ের গৃহে।

কে বল তো?

আজ্ঞে নিবারণচন্দ্র সেন।

ও, তা ডাক্তারী পড়ার কি হলো?

মেডিকেল কলেজে পড়ছি, সামনের বৎসর পাস দিয়ে বেরুব।

বেশ, বেশ। তা তোমার পিতাঠাকুর কেমন আছেন?

পিতাঠাকুরের শরীরটা ভাল না।...কাকাবাবু?

কিছু বলছো?

সুহাসিনীর আর কোন সংবাদ পান নি?

না।

কিন্তু সুহাস তো জানতাম সাঁতার জানতো।

তার কথা থাক আনন্দ। সে যদি জীবিতাও থাকত—সে আজ আমার কাছে মৃত। সব—সব আমারই পাপ আনন্দ, আমারই পাপে সব গিয়েছে।

কথাগুলো যেন একটা হাহাকারের মত শোনাল।

একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস যেন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

জান আনন্দ, কদিন থেকে তোমারই কথা ভাবছিলাম।

আমার কথা—তা একটা সংবাদ কাউকে দিয়ে পাঠালেন না কেন আমাকে?

কাকে দিয়ে পাঠাবো—সবাই তো আমাকে ছেড়ে গিয়েছে, হারামজাদা সুধাকান্ত—উঃ, দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলাম।

তা আমাকে কি আপনার কিছু প্রয়োজন ছিল?

প্রয়োজন—হ্যাঁ, প্রয়োজন বলেই তো—

কি করতে পারি বলুন?

তুমি আমার পুত্রাধিক, তোমার কাছে আমার কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই। হারামজাদা সুধাকান্ত ক্রমশঃ একটু একটু করে আমার সব কিছুই গ্রাস করেছে। কিন্তু তাতে করেও আমি দমতাম না—কিন্তু বাত-ব্যাধিতে আমাকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে। চলচ্ছক্তিহীন। আমারও দিন তো ফুরিয়েই এলো, আর কটা দিনই বা—কেবল চিন্তা তোমার খুড়ীমার জন্য।

আপনার আর কোন আত্মীয়-পরিজনই কি নেই?

না, আর থাকলেও তাদের ডাকতাম না আমি। তুমি একটা কাজ করতে পারবে আনন্দ ?

কি করতে হবে বলুন ?

সামান্য কিছু গোপন সঞ্চয় এখনো আমার আছে—কিছু হীরা-জহরৎ ও স্বর্ণালংকার আর সামান্য কিছু বাদশাহী মোহর, ঐগুলো সঙ্গে করে তোমার খুড়ীমাকে কালিয়ায় তাঁর পিতৃগৃহে তুমি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে ?

কেন পারবো না !

যদি পারো তো আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

খুড়ীমা চলে গেলে আপনাকে দেখবে কে ?

আমার জন্যে ভেবো না। তুমি যদি ঐ কাজটুকু করে দিতে পারো আনন্দ—

খুড়ীমা কি যেতে সম্মত হবেন এভাবে আপনাকে একা এখানে ফেলে রেখে যেতে ?

সে যে-ভাবে হোক আমি তাকে সম্মত করাবোই।

আজ্ঞে আমি শুনেছিলাম খুড়ীমার এক ভাই এই শহরেই থাকেন, শিবচন্দ্র রায় না কি যেন নাম তাঁর !

হ্যাঁ, শিবচন্দ্র এই শহরেই থাকে।

তা তিনিও কি মধ্যে মধ্যে এসে আপনাদের খোঁজখবর নেন না ? এইভাবে আপনি ও খুড়ীমা একা একা পড়ে আছেন ?

আসবে না কেন, সে আসে বৈকি। খোঁজখবর করতে আসে কবে আমি গঙ্গাযাত্রা করবো। তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে রাধারমণ মল্লিক বললেন, অথচ আমিই একদিন অর্থসাহায্য করে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলাম। সে ওৎ পেতে বসে আছে, কবে আমি চোখ বুঝবো—এখানে এসে সে জাঁকিয়ে বসবে।

আনন্দ শুনে তো হতবাক ! মৃদুকণ্ঠে বললে, উনি খুড়ীমার কি রকম ভাই ?

তোমার খুড়ীমার বৈমাত্রেয় ভাই—যাক গে, কুলাঙ্গারের কথা যেতে দাও। তুমি আমার সামান্য যা এখনো সঞ্চিত আছে, সেগুলো ও তোমার খুড়ীমাকে তাঁর পিত্রালয়ে একটু পৌঁছে দিতে পার বাবা ? জানি তোমার খুড়ীমা যেতে চাইবেন না, কিন্তু তুমি তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেখানে রেখে আসার ব্যবস্থা করো।

বেশ, বলছেন যখন চেষ্টা করবো।

অনেকক্ষণ কথা বলে রাধারমণের হাঁপ ধরে। তিনি ক্লান্ত হয়ে যেন হাঁপাতে থাকেন। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন, ঐ যে ঈশান কোণে একটা জলচৌকি পাতা আছে—

রাধারমণের ইঙ্গিতে আনন্দ ঈশান কোণে তাকালেন। .দেখল একটা জল-চৌকির উপরে একটা বিরাট পিতলের ঘড়া বসানো।

ঐ জলচৌকিটা সরালেই তুমি মেঝেতে একটা চৌকো তক্তা পাতা আছে দেখতে পাবে। ঐ তক্তার নীচে একটা সুড়ঙ্গপথ আছে—এই বাড়ির নীচের তলায় যে দুটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ আছে—তারই একটি ঐ কক্ষ। ঐ কক্ষের মধ্যে পূব পশ্চিম কোণে বিরাট এক মাটির জালা আছে, সেই জালাটা সরালেই একটি এই কক্ষের মত অনুরূপ চৌকো তক্তা আছে দেখতে পাবে, সেই তক্তার নীচে একটা রূপার কলসের মধ্যে সেই ধনরত্ন আছে। যাও ঐগুলো তুমি বের করে নিয়ে এসো। আমিই আনতাম, কিন্তু চলচ্ছক্তিহীন আমি—আমার অসাধ্য।

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। তারপর রাধারমণ মল্লিকের নির্দেশমত কক্ষের ঈশান কোণে অবস্থিত জলচৌকি ও কলসটা সরিয়ে তক্তাটা দেখতে পেল।

পেয়েছ তক্তাটা ?

আজ্ঞে।

ওটা তোল।

আনন্দ রাধারমণের নির্দেশ পালন করতেই একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ তার দৃষ্টিগোচর হলো। সুড়ঙ্গর মুখে কালো অন্ধকার যেন মুখব্যাদান করে আছে।

ঐ ঘরের কুলুঙ্গিতে দেখো একটা প্রদীপ আছে। প্রদীপটা জ্বেলে নাও, নচেৎ অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবে না।

রাধারমণের নির্দেশমত আনন্দ কুলুঙ্গিতে অবস্থিত প্রদীপটি প্রজ্জলিত করলো।

যাও এবার সাবধানে সুড়ঙ্গপথে নেমে যাও। পাঁচ-সাতটি ধাপ আছে সাবধানে নেমো।

সুড়ঙ্গর মুখ খুব ছোট নয়। বেশ প্রশস্ত। আনন্দর নীচে নামতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রদীপ হাতে সন্তর্পণে অবতরণ করে নীচে।

বদ্ধ হাওয়ার একটা শ্বাসরোধকারী গন্ধ।

মাথার মধ্যে আনন্দর যেন কেমন ঝিমঝিম করে।

প্রথমটায় কোন কিছুই তার নজরে পড়ে না প্রদীপের স্বল্পালোকে। এক একটু করে অল্প আলো-আঁধারি তার দৃষ্টিতে সহে যায়।

কিন্তু কোথায় মাটির জালা কক্ষমধ্যে ?

ভগ্ন জালার কিছু ভগ্নাংশ মাটিতে পড়ে আছে।

আনন্দ আরো সম্মুখে অগ্রসর হয় প্রদীপ হাতে, এবং তক্তা নয়—একটা গহ্বর তার দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেই সঙ্গে একটা কলস।

কলসটা নীচু হয়ে উপরে তুলে আনে আনন্দ। হালকা কলস, মনে হয় তার কলসের মধ্যে কিছু নেই, শূন্য! উবুড় করলো আনন্দ—সত্যিই কলস শূন্য। কিছুই তার মধ্যে নেই।

কিছুক্ষণ শূন্য কলসটা হাতে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো আনন্দ। তারপর শূন্য কলসটা হাতে ঝুলিয়ে যে পথে ঐ ভূগর্ভস্থ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছিল সেই পথেই পুনরায় কক্ষমধ্যে উঠে এলো।

পেয়েছো—এনেছো? ব্যগ্রকণ্ঠে লন রাধারমণ মল্লিক।

আনন্দ কি বলবে বুঝতে পারে না।

নিয়ে এসো কলসটা আমার সামনে। রাধারমণ ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন।

কিন্তু খুড়োমশাই—

আনো—আনো এখানে!

কিন্তু খুড়োমশাই, এই কলসের মধ্যে তো কিছু নেই।

নেই?

না, এ তো দেখছি শূন্য।

শূন্য—কলস শূন্য! একটা যেন তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন রাধারমণ মল্লিক। তাঁর সেই আর্তনাদ শুনে কক্ষের মধ্যে ছুটে এলেন স্ত্রী অন্নপূর্ণা।

কি—কি হলো?

রাধারমণ মল্লিকের তখন কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছে।

থর থর করে তাঁর সারা দেহ কাঁপছে।

মনে হয় গৌরবর্ণের সমস্ত মুখে কে বুঝি এক বাটি সিন্দুর ঢেলে দিয়েছে।

শঙ্কিতা অন্নপূর্ণা স্বামীর ঐ অবস্থা দেখে ভীতা হয়ে স্বামীকে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, কি, কি হলো?

রাধারমণের সর্বশরীর তখন ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

তাঁর চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায় প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তাঁর, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করতে পারছেন না।

কি হলো আনন্দ, তোমার খুড়োমশাইয়ের কি হলো?

ধরুন আগে ওঁকে শুইয়ে দিই—বলতে বলতে আনন্দ রাধারমণকে শয্যার উপরে শুইয়ে দিল। বলল, আপনি খুড়োমশাইকে হাওয়া করুন খুড়ীমা, আমি কবিরত্ন মশাইকে ডেকে আনি—ছুটেই একপ্রকার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিন্তু কিছুই করা গেল না।

আনন্দ প্রথম ওদের গৃহচিকিৎসক কবিরত্ন মশাইকে ডেকে আনল, তারপর মেডিকেল কলেজে গিয়ে সাহেব ডাক্তারকে ডেকে আনল।

উডবার্ণ সাহেব রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, সেরিব্রাল হিমারেজ—কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—নিম্নাঙ্গ পড়ে গিয়েছে—প্যারালিসিস পক্ষাঘাত।

কিছুই আর করবার নেই।

ভোররাত্রের দিকে রাধারমণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শোকে মুহ্যমান অন্নপূর্ণা মৃত স্বামীর পাশে পাথরের মত বসে রইলেন। চোখের কোলে এক ফোঁটা অশ্রুও নেই তাঁর।

মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। আনন্দচন্দ্র ভেবে পায় না সে একা একা কি করবে। কোথায় কে এঁদের আত্মীয়-স্বজন এই শহরে আছে আনন্দর কিছুই জানা নেই। খুড়ীমা একটি কথাও বলছেন না। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছেন না।

দিশেহারা আনন্দ বাইরের দালানে বসে থাকে।

ক্রমশ বেলা বাড়ছে।

ঠিক ঐ সময়—আঙ্গিনায় মৃদু পদশব্দ শুনে চোখ তুলে তাকাল আনন্দ।

অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আনন্দ আগন্তুকের দিকে।

গৈরিক বেশধারী এক সন্ন্যাসিনী। পূর্ণ যুবতী এক সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনীর যেন রূপের অন্ত নেই। মাথায় বিপুল কেশভার রুক্ষ, পৃষ্ঠদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

পরনে গেরুয়াবর্ণের একটি থান।

নিরাভরণ দুখানি হাত।

আনন্দদাদা, না! সন্ন্যাসিনী বলল।

কে?

আমায় চিনতে পারছো না আনন্দদাদা?

আনন্দচন্দ্রের দৃষ্টির বিহ্বলতা তখনো বুঝি কাটে নি।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য। তারপরই দৃষ্টির সেই বিহ্বলতা দূর হয়। আনন্দচন্দ্রের চিনতে কষ্ট হয় না সন্ন্যাসিনীকে।

সুহাস—সুহাসিনী।

সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসলো।

তুমি—তুমি তাহলে বেঁচে আছো?

সুহাসিনীর মৃত্যু হয়েছে আনন্দদাদা—আমি সন্ন্যাসিনী।

তা এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

সন্ন্যাসিনীর কোন স্থায়ী বাসস্থান তো নেই আনন্দদাদা। কিন্তু এ-বাড়ি এত স্তব্ধ কেন? কোন জনমনিষ্যি দেখছি না—কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

কেউ তো নেই—

নেই!

না। একমাত্র ছিলেন তোমার পিতাঠাকুর ও মাতাঠাকুরানী, আর বুড়ী ঝি মোক্ষদা।

বাবা কেমন আছেন? হরিদ্বারের আশ্রমে গুরুদেব বললেন, এখানে একবার এসে ঘুরে যেতে, তাই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ছুটে আসছি।

কাকামশাই নেই, সুহাস।

নেই!

না। কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর তারপরই খুড়ীমা সেই যে পাথর হয়ে গেলেন—

সন্ন্যাসিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, কোথায়?

ঐ সামনের ঘরে।

সন্ন্যাসিনী ধীর পায়ে কক্ষের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। আনন্দচন্দ্র তাকে অনুসরণ করে।

সন্ন্যাসিনী সুহাসিনী এসে শয্যার পাশটিতে দাঁড়াল ধীর শান্ত পদে।

সেই একই দৃশ্য—রাধারমণের মৃতদেহের শিয়রে বসে অন্নপূর্ণা। তার মাথাটা ঈষৎ বুকের উপর ঝুঁকে রয়েছে।

ক্ষণকাল সেই দিকে তাকিয়ে থেকে সন্ন্যাসিনী দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

আনন্দচন্দ্র ডাকে, খুড়ীমা দেখুন কে এসেছে! খুড়ীমা—

কোন সাড়া এলো না অন্নপূর্ণার দিক থেকে।

আনন্দচন্দ্র আবার ডাকে, খুড়ীমা!

সন্ন্যাসিনী ঐ সময় শান্ত গলায় বললে, উনি আর সাড়া দেবেন না আনন্দদাদা—

কি বলছো?

ঠিকই বলছি, ওঁর দেহে প্রাণ নেই, বুঝতে পারছো না? ভাল করে তাকিয়ে দেখো—উনি নেই।

আনন্দর বিস্ময় ঘোচে না।

সতী নারী স্বামীর সহগামিনী হয়েছেন। সন্ন্যাসিনী আবার বললে।

আনন্দচন্দ্র নীরব।

আচ্ছা আমি চলি, আনন্দদাদা।

যাবে ?

হ্যাঁ। মনের মধ্যে একটা বাসনা ছিল—সংসারাশ্রমের মা-বাবাকে আর একটি-বার দেখবো—গুরুদেব বোধ হয় আমার মনের সেই বাসনা জানতে পেরেছিলেন, তাই হঠাৎ একদিন আমাকে তিনি ডেকে পাঠালেন।

বললাম, আমায় ডেকেছেন গুরুদেব ?

হ্যাঁ মা, তুমি একবারটি কলকাতায় ঘুরে এসো—

কলকাতায়! কেন গুরুদেব ?

যাও না মা—ঘুরেই এসো একটিবার।

কিন্তু হঠাৎ কেন কলকাতায় যাবার নির্দেশ দিচ্ছেন গুরুদেব ?

সেখানে গেলেই তোমার এই প্রশ্নের জবাব পাবে মা। যাও আর বিলম্ব করো না, কালই যাত্রা করো।

এই দীর্ঘ পথ—

যার নির্দেশে তোমায় যেতে বলছি, তিনিই তোমার সহায় হবেন মা। কোন চিন্তা করো না।

কথাগুলো বলে সন্ন্যাসিনী নীরব হলো।

১৮

আনন্দচন্দ্র সন্ন্যাসিনী সুহাসিনীর কথাগুলো শুনছিল আর কেমন যেন এক বিস্ময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল ওর মুখের দিকে।

এই কি সেই সুহাসিনী ?

রাধারমণ মল্লিকের একমাত্র কন্যা সুহাসিনী। যে বলতে গেলে কৈশোরেই বিধবা হয়েছিল। যার কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্যে কোন দিন আনন্দ কোন পরিণত বুদ্ধির পরিচয় পায় নি। নিতান্ত সহজ সরল, বলতে গেলে খানিকটা বরং নির্বোধই বরাবর যাকে আনন্দর মনে হয়েছে—এই কি সেই কিশোরী মেয়েটি ?

সমস্ত মুখখানি জুড়ে অপূর্ব একটি স্নিগ্ধতা। কিছুটা মনে হয় যেন আত্মসমাহিতও। মধ্যখানে তো মাত্র কয়েকটি বৎসর—তারই মধ্যে এই পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হলো ? অবিশ্যি সেই কিশোরী আজ পূর্ণ যুবতী।

সন্ন্যাসিনী আবার কথা বললে, আমি তাহলে এবারে যাই আনন্দদাদা!

যাবে?

হ্যাঁ, আমাকে তো আবার সেই হরিদ্বারেই ফিরে যেতে হবে।

তোমার মা-বাবার শেষ কাজটুকু তো করতে হবে। সেটুকুও কি তুমি করবে? তুমিই তো তাঁদের একমাত্র সন্তান।

না আনন্দদাদা, আমি সন্ন্যাসিনী—আমার দ্বারা তো কিছুই হবে না। সে তুমি করবার করো।

আমি?

হ্যাঁ, তুমি। দৈবক্রমে তুমি যখন এসেই পড়েছো এ সময়ে।

কিন্তু আমি—

বহিঃপ্রাঙ্গণে ঐ সময় কার যেন পদশব্দ শোনা গেল।

দেখ তো বাইরে বের হয়ে, বোধ হয় ভোলাদাদা আসছে—সন্ন্যাসিনী বললে।

ভোলানাথ? প্রশ্নটা করে আনন্দচন্দ্র সন্ন্যাসিনার মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, পথে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মনে হয় সে আমাকে চিনতে পেরেছে, তাই সে হয়ত অনুসরণ করে এসেছে আমাকে এই গৃহে।

সন্ন্যাসিনী মিথ্যা বলে নি—সত্যিই ভোলানাথ। ভোলানাথ এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

এসো ভোলাদা,—সন্ন্যাসিনীই আহ্বান জানাল।

সত্যিই তুমি তাহলে সুহাস? চিনতে আমার তাহলে দেখছি ভুল হয় নি!

না ভোলাদা, চিনতে তোমার ভুল হয় নি। যাক্, ভাবি নি তোমার সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হবে। সব গুরুর ইচ্ছা।

ভোলানাথ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সন্ন্যাসিনী সুহাসিনীকে।

আজ পূর্ণযৌবনা সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে ভোলানাথ যেন তার দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। গৈরিক বসনে সুহাসিনীকে যেন অপরূপা দেখাচ্ছিল।

অমন করে চেয়ে চেয়ে আমার দিকে কি দেখছো ভোলাদা?

দেখছি তোমায়—

আমায় দেখছো?

হ্যাঁ।

আমি তো আজ এক সন্ন্যাসিনী, আমাকে দেখবার আর কি আছে?

এতকাল পরে তুমি কোথা থেকে এলে?

আশ্রম থেকে। আমার কথা থাক, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবে ?

অনুরোধ ?

হ্যাঁ।

বলো কি অনুরোধ !

ঐ দেখো মা ও বাবা, দু'জনেই—

এতক্ষণ তাকায় নি সে শয্যার দিকে। সন্ন্যাসিনী সুহাসিনীর কথায় পালঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করলো ভোলানাথ।

একটু আগে ওঁদের দু'জনারই দেহান্ত হয়েছে—

সে কি ?

হ্যাঁ। আগে বাবা, পরে মা শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছেন। ওঁদের সৎকারের ব্যবস্থায় যদি আনন্দদাদাকে তুমি সাহায্য করো—

তুমি ওজন্যে কিছু ভেবো না সুহাস। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব নিশ্চয়ই করবো।

আমি তা হলে কাল যেতে পারি—সুহাসিনী বললে।

তুমি কাল যাবে ?

হ্যাঁ, এবারে আমি যাবো। চলি আনন্দদাদা।

আনন্দচন্দ্র নিঃশব্দে একটিবার কেবল সন্ন্যাসিনী সুহাসিনীর মুখের দিকে তাকাল।

সন্ন্যাসিনী কিন্তু আর দাঁড়াল না। কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। একটিবারও আর পশ্চাতে তাকাল না। ভোলানাথ কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

অন্ধকারে নির্জন পথটা ধরে সুহাসিনী হনহন করে হেঁটে চলেছিল গঙ্গার ঘাটের দিকে। ভোলানাথও তাকে অনুসরণ করে।

সন্ন্যাসিনী সোজা হেঁটে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। ভোলানাথ একেবারে সামনাসামনি এসে পড়েছে তখন।

এ কি ভোলাদা, তুমি আমার পিছনে আসছো কেন ?

সুহাস !

ও নামে তুমি আর আমাকে ডেকো না ভোলাদা—

ডাকবো না ?

না !

কেন ?

সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নামটাও আমি বর্জন করেছি।

সুহাস নামটা তুমি বর্জন করেছো ?

হ্যাঁ। জীর্ণ বস্ত্রের মতো যা আমার কিছু পূর্ব-পরিচয় ছিল সব কিছুই আমি বর্জন করেছি।

তুমি আজ সন্ন্যাসিনী ?

হ্যাঁ।

কে তোমাকে এই বয়েসে সন্ন্যাস দিলেন ?

সেই নদীতীরে, সেই সন্ন্যাসীকে নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে ? যিনি সর্প-দংশনে মৃত আমার দেহে একদিন নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, তিনিই—তিনিই আমার গুরুদেব।

সুহাস !

আবার তুমি ঐ নামে আমায় ডাকছো ? আমি আজ সন্ন্যাসিনী—ও নাম শ্রবণেও আমার পাপ। যাও, আমার সঙ্গে আর এসো না। সৎকারের ব্যবস্থা করো গিয়ে—আনন্দদাদাকে তুমি সাহায্য করবে বলেছো, যাও।

সন্ন্যাসিনী আবার ফিরে চলতে শুরু করল।

ভোলানাথ যে ভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো।

সম্মুখে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে, ঊর্ধ্বে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। সন্ন্যাসিনী চলে গিয়েছে।

ভোলানাথের হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল।

বহুক্ষণ সে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে আনন্দচন্দ্র অনেকক্ষণ সেই ঘরের মধ্যে দু'টি মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভোলানাথের অপেক্ষায় বুঝতে পারল, ভোলানাথ আর আসবে না। যা করবার তাকেই করতে হবে।

আনন্দচন্দ্র ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মল্লিকবাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। সোজা হাঁটতে হাঁটতে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে তার এক সহপাঠী থাকত—তার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।

রাত্রি তখন অনেক হয়েছে।

সোমশেখর তার সহপাঠী সব শুনে বললে, ঠিক আছে। তুই একটু অপেক্ষা কর, আমি কিছু টাকা নিয়ে আসছি। যোগেন্দ্র আর শিবনাথকেও ডেকে নিয়ে যাবো।

সব কিছু অতঃপর যোগাড় করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে এলো।

মৃতদেহ বহন করে যখন সকলে গঙ্গাতীরে শ্মশানে এসে পৌছাল, আকাশে অত্যাসন্ন প্রত্যুষের চাপা ইশারা।

চিতায় স্থাপনা করে আনন্দচন্দ্রই ওদের মুখাগ্নি করলে।

হঠাৎ ঐ সময় দেখা গেল ভোলানাথ কোন একজনকে গলায় কাপড় দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

কি ব্যাপার ভোলানাথ ?—আনন্দচন্দ্র শুধায়।

চিনতে পারছো না আনন্দ এই মানুষটাকে ?

এ কি, সুধাকান্ত ?

হ্যাঁ, সুধাকান্ত। কর্তাবাবুর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সব কিছু গ্রাস করে আজ সুধাকান্ত বাবু হয়েছে। ওর বাড়িতে ঢুকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে টেনে এনেছি।

ছি, ছি! ছেড়ে দাও, ওকে যেতে দাও—আনন্দ বললে।

ছেড়ে দেবো ? না, ওকেও ঐ চিতায় পুড়িয়ে মারবো আজ।

সুধাকান্ত কেঁদে উঠলো। তোমার দুটো পায়ে পড়ি, ভোলানাথ। আমায় ছেড়ে দাও। তোমাকে অনেক টাকা দেবো।

আঃ, ছেড়ে দাও ভোলানাথ। ওকে যেতে দাও। আনন্দচন্দ্রই এবার এগিয়ে এসে ভোলানাথের হাত থেকে ছাড়িয়ে দিল সুধাকান্তকে এবং বললে, যান সুধাকান্তবাবু।

সুধাকান্ত আর দাঁড়াল না। এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যোগেন্দ্র শিবনাথ ইত্যাদি হেসে উঠলো।

দাহকার্য শেষ করে আনন্দচন্দ্র যখন গৃহে ফিরে এলো, বেলা তখন অনেক হয়েছে। ভিজা জামাকাপড় ছেড়ে কলেজে যাবার কাপড় ও কামিজ পরে নিল আনন্দচন্দ্র।

সকাল ন'টাতেই ক্লাস আছে—ড্রামণ্ড সাহেবের মেডিসিনের ক্লাস।

আহারের আর সময় ছিল না। এখন আহার করতে গেলে ঠিক সময়ে ক্লাসে পৌছানো যাবে না। এইটাই আনন্দচন্দ্রের শেষ বছর। আর মাস দুই বাদেই ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা।

আনন্দচন্দ্র বই-খাতা নিয়ে বেরুতে যাবে, একটা ল্যাণ্ডো গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

এ সময়ে আবার কে এলো ?

দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই আনন্দ দেখলো, মধুসূদন ল্যাণ্ডো থেকে নামছে।

মধু! কি ব্যাপার ? এ সময়ে—

তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

কি কথা ?

তুমি বেরুচ্ছিলে নাকি ?

হ্যাঁ, কলেজে যাচ্ছি। ক্লাস আছে।

চল। আমার গাড়িতে তোমাকে আমি পৌঁছে দেবো কলেজে।

ঠিক আছে, চল।

গাড়িতে দু'জনে উঠে বসল মুখোমুখি। কোচোয়ান গাড়ি ছেড়ে দেয়।

বল মধু, কি কথা ?

জানো কাদম্বিনী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে ?

চলে গিয়েছেন ? কোথায় ?

তা জানি না। তার দাদাও বলতে পারল না।

তার দাদাও জানেন না কাদম্বিনী কোথায় গিয়েছেন ?

না।

তা তুমি কাদম্বিনীর ওখানে গিয়েছিলে কেন ?

কয়েকদিন আগে সে এক দ্বিপ্রহরে আমার গৃহে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিল—

তাই নাকি !

হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কাদম্বিনী আলাপ করে আসে—

কি বলেছেন কাদম্বিনী তোমার স্ত্রীকে ?

জানি না।

তোমার স্ত্রীকে শুধালেই পারতে।

শুধিয়েছি। সে কোন কথাই বললে না। কেবল একটি কথা সে বললে—

কি ?

বললে, আমি যদি কাদম্বিনীকে বিবাহ করি তো তার কোন আপত্তি নেই। সে নাকি খুশীই হবে। কিন্তু সেদিন তার কথাটা আমি বিশ্বাস করি নি। পরে নানাভাবে প্রশ্ন করে জেনেছি, সে অন্তর থেকেই আমাকে বিবাহের কথাটা বলেছে।

তাই কাদম্বিনীর ওখানে কাল সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম দিন দুই আগে সে কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ জানে না।

তার আমি কি করবো?

কাদম্বিনীকে খুঁজে আমায় বের করতেই হবে, যেখান থেকে পারি তাকে খুঁজে বের করবোই—তোমার সাহায্য চাই আমি। কারণ—

কি কারণ?

এ সংসারে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু—সত্যিকারের বন্ধু—

আমার একটা কথা শুনবে মধু?

কি কথা, বল?

কাদম্বিনীর সন্ধান আর কোরো না।

কি বলছো?

ঠিকই বলছি। কাদম্বিনী স্বেচ্ছায় তোমার জীবনের পথ থেকে সরে গিয়েছেন—তাঁকে যেতে দাও।

না না, তা হয় না। তুমি তো জান, কাদম্বিনীকে আমি কি গভীর ভালবাসি—

ঠিক আছে; কিন্তু যাকে তুমি অগ্নি নারায়ণশিলা সাক্ষী করে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করে বিবাহ করেছো, তার প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই? কেন বুঝতে পারছো না মধু, তোমার স্ত্রী যা বলেছে সম্পূর্ণ অভিমানের বশেই বলেছে।

অভিমানের বশে?

হ্যাঁ। ওটা তাঁর সত্যিকারের মনের কথা নয়—হতে পারে না। ব্যাপারটা নিছক অভিমানের। স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর সংসার এ দেশের হিন্দু নারীর সাক্ষাৎ স্বর্গ। তাদের ঐ স্বামীর সুখেই সুখ।

কিন্তু—

তুমি অন্ধ মধু, নচেৎ আজো তুমি চিনতে পারলে না তোমার স্ত্রীকে! তুমি মনে কিছু করো না মধু, একটা কথা আজ তোমায় বলি—তোমার স্ত্রীকে অবহেলা করো না।

মধুসূদন চুপ করে থাকে। আনন্দচন্দ্রের কথার কোন জবাব দেয় না।

গাড়ি তখন মেডিকেল কলেজের গেট দিয়ে ঢুকছে।

গাড়ি থামতেই আনন্দচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে গেল। বললে, তুমি নামবে না মধু? তারপর বললে, প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক হয়ো না, তাতে কেবল মনোকষ্টই বাড়ায়!

মধু কোন জবাব দিল না।

ক্লাস নেই তোমার? আনন্দ শুধায়।

আছে। কিন্তু আজ কলেজে যাব না।

আনন্দ আর কিছু বললে না। ক্লাসরুমের দিকে হেঁটে চলল।

গাড়ি আবার তখন চলতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মধুর তার জীবনের আদর্শ মাইকেল মধুসূদনের কথা মনে পড়ে যায়।

আনন্দচন্দ্র একদিন মাইকেলের প্রসঙ্গে কথায় কথায় বলেছিল, যাঁকে মি জীবনের আদর্শ ও গুরু বলে সম্মান করো মধু—সেই মাইকেলের জীবনের কে একবার তাকিয়ে দেখো। প্রবৃত্তির তাড়নায় কি ভাবে ঐ মানুষটা ছুটাছুটি রছেন!

অল্প বয়সে খ্রীষ্টান হলেন। সমাজ, আত্মীয়স্বজন, সব ছাড়লেন। তিনি কজন ইংরাজ হবেন, ইংরাজীতে কথা বলবেন, ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখবেন, রাজীতে কবিতা লিখে হোমার গেটের মত হবেন। পালিয়ে গেলেন মাদ্রাজ -বিয়ে করলেন সেখানে এক ইংরাজ মহিলাকে। কিন্তু বেশীদিন সে স্ত্রীকে নিয়ে করতে পারলেন না। তাকে পরিত্যাগ করে আবার এক বিদেশী মহিলার ণিগ্রহণ করলেন। ইংরাজীতে কাব্য রচনা করলেন 'ক্যাপটিভ লেডি'। কিন্তু হলো, আবার চলে এলেন এইখানেই। বেথুন তখন বলেছিলেন—বিদেশীর ক্ষ ইংরাজীতে কবিতা লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব নয় মাইকেল, কেবল শ্রম মাত্র।

বোধ হয় তাই পুনরায় আবার বাংলা ভাষার চর্চায় মন দিলেন।

মধু ভাবতে থাকে, এ দেশে ফেরার পর মাইকেলের সে কি দুরবস্থা! পিতামাতা ন আর ইহজগতে নাই, আত্মীয়স্বজনরাও তাঁকে বিধর্মী বলে ত্যাগ করেছে। রা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ইতিমধ্যে গ্রাস করেছে। কলকাতা শহরেরও ইতি- ্য প্রচুর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বাল্যবন্ধুদের মধ্যে এক গৌরদাস বসাক য়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তিনিই যোগাড় করে দিলেন কলকাতা স আদালতে ইণ্টারপ্রিটারের কাজটা। ঐ গৌরদাসই পাইকপাড়ার রাজাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। মাইকেল 'রত্নাবলী' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন তার অভিনয় হয়। এ দেশে ক্রমে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে লাগল।

বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে সে নাটক অভিনীত হলো। একে একে লিখলেন াবতী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

এলো নব অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মাইকেল রচনা করলেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। বাংলাদেশের পাঠক চমকে উঠলো নূতন ছন্দ, ঐ নূতন ভাব ও নূতন ওজস্বিতা দেখে।

রচিত হলো 'মেঘনাদবধ কাব্য'!

ঘরে ঘরে মাইকেলের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু প্রবৃত্তির দাস মাইকেলের দুঃখ তো কই ঘুচল না!

এবার মাথায় নতুন এক চিন্তা—তাঁকে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসতে হবে। কিছুদিন আগে বিলেত চলে গেছেন। এখন শোনা যাচ্ছে, বিদেশে তাঁর দুঃখের নাকি সীমা নেই।

হঠাৎ খেয়াল হলো, বাড়ির গেট দিয়ে ল্যাণ্ডো গাড়ি ঢুকছে।

নীরজাসুন্দরী তার নিজ কক্ষে বসে ইংরাজী লেখা মক্সো করছিল।

মচ্ মচ্ জুতোর শব্দ তুলে মধু এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

নীরজাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বই-খাতা ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

কলেজ থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন যে?

মধু স্ত্রীর সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, আমার বোতল আর গেলাসটা নিয়ে এসো। কথাগুলো বলে মধু নিজ পাঠকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলো।

নীরজা বোতল আর গেলাস এনে টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখল।

গ্লাসে বোতল থেকে তরল পদার্থ ঢালতে ঢালতে মধু বললে, নীরজা, তুমি তোমার পিতৃগৃহে যাবে?

না। নীরজাসুন্দরী বললে।

যাবে না? যেতে চাও না?

না।

কেন?

বিবাহের পর স্বামীর গৃহ স্ত্রীলোকের একমাত্র স্থান।

তুমি যদি যেতে চাও তো আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

আপনি যদি যেতে বলেন তো যাবো।

আমি বললে যাবে?

হ্যাঁ।

কিন্তু নীরজা, আমি তো কোন দিনই স্ত্রীর অধিকার তোমায় দিতে পারবো না।

জানি।

জানো ?

হ্যাঁ।

সে কারণে তোমার দুঃখ হয় না ?

না।

দুঃখ হয় না ?

মানুষ কি তার ভবিতব্যকে কখনো খণ্ডাতে পারে ?

মধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে।

এ যেন সেই লাজুক ভীরু নম্রভাষিনী নীরজাসুন্দরী নয়, তার সামনে এ যেন অন্য এক নারী।

১৯

মধুসূদন বললে নীরজাসুন্দরীকে, কিন্তু আমার নিজস্ব তৃপ্তি বলেও তো একটা বস্তু থাকতে পারে নীরজা !

নীরজা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার সুখের জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে পারি।

নীরজা !

আপনি যদি চান যে আমি পিত্রালয়ে চলে যাই, আপনি সেইমতই ব্যবস্থা করুন, আমি চলে যাবো।

চলে যাবে, সত্যি বলছো নীরজা ?

সত্যিই বলছি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা ভেবে দেখবেন, আপনি স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন বলে লোকে আপনার সম্পর্কে নানা কথা বলবে।

মধুসূদন স্ত্রীর কথার কোন জবাব দেয় না। কেবল মধ্যে মধ্যে গ্লাসটা ওষ্ঠের সামনে তুলে ধরে চুমুক দিতে থাকে।

নীরজাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মধুসূদন নিঃশব্দে পূর্বের মতই মধ্যে মধ্যে গ্লাসে চুমুক দিতে থাকে।

নীরজা হঠাৎ বলে একসময়, আমি একবার কাদম্বিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?

চকিতে মুখ তুলে তাকাল ঐ কথায় স্ত্রীর মুখের দিকে। বললে, কাদম্বিনীর সঙ্গে দেখা করবে তুমি ?

হ্যাঁ, আপনার অনুমতি পেলে।

কিন্তু কেন ?

তাকে আমি নিজে অনুরোধ করবো, বলবো আমি সানন্দে মত দিচ্ছি—

না নীরজা, তাতে কোন লাভ হবে না।

লাভ হবে না ?

না।

আমি অনুরোধ করলেও তিনি সম্মত হবেন না।

না। তা ছাড়া—

কি, বলুন ?

তার দেখা তুমি কোথায় পাবে।

কেন তাদের বাড়িতে !

সে তো সেখানে নেই।

নেই ?

না।

কোথায় গিয়েছেন তিনি ?

কেউ জানে না, সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

তাকে কি খুঁজে বের করা যায় না ?

যে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে, তাকে কি খুঁজে পাওয়া যায় নীরজা ?

নীরজা কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করে থাকে। তারপর শান্ত গলায় বললে, তাহলে তাহলে আমাকে কবে যেতে হবে আপনি বলবেন, জানবেন আমি প্রস্তুতই থাকব।

না নীরজা, আপাততঃ তুমি যেমন আছো তেমনি থাকো।

থাকবো ?

হ্যাঁ, থাকো।

আমি একটা অনুরোধ করবো ?

কি বলো ?

আমাকে বেথুন স্কুলে ভরতি করে দেবেন।

কেন ?

আমি পড়াশুনা করবো।

তুমি বিদ্যালয়ে পড়বে ?

আপনার অনুমতি পেলে।

এ তো ভাল কথা, তুমি পড়াশুনা করতে চাও—খুব ভাল কথা, আমার নিশ্চয়ই সম্মতি আছে।

শ্বশুরঠাকুর আপত্তি করেন যদি ?

না, বাবা আপত্তি করবেন না। আমি নিজে তাঁকে বলবো—বরং মাকে বলবো, মা বাবাকে কথাটা বলবেন।

কথাগুলো বলে শূন্য গ্লাসে আবার মদ ঢালল মধুসূদন।

এই ভরদুপুরে খালি পেটে আর ওগুলো খাবেন না।

মধুসূদন হাসলো, ভয় নেই কিছু হবে না আমার।

আমার যে বড় ভয় করে, নীরজা বললে।

মধুসূদন হাসলো।

নীরজা, তুমি মাইকেল মধুসূদনের নাম শুনেছো কখনো ?

তাঁর দু'খানা বই আমি পড়েছি।

পড়েছো ? কি কি বই নীরজা ?

বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ আর মেঘনাদবধ কাব্য।

কবে পড়লে ?

বাবা এনে দিয়েছিলেন আমাকে বই দুটো—

দেখেছো তাঁকে কখনো ?

না।

তিনি এখন বিলেতে, নচেৎ তোমাকে আমি তাঁর কাছে নিয়ে যেতাম। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর।

আমার একজনকে দেখবার খুব ইচ্ছা করে—

কে বল তো ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঠিক আছে, আমি একদিন নিয়ে যাবো তাঁর কাছে।

আপনি পরমহংসদেবকে দেখেছেন ?

কে, ঐ দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর !

হ্যাঁ, তাঁকেও একটিবার আমার বড় দেখবার ইচ্ছা।

দূর, সে পাগলাটাকে দেখে কি হবে ! তার মধ্যে দেখবার কি আছে ! হাঁটুর উপর খাটো একটু ধুতি পরে খালি গায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মন্দিরের চত্বরে গঙ্গার ঘাটে। শুনেছি most unimpressive !

বাবার কাছে শুনেছি—

কি শুনেছো ?

অনেক বড় বড় লোকরা নাকি তাঁকে দেখতে যান দক্ষিণেশ্বরে—

তাঁরাও পাগল।

কেশব সেন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশ ঘোষ—তাঁরা পাগল ?

পাগল ছাড়া আর কি !

মধুসূদনের পিতাঠাকুর পুত্রবধূর বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ব্যাপারে কোন আপত্তি করলেন না, বরং সানন্দেই মত দিলেন।

মধুসূদন নিজে গিয়ে তাকে বেথুন স্কুলে ভরতি করে এলো কয়েকদিন পরে। মধুসূদনের পিতামাতা কেউই কোন আপত্তি জানান নি পুত্রবধূর বিদ্যালয়ে ভরতির ব্যাপারে। কারণ রামপ্রাণ গুপ্তর স্ত্রীই স্বামীকে বলেছিলেন, তুমি অমত করো না।

রামপ্রাণ বলেছিলেন, কিন্তু ঘরের বৌ—

তাতে কি হয়েছে, শুনতে পাই তো আজকাল অনেক মেয়েই লেখাপড়া শিখছে। তা ছাড়া বধূমাতা লেখাপড়া শিখলে যদি মধুর মতিগতি বদলায়—

বদলাবে মনে করো ?

হয়তো বদলাতে পারে, বিশেষ সে-ই যখন সম্মতি দিয়েছে। কমলাসুন্দরী বললো।

বেশ। তবে তোমার ছেলেকে তো আমি জানি। ঠিক আছে বধূমাতা পড়াশুনা করতে চান করুন, তবে বাড়ির গাড়ি তাঁকে স্কুলে পৌঁছে দেবে ও নিয়ে আসবে।

সে তো নিশ্চয়ই। কমলাসুন্দরী বললে।

সেই মত ব্যবস্থাই হলো।

স্কুলে ভরতি হবার পর দেখা গেল নীরজাসুন্দরী অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করে এবং বাড়িতে যতক্ষণ থাকে শাশুড়ীর সেবা করে।

মধুসূদনের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না। মধুসূদনের সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। অধিক রাত পর্যন্ত সে তার পাঠকক্ষে বসে পড়াশুনা করে।

অনেক দিন কন্যাটিকে দেখে না অক্ষয়চন্দ্র, সেদিন এসেছিলেন আদরিণী কন্যাটিকে একটিবার দেখবার জন্য। অক্ষয়চন্দ্র জানতেন না যে তাঁর কন্যা বেথুন স্কুলে ভরতি হয়েছে।

অন্দরে সংবাদ পৌঁছতেই কমলাসুন্দরীর দাসী শ্যামা বহির্মহলে এলো।

এই যে শ্যামা, সব কেমন আছে ?

ভাল। শ্যামা অক্ষয়চন্দ্রর পদধূলি নিল। তারপর বললে, চলুন গিন্নীমা আপনাকে ডাকছেন।

চল।

কমলাসুন্দরীর কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন অক্ষয়চন্দ্র।

কমলাসুন্দরী আজকাল ঘরের মধ্যে সামান্য হাঁটাচলা করেন। মধুসূদন মেডিকেল কলেজ থেকে সাহেব ডাক্তারকে এনে মাকে দেখিয়েছিল। কমলাসুন্দরী এখন সেই সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসাধীনেই আছে, সামান্য উন্নতি হয়েছে।

পালঙ্কের উপরেই বসেছিলেন কমলাসুন্দরী মাথার গুণ্ঠনটা ঈষৎ টেনে দিয়ে।

নমস্কার বেয়ান। সব কুশল তো?

হ্যাঁ। আপনাদের সব সংবাদ শুভ তো?

ঈশ্বরের ইচ্ছায় মোটামুটি সব মঙ্গল। তা নীরজাকে দেখছি না, অনেক দিন দেখি নি তাই মাকে একটিবার আমি দেখতে এলাম আর যদি অনুমতি হয় তো কয়েক দিনের জন্য তাকে নিয়ে যেতে চাই বেয়ান।

কিন্তু সে তো এখন যেতে পারবে না বেয়াইমশাই। কমলাসুন্দরী বললেন।

যেতে পারবে না?

না, সেটা সম্ভব নয়।

কেন বেয়ান?

সে বেথুন স্কুলে ভরতি হয়েছে।

বিদ্যালয়ে ভরতি হয়েছে?

হ্যাঁ, পড়াশুনা করছে। বধূমাতারই ইচ্ছা হয় প্রথমে বিদ্যালয়ে ভরতি হবে। মধুও আপত্তি করলো না। আপনার বেয়াইমশাইও আপত্তি করলেন না। বুঝতেই তো পারছেন, যুগ পালটাচ্ছে—

না না, বেশ করেছেন। এ তো খুব আনন্দের কথা। বিদ্যালাভ এ তো পরম সুখের কথা। তা সে বুঝি এখন স্কুলে?

হ্যাঁ। আপনি বিশ্রাম করুন, আহারাদি করুন। তিনটে সাড়ে-তিনটেয় ছুটি হলে সে আসবে তখন দেখা হবে। শ্যামা!

যাই গিন্নীমা। শ্যামা এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

বেয়াইমশাইয়ের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দে।

তাহলে সেই ভাল বেয়ান ঠাকরুন। আমি সন্ধ্যায়ই যাবো।

কেন, এসেছেন যখন একটা দিন থেকেই যান না। কমলাসুন্দরী বললেন।

না বেয়ান ঠাকরুন, নীরজার মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

তিনি কি অসুস্থ ?

না, তেমন কিছু নয়। মধ্যে মধ্যে বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা ভোগ করে—

চিকিৎসা হচ্ছে তো ?

হ্যাঁ। কবিরাজমশাই নিয়মিত ঔষধপত্র দেন।

বৈকালে নীরজাসুন্দরী স্কুল থেকে আসবার পর শ্যামা বললে, বৌমণি, তোমার বাবা এসেছেন যে!

বাবা ? বাবা এসেছেন ?

হ্যাঁ, আজ তুমি স্কুলে চলে যাবার পর।

কোথায়—কোথায় বাবা ?

দোতলায় পশ্চিমের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

জামাকাপড় না বদলেই, হাতে মুখে জল দিয়ে পশ্চিমের ঘরে গিয়ে ঢুকল নীরজাসুন্দরী।

পালঙ্কের উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় অক্ষয়চন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' পড়ছিলেন।

নীলকর হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে দীনবন্ধুর ঐ কেতাবটি আলোড়ন তুলেছে রীতিমত। ব্যক্তিগতভাবে দীনবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ছিল অক্ষয়চন্দ্রের।

যে চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম, সেই গ্রামেরই ছেলে অক্ষয়চন্দ্র। ছোটবেলায় এক পাঠশালায় পড়েছেন।

দীনবন্ধুর ঐ নামটা তিনি নিজেই রেখেছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ণ। সকলে কি হাসাহাসিই না করতো ঐ গন্ধর্বনারায়ণ নামটা নিয়ে!

সহপাঠী ও সমবয়সীরা বলতো—গন্ধ! থু থু—গন্ধ—গন্ধ!

পাঠশালার পড়া শেষ হবার পর তাঁর পিতা কালাচাঁদ মিত্র গন্ধর্বকে বিষয়-আশয় দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু গন্ধর্ব কলকাতায় পালিয়ে আসে এবং দীনবন্ধু মিত্র নাম নিয়ে কলকাতার স্কুলে ভরতি হলো।

সেই সময়ই সে মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে লিখত। অক্ষয়চন্দ্র শুনেছিলেন নদীয়া যশোহর প্রভৃতি জেলার সর্বত্র প্রজাদের সঙ্গে যখন নীলকরদের প্রচণ্ড ঝগড়া-বিবাদ চলছে, দীনবন্ধু তখনও ঢাকায় ছিলেন। সেই সময়ই তিনি লেখনী ধারণ করেন।

নীলদর্পণ মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম শুনেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র, কিন্তু বইটা হাতের কাছে পান নি। এখানে এসে সহসা বইখানা দেখে

সাগ্রহে বইটা পড়তে শুরু করেছিলেন।

বাবা!

কে? হাতের বইটা একপাশে সরিয়ে অক্ষয়চন্দ্র উঠে বসলেন পালঙ্কের উপরে।

নীরজা মা! আয় মা।

আপনি কখন এলেন?

এই তো সকালের দিকে।

বাড়ির সব কুশল তো বাবা?

হ্যাঁ। এখানে এসে সব শুনলাম—

কি শুনলেন?

তুই মা বেথুন বিত্তালয়ে ভরতি হয়েছিস!

হ্যাঁ, বাবা।

জামাই বাবাজীরই একান্ত আগ্রহে নাকি তুই বিদ্যালয়ে ভরতি হয়েছিস?

উনি মুখে সে কথা প্রকাশ না করলেও, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, উনি চান আমি ভাল করে লেখাপড়া শিখি, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি। তাই—

খুব ভাল করেছিস মা। স্বামীর আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তিনী হওয়াই তো প্রকৃত সহধর্মিণীর কর্তব্য।

বাবা, আপনি অসন্তুষ্ট হন নি তো?

না মা না। আয় মা, আমার পাশে বোস। জামাই উচ্চশিক্ষিত, তোর শিক্ষার ত্রুটি থাকলে ত্রুটি থেকে যেত।

আশীর্বাদ করুন বাবা, যেন আমি ওঁর যোগ্য সহধর্মিণী হতে পারি।

সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি মা, তোরা সুখী হ।

মা কেমন আছেন?

তার শরীর-স্বাস্থ্য তেমন ভাল যাচ্ছে না। তাই তো তোকে একটিবার দুই তিন দিনের জন্য নিয়ে যেতে এসেছিলাম।

কিন্তু বাবা, এ সময় বিত্তালয় কামাই করে—

না না, যাওয়াটা ঠিক হবে না—পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটবে।

মাকে আপনি বুঝিয়ে বলবেন।

নিশ্চয়ই। তোর গর্ভধারিণীকে বুঝিয়ে সব কথা বলবো বৈকি।

শ্যামা বলছিল—

কি বলছিল রে?

আপনি নাকি আজই চলে যাবেন?

হ্যাঁ, মা।

আপনি চিন্তা করবেন না বাবা। মাকে বলবেন, আমি মধ্যে মধ্যে পত্র দেবো।

হ্যাঁ রে, জামাই কখন আসে?

সামনেই তো শেষ পরীক্ষা। খুব ব্যস্ত উনি। ফেরার তো কোন ঠিক নেই।

জামাইয়ের মত জামাই হয়েছে। কি যে গর্ব আমাদের মা। কিন্তু বেলাবেলি না বেরুতে পারলে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

এখুনি রওনা হবেন?

হ্যাঁ, মা। তোর সঙ্গে একটিবার দেখা করে যাবো বলেই অপেক্ষা করছিলাম।

রাত্রি গভীর হয়েছে।

মধুসূদন তার নিজস্ব পাঠকক্ষে বসে অধ্যয়ন করছিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো ঘোষণা করল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। কিন্তু এখনো এ শহরের বাতাসে একটা হিমেল পরশ যেন পাওয়া যায়। মধুসূদন চেয়ার ছেড়ে উঠে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়াল।

ইদানীং কিছুদিন যাবৎ মধুসূদন ঐ পাঠকক্ষেই একটা চৌকি পেতে শয়নের ব্যবস্থা করেছিল। সামনের টেবিলের ওপরে রক্ষিত জলের গ্লাসটার দিকে তাকাল মধুসূদন।

নীরজা জলের গ্লাসে জল রেখে গিয়েছিল। কিন্তু গ্লাসটা শূন্য হয়ে গিয়েছে। শূন্য জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবল মধুসূদন। তারপর পাশের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। ঐ কক্ষেরই একটি আলমারিতে বোতল থাকে।

ঘরে প্রবেশ করেই কিন্তু মধুসূদন থমকে দাঁড়াল।

মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সেজবাতিটা নামিয়ে এনে নীরজা বোধ হয় অধ্যয়ন করছিল এবং অধ্যয়ন করতে করতেই বোধ হয় নিদ্রাভিভূত হয়েছে কোন এক সময় ক্লান্তিতে।

একপাশে খোলা একখানি ইংরাজী কেতাব। তারই পাশে নীরজার শিথিল দেহভার এলানো। খোলা চুলের রাশি ছড়িয়ে আছে, বিস্রস্ত বসন।

বক্ষের আবরণ শিথিল। দুটি পীনোন্নত বক্ষ স্খলিত অঞ্চলের আবরণমুক্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে মৃদুমন্দ ছন্দে যেন।

মধুসূদনের দৃষ্টি সেইদিক থেকে যেন সরে না। যৌবনভারাবনত শিথিল দেহবল্লরী যেন কামনার সাগরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। মধুসূদন তাকিয়ে থাকে সেই দিকে নির্নিমেষে।

তার দেহের রোমকূপে-কূপে যেন একটা অজ্ঞাত শিহরণ ঢেউ তুলে যায়। তীব্র একটা নেশার মত যেন বিচিত্র এক অনুভূতি তার দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।

হাতের গ্লাস হাতেই থাকে। আলমারি খুলে বোতল থেকে মদ ঢালতে যেন ভুলে যায় মধুসূদন। ধীরে ধীরে শায়িতা নিদ্রিতা স্ত্রীর পাশটিতে বসে পড়ে মধুসূদন।

হাতের শূন্য গ্লাসটা একপাশে নামিয়ে রেখে মধুসূদন নিষ্পলক দৃষ্টিতে নীরজার উন্মুক্ত যৌবন যেন দেখতে থাকে এবং নিজের অজ্ঞাতেই কখন হাত বাড়িয়ে নীরজাকে স্পর্শ করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু স্পর্শেই নীরজার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে।—কে, কে ?

আ—আমি, আমি নীরজা—আমি।

আপনি— ? নীরজা তাড়াতাড়ি গাত্রবস্ত্র ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ। ভূমিতলে এভাবে শয়ন করে আছো কেন ? যাও পালঙ্কে গিয়ে শয়ন করো। বলতে বলতে মধুসূদন উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

যাও শয্যায় গিয়ে শয়ন করো। মধুসূদন আবার বললে। তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে তখনো নেশা—কিসের এক মাদকতা যেন।

পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—কুণ্ঠিতভাবে নীরজা বলে।

যাও শয্যায় যাও। বলতে বলতে শূন্য গ্লাসটা হাতে মধুসূদন আলমারির পাল্লা খুলে বোতল বের করে। এগিয়ে এসে নীরজা বলে, আমায় দিন আমি ঢেলে দিচ্ছি। আমাকে ডাকলেন না কেন ?

নীরজাসুন্দরী স্বামীর হাত থেকে গ্লাস ও বোতল নিয়ে গ্লাসে মদ ঢেলে দিল।

নীরজা !

বলুন ?

তোমার বাবা এসেছিলেন শুনলাম ?

হ্যাঁ।

তা তোমার বাবার সঙ্গে গেলে না কেন ? শুনলাম তোমার মা'র শরীরটা ভাল নয় !

এখন গেলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে।

তাই গেলে না ?

না, মানে—

ঠিক আছে। সামনে দোলযাত্রা। আমি তোমাকে সঙ্গে করে চৌবেড়িয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসবো।

আপনি যাবেন ?

হ্যাঁ, পৌঁছে দিয়ে চলে আসবো।

তাহলে আমিও মাকে দেখে আপনার সঙ্গেই চলে আসবো।

তুমি দুই-একদিন থেকো।

না।

কেন ?

শ্যামা ঠিক মায়ের সেবাযত্ন করতে পারে না। মা'র কষ্ট হবে। তা ছাড়া—

তাছাড়া কি নীরজা ?

আপনার শেষ পরীক্ষা সামনে। এ সময়—

মধুসূদন মৃদু হাসলো। বললে, আমার কোন কষ্ট হবে না।

কিন্তু আমার যে সর্বদা আপনার জন্য চিন্তা হয়—

নীরজা !

বলুন ?

আমার কাছ থেকে তো তুমি কিছুই পাও নি, তবু আমার জন্য চিন্তা কেন তোমার !

কে বললে পাই নি ? আপনার অনুগ্রহ না থাকলে কি এ গৃহে আমার স্থান হতো ?

শুধু এ গৃহে থাকবার অধিকারটুকু পেয়েই তুমি খুশী ?

নীরজাসুন্দরী স্বামীর কথার কোন জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

তুমি এতো অল্পেতেই সন্তুষ্ট নীরজা !

অল্প কেন বলছেন, এর চাইতে বড় অধিকার স্ত্রীলোকের আর কি থাকতে পারে ? আর তার বেশী কি কাম্য থাকতে পারে ?

মধুসূদন অবাক হয়ে যায় নীরজার কথা শুনে।

এ তো সামান্য শিক্ষায় হয় না ! এ যে তারও বেশী—

আপনি মনে কোন দুঃখ বা ক্লেশ রাখবেন না। নীরজা বললে, আপনি আমাকে যতটুকু অধিকার দিয়েছেন, তাইতেই জীবন আমার ধন্য হয়ে গিয়েছে।

নীরজা !

বলুন ?

কাদম্বিনীকে জীবনে আমি কোন দিন ভুলতে পারবো বলে মনে হয় না। তাই তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে চাই না।

কেন ভুলবেন আপনি তাকে?

না ভুললে তোমার প্রতি আমার যা কর্তব্য তা পালন করবো কি করে।

আমার প্রতি কোন কর্তব্যের ত্রুটি তো নেই আপনার।

আছে—আছে নীরজা। আজ এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি, এ আমি অন্যায় করছি।

না না, ওটা আপনি ভাববেন না।

না ভেবে যে পারছি না। বলতে বলতে সহসা হাত বাড়িয়ে মধুসূদন নীরজার একখানি হাত চেপে ধরল এবং ডাকলো গাঢ়কণ্ঠে—নীরজা!

রাত অনেক হয়েছে। চলুন শয়ন করবেন চলুন।

তাহলে—

বলুন।

তুমিও এসো।

আমি তো এই ঘরেই রয়েছি।

না, এক শয্যায়।

নীরজা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

স্বামীর দু'চোখের দৃষ্টিতে কি দেখল তা সে-ই জানে। কিছুক্ষণ সেই দৃষ্টির মধ্যে থেকে নিম্নকণ্ঠে বললে, চলুন শুতে চলুন।

মধুসূদন আর কথা না বলে নীরজার হাতে তরল পদার্থপূর্ণ গ্লাসটা তুলে দিয়ে সোজা গিয়ে শয্যায় শয়ন করল।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দাও নীরজা। বাইরে দেখো চমৎকার চাঁদের আলো।

নীরজাসুন্দরী সেজবাতিটা নিভিয়ে দিল।

সত্যিই আকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন। খোলা জানালাপথে জ্যোৎস্না এসে ঘরের মেঝেতে পড়েছে, নীচের তলায় রামপ্রাণের জলসাঘরে কে এক বাঈজী এসেছে, তার গান শোনা যায়। বাঈজীর কণ্ঠস্বরটি ভারী মিষ্টি।

আজু রজনী হম ভাগে পেহায়নু—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।

জীবন যৌবন সফল করি' মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥

নীরজাসুন্দরীর দু'চোখে জল। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে স্বামীর চরণতলে শয্যায় উপবেশন করল।

২০

কলকাতায় মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা—ইংরাজী ১৮৩৫ সাল।

কলকাতা শহরে তখন চিকিৎসকের বড় অভাব। ভাল চিকিৎসক তেমন এক প্রকার নেই বললেই হয়। যা দু'চারজন আছে তারা ইংরাজ, তাছাড়া কবিরাজ কিছু আছেন। চিকিৎসার জন্য জনসাধারণকে তাদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়।

কলকাতা শহরে তো চিকিৎসক বলতে গেলে নেই-ই, গ্রমাঞ্চলে তো একেবারেই নেই। যা কিছু আছে ঐ কবিরাজ।

ভারতচন্দ্র নিজে কবিরাজ ছিলেন এবং গ্রামঅঞ্চলের চিকিৎসার যে কি অবস্থা সেটা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না বলেই একমাত্র ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবেন মনস্থ করে-ছিলেন এবং সেই কারণেই তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। প্রথমে ইচ্ছা ছিল ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই তাঁর ছেলেকে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়াবেন। কিন্তু পরে ১৮৫২ সনে যখন চিকিৎসার সুব্যবস্থা প্রসারের জন্য তিন বৎসরের পাঠ্যক্রম করে একটি বাংলা বিভাগ গভর্নমেন্ট শুরু করল, ছেলেকে নির্দেশ দিলেন সেই বাংলা বিভাগেই ভর্তি হবার জন্য। তিন বৎসর বেশী সময় নয়, তিন বৎসরের মধ্যেই আনন্দচন্দ্র ডাক্তার হয়ে ফিরতে পারবে। কেটেও গেল তিন বৎসর দেখতে দেখতে। ডাঃ চিবার্স সাহেব তখন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ।

আনন্দচন্দ্রের শেষ পরীক্ষা তখন ঘরের দরজায়। পড়াশুনার চাপ খুব বেশী।

শ্মশান থেকে মল্লিকমশাই ও তাঁর সহধর্মিণীর দাহকার্য সম্পন্ন করে রাত্রির শেষ যামে আনন্দচন্দ্র কলুটোলায় ফিরে এলো। সিক্ত বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে আনন্দচন্দ্র তার মেডিসিনের বইখানি নিয়ে বসেছে, কুসুমকুমারী এসে কক্ষে প্রবেশ করল!

আনন্দ—

আনন্দচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কাকীমা!

সেই কোন্ সকালে গতকাল বেরিয়েছিলে, তারপর সারা দিনমান, রাত্রে পর্যন্ত

এলে না! রাত্রে দুবার এসে তোমার ঘরে তোমার খোঁজ নিয়েছি, তা কোথায় ছিলে?

দর্মাহাটায় গিয়েছিলাম, কাকীমা।

সেখানে হঠাৎ?

হ্যাঁ, মল্লিক কাকাদের একটু খোঁজখবর করতে গিয়েছিলাম—

তা তাঁরা সব ভাল আছেন তো?

না কাকীমা, মল্লিক কাকা ও তাঁর স্ত্রী দু'জনার গতকাল মৃত্যু হয়েছে।

সে কি!

হ্যাঁ, সে এক বিচিত্র আশ্চর্য ঘটনা। মল্লিক কাকা প্রথমে মারা গেলেন, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাকীমার প্রাণটা বের হয়ে গেল।

সেরাত্রের সমস্ত ঘটনা আনন্দচন্দ্র আনুপূর্বিক বলে গেল।

সব শুনে কুসুমকুমারী বললে, ভাগ্যবতী নারী, বহু পুণ্যফল ছিল তাই স্বামীর সঙ্গে একপ্রকার সহমরণেই গেলেন।

তার চাইতেও এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে কাকীমা গত রাত্রে!

কি?

সুহাসিনীকে দেখলাম।

সে তো কবেই মারা গিয়েছে সর্পদংশনে!

না, কাকীমা। আমরা তাই জানতাম বটে, এবং মৃতা বলে তার মৃতদেহ ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু সে মরে নি।

তা কেমন করে এমনটি হলো?

তা ঠিক জানি না, তবে সে আজো জীবিতা। আর সে আজ সন্ন্যাসিনী।

বলো কি আনন্দ?

হ্যাঁ, কাকীমা। সুহাসিনী আজ সন্ন্যাসিনী—এক নতুন সুহাসিনী।

তা তার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো?

ঐ মল্লিক কাকামশাইয়ের গৃহেই। মৃত্যুর ঠিক পরপরই সে তার গুরুর আদেশে ঐখানে এসে উপস্থিত হয়।

সে এখন কোথায়? তার কথা শুনে তাকে একটিবার দেখতে ইচ্ছা করছে। শেষ দেখা দেখেছিলাম তাকে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসবার পর। সেও তো কত বৎসর আগে!

সে তো নেই কাকীমা।

নেই?

না। সে যেমন এসেছিল, তেমনিই আবার চলে গেল। তবে তাকে দেখে কাল মনে হলো সে যেন জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে। সত্যিকারের শান্তির সন্ধান পেয়েছে।

অতঃপর দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব। একটা পাষাণভার-স্তব্ধতা যেন ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে। অনেকক্ষণ পরে আনন্দ বললে, কিন্তু আপনি আমার খোঁজ করছিলেন কেন কাকীমা ?

আমি আজই চলে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা হবে না তাই—

চলে যাচ্ছেন ? কোথায় কাকীমা ?

আমার মায়ের কাছে।

কবে আবার আসবেন ?

আর তো আসবো না আনন্দ।

আসবেন না ? কেন ? কথাটা যেন সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না আনন্দচন্দ্র। কুসুমকুমারীর মুখের দিকে তাই তাকিয়ে থাকে।

আর তো আমার এ সংসারের প্রতি কোন কর্তব্য নেই।

ওকথা বলছেন কেন কাকীমা ?

আমার যা করণীয়, এবার তো তোমার নতুন কাকীমাই করতে পারবেন। তাই এখানকার প্রয়োজনও আমার ফুরিয়ে গেল।

কাকীমা !

জান আনন্দ, নারী পুত্রবতী না হলে তার জীবনটাই ব্যর্থ—মিথ্যা হয়ে যায় একেবারে। কুসুমকুমারীর কথাগুলো যেন কান্নার মতই শোনাল।

তোমার কাকামশাই তো আসলে পুত্রলাভের আশাতেই বিবাহ করেছিলেন দিদি জীবিতা থাকতেও দ্বিতীয়বার। কিন্তু আমিও তাকে সে পুত্র দিতে পারলাম না।

কি জানি কেন আনন্দ যেন কাকামশাইয়ের তৃতীয়বার বিবাহের ব্যাপারটা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। পুত্র হল না বলে আবার বিবাহ! তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভেও যদি কোন সন্তান না জন্মায়, তবে কি আবার চতুর্থবার দারপরিগ্রহণ ?

কাকীমা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি অভিমানবশবর্তিনী হয়েই এ সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন!

না আনন্দ, তা নয়।

না বলছেন ?

সংসারে বিশেষ করে স্বামীর কাছে এতদিন আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আজ সরস্বতী আসায় সে প্রয়োজন তো আর রইলো না। তা ছাড়া আমি এখানে থাকলে সরস্বতী তার প্রাপ্যটুকু তো পাবে না।

পাবেন না ?

না, পাবে না। কথাটা আমার ঠিক তুমি বুঝবে না আনন্দ। তা ছাড়া আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়েরা যে কত অস[illegible] যখনই কথাটা ভাবি তখনই মনে মনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রণাম করি। এদেশের মেয়েদের সামনে শিক্ষার আলো তুলে ধরে যে কি উপকার করেছেন, আজ নয় এ দেশ একদিন বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে হয়ত এ জীবনে আর দেখা হবে না আনন্দ কিন্তু যত দিন বাঁচবো এবং যেখানেই থাকি না কেন তেমার কথা আমার মনে থাকবে।

আনন্দচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে কুসুমকুমারীর পায়ের ধুলো নিল।

চলি আনন্দ, কেমন ?

আপনার মা এখন কোথায় ?

বাবার দেহরক্ষার পর মা শান্তিপুরেই আছেন।

কাকামশাইকে বলেছেন ?

জানেন বৈকি। তাঁর অনুমতি না নিয়ে কি যেতে পারি ?

কুসুমকুমারী কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

আনন্দচন্দ্রের আর পড়া হলো না।

এ শহরে এসে আনন্দচন্দ্র অনেক কিছু দেখল। দেখলো কত্তামাকে, মল্লিক-বাড়ির খুড়ীমাকে, সুহাসিনীকে, ঐ ছোট কাকীমা কুসুমকুমারীকে, কাদম্বিনীকে, মধুসূদনকে, মল্লিককাকা, সেনকাকা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে।

যাত্রার পূর্বে অপরাহ্ণের দিকে কুসুমকুমারী স্বামীকে প্রণাম করতে এলো।

নিবারণচন্দ্র বসেছিলেন তাঁর শয়নকক্ষে একা। গড়গড়ার নলটি হাতের মধ্যে ধরাই ছিল, কলকের আগুন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, কক্ষে প্রবেশ করতেই চোখ তুলে তাকালেন নিবারণচন্দ্র কুসুমকুমারীর দিকে।

একটু নেমে দাঁড়াও, পায়ের ধুলো নিই—কুসুমকুমারী বললে।

পদধূলি নেবার পর নিবারণচন্দ্র বললেন, তাহলে তুমি সত্যিসত্যিই চললে মেজগিন্নী ?

কুসুমকুমারী নীরব।

এমন করে কোন দিন সত্যি সত্যি তুমি আমায় ত্যাগ করে যাবে ভাবতে পারি নি মেজগিন্নী—নিবারণচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বললেন।

না না, অমন কথা বলো না। তোমাকে ত্যাগ করে যাবার স্পর্ধা আমার কোথায়? কেবল এই গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

নিজেই তুমি আমার পুনরায় বিবাহ দিলে মেজগিন্নি, আমি তো চাই নি!

তা কি আমি জানি না?

জানো?

জানি বৈকি।

তবে এভাবে চলে যাচ্ছো কেন? যদি তোমার মনের কথা অন্য রকমই ছিল তবে আমাকে নিয়ে এই মর্মান্তিক খেলা কেন খেললে মেজগিন্নী? কি এঁর প্রয়োজন ছিল?

ছি ছি, ওকথা বলাও মহাপাপ। তা ছাড়া প্রয়োজন ছিল বলেই তো সরস্বতীকে নিয়ে এলাম।

কুসুম অনায়াসেই বলতে পারত, মনে মনে তোমারও কি এটা ইচ্ছা ছিল, না? নচেৎ আমার সাধ্য কি ছিল সরস্বতীকে এ সংসারে নিয়ে আসি? কিন্তু মুখে সেকথা বলল না—বলতে পারল না কেন না-জানি।

মেজগিন্নী, একটা কথার আমার জবাব দেবে যাবার আগে?

বল।

বড়বৌ তো থেকেও নেই, এ সংসারে আসা অবধি তুমিই ছিলে এ সংসারের সব কিছু। এ সংসারটা তুমি যেমনভাবে চালিয়েছো তেমনি চলেছে। আজ তুমি চলে যাবার পর কে এসব দেখবে?

কেন, সরস্বতীই তো রইলো।

সে বালিকা মাত্র। তার সাধ্য কি সব সুষ্ঠুভাবে দেখাশোনা করে?

ছেলেমানুষ তো হয়েছে কি, মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছে, সব শিখে নিতে দেরি হবে না। তুমি দেখে নিও। আমিও তো যখন এসেছিলাম ছোটই ছিলাম।

নিবারণচন্দ্র বললেন, সকলে কি সব কিছু পারে?

পারে। ও পারবে। তুমি কিছু ভেবো না। চলি। বেলাবেলি একটু বেরুতে না পারলে শান্তিপুরে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

আমি যদি গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাই, তোমার আপত্তি আছে?

তার তো কোন প্রয়োজন নেই। কুসুমকুমারী বললে।

এ সংসারে একদিন আমিই তোমায় নিয়ে এসেছিলাম। এ সংসার থেকে চিরবিদায়টা আমিই না হয় দিয়ে আসি।

আমি তো বলছিই, ছোটর কোল জুড়ে যেদিন সন্তান আসবে, সেদিন খবর পেলেই আমি আসবো।

তুমি যে আর ফিরে আসবে না আমি জানি।

কুসুমকুমারী আর কোন কথা বললে না, কক্ষ হতে ধীর পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হতেই সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সরস্বতী ডাকল, মেজদিদি!

কে রে, ছোট?

সত্যিসত্যিই তাহলে আমাদের ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছো মেজদিদি, আমাকে অপরাধী করে চিরদিনের মত?

ছি, ওকথা বলে না ছোট। তোর অপরাধটা কোথায়?

কত্তার ধারণা কিন্তু—

কি রে?

আমারই জন্য তুমি চলে যাচ্ছ।

না রে না। বিশ্বাস কর তুই, কাঁদিস না, শোন।

সরস্বতী নীচু হয়ে কুসুমকুমারীর পদধূলি নিতেই কুসুমকুমারী দু'বাহু বাড়িয়ে তাকে নিজের বক্ষে টেনে নিল। আশীর্বাদ করি বোন, তোর কোল জুড়ে সোনার চাঁদ আসুক—কাঁদিস নে, চুপ কর বোন চুপ কর।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার আবছায়া চারিদিকে ঘন হয়ে উঠছিল।

চারজন দাঁড়ি প্রাণপণে দাঁড় বাইছিল। বাতাস অনুকূল না থাকায় নাও ধীর মন্থরগতিতে এগুচ্ছিল।

নাওয়ের ছইয়ের মধ্যে বসেছিল কুসুমকুমারী।

সঙ্গে চলেছিল তাকে পৌঁছে দিতে মুহুরি দিবাকর। দিবাকর নাওয়ের বাইরে পাটাতনের ওপর বসে হুঁকো টানছিল।

দিবাকর কুসুমকুমারীকে যেমন শ্রদ্ধা করতো তেমনি ভালবাসতো। সংসারের কর্ত্রী বলতে কুসুমকুমারীই ছিল নিবারণচন্দ্রের গৃহে। যেমন মায়ামমতা তেমনি কর্তব্যজ্ঞান। বাড়ির বড় গিন্নী তো কিছুই দেখতেন না, সব কিছুর দেখাশোনা করতে হতো কুসুমকুমারীকে। সেই কুসুমকুমারী বাবুর সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ায়

দিবাকরের দুঃখের যেন অন্ত ছিল না।

সংসারের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, কার কখন কি প্রয়োজন, সব ছিল ঐ কুসুমকুমারী। এই গত বৎসরই তো, তার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ স্থির হওয়ায় এবং হাতে অর্থ ছিল না বলে দিবাকর চিন্তিত হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একদিন কুসুম-কুমারীই শুধালো, কাকা, শুনলাম আপনার কন্যার বিবাহ স্থির হয়েছে?

হয়েছে তো মা-জননী। কিন্তু—

কিন্তু কি কাকা?

আমার অবস্থাটা তো তোমার অবিদিত নেই মা-জননী—

হিসাবপত্র একটা করুন, আমি যতটা পারি সাহায্য করবো।

মা-জননী গো, কি বলে তোমায় এ বুড়োটা যে ধন্যবাদ জানাবে!

তা কত্তাকে বলেন নি?

না, মা-জননী।

কেন, কত্তাকে বলতে পারতেন!

আমার ভয় করে।

ঠিক আছে, বলতে হবে না, যা করার আমিই করবো। কবে বিবাহ, দিন স্থির হয়েছে কিছু?

সামনের শ্রাবণে গোড়ার দিকে দুটো দিন আছে, ভাবছিলাম—

ঠিক আছে, ব্যবস্থা করে ফেলুন কাকা। শ্রাবণে হলে তো আর দিনও বেশী নেই। আষাঢ়ের এই ক'টা দিন। কাল আমি কিছু টাকা দেবো, আপনি কেনাকাটা করুন।

বলতে গেলে দিবাকরের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের যাবতীয় খরচই কুসুমকুমারী বহন করেছিল এবং সত্য কথা বলতে কি কুসুমকুমারী সাহায্য না করলে দিবাকর তার মেয়ের বিবাহ দিতেই পারত না। এবং দিলেও কষ্ট করে শেষ সম্বল তার দেশের ভিটাটুকু বিক্রি করতে হতো।

কাকা? ভিতর থেকে কুসুমকুমারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

মা-জননী! সাড়া দিল দিবাকর।

রাত ক'টা নাগাদ পৌঁছাবো বলে মনে হয় আপনার?

বাতাস পেলে তো কথাই ছিল না মা-জননী, তাছাড়া উজান ঠেলে যেতে হচ্ছে—রাত পুইয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

মাঝপথে কোথাও নৌকা বেঁধে খাওয়াদাওয়া সেরে নেবেন কাকা।

তুমি কিছু খাবে না মা-জননী?

আমার ক্ষুধা নেই। রাত্রে আর কিছু মুখে দেবো না।

দিবাকর আর কিছু বলে না।

ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই ছিল না কুসুমকুমারীর। এবং স্বামীর গৃহ চিরদিনের মত ছেড়ে আসার সময় মনের মধ্যে যে জোর ছিল, ক্রমশঃ যেন একটু একটু করে সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল, একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

ঐ অসহায় মানুষটাকে সে ছেড়ে চলে এলো, নিবারণচন্দ্র যে তাকে ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। কেবল মেজগিন্নী আর কুসুম। কখন খেতে হবে, কখন আদালতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, সব কিছুই কুসুমকুমারীকে দেখতে হতো। এমন কি জামাকাপড় পর্যন্ত সামনে এনে ধরতে হতো।

সর্ব ব্যাপারে উদাসীন যেন কেমন মানুষটা। কোন দিকে কোন ব্যাপারেই যে খেয়াল নেই মানুষটার, সেই উদাসীন আত্মভোলা মানুষটাকেই সে কার হাতে দিয়ে এল!

বড়দিদি তো সংসারের কিছুই দেখেন না। পুজোআহ্নিক নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত, ব্যস্ত তাঁর নন্দগোপালকে নিয়ে।

কেবল কি ঐ মানুষটাই, সংসারের সব কিছু কুসুমকুমারীই দেখতো।

সরস্বতী কি পারবে—পারবে কি দেখাশোনা করতে সব কিছুর? হয়ত অর্ধেক দিন না স্নান, না আহার—চলে যাবে আদালতে।

মক্কেলদের নিয়ে বসলে তো আর খেয়ালই থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, অন্দর থেকে কুসুমকুমারীকেই তাগিদ দিতে হতো বারংবার।

বহুবার তাগিদ দেবার পর হয়তো উঠে আসতো। বলতো, ডাকছো কেন?

রাত কত হলো খেয়াল আছে? কুসুম বলতো, খাওয়াদাওয়া কি আজ আর করতে হবে না?

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, তাই না?

না। এই তো সবে সন্ধ্যে—যাও আসন পেতে রেখেছি, বোসো গিয়ে। সব তো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, গরম করে নিয়ে আসি আমি।

খেতে বসে নিবারণচন্দ্র বলতেন, সত্যি মেজগিন্নী, তুমি না থাকলে যে আমার কি হতো!

হয়েছে। এখন যাও তো হাতমুখে জল দিয়ে এসো।

শীতটা আজ বেশ পড়েছে, না মেজগিন্নী?

সে খেয়াল আছে নাকি তোমার? গায়ের চাদরটা কোথায় রেখে এলে?

সেটা বোধ হয় ফরাসের উপরেই পড়ে আছে।

সেই মানুষটাকে সে ছেড়ে চলে এলো !

কেন যে এক দুর্জয় অভিমান তাকে গ্রাস করলো ?

কুসুমকুমারীর দু'চোখের কোল ছাপিয়ে বার বার করে অশ্রু নেমে আসে। দিবাকরকে বললে কেমন হয়, কাকা নৌকা ফেরান, ফিরে চলুন !

বুকের আকূতি বুকের মধ্যে গুমরাতে লাগল ।

কোন্ মুখ নিয়ে আবার সে সেখানে ফিরে যাবে।

ভোররাত্রের দিকে শান্তিপুরের ঘাটে এসে নাও ভিড়ল।

দিবাকরের গলা শোনা গেল, মা-জননী, নাও ঘাটে ভিড়েছে।

কুসুমকুমারীর যেন চমক ভাঙ্গল।

ওরে নাও সাবধানে ঘাটে লাগা বাবা !

বাড়িটা গঙ্গার ঘাট থেকে বেশী দূরে নয়, মিনিট পনের লাগে হেঁটে যেতে। নৌকা থেকে অবতরণ করে আগে আগে হেঁটে চলে কুসুমকুমারী। পশ্চাতে কিছু ব্যবধানে হেঁটে চলে দিবাকর।—মা-জননী, কেন যে এ স্বেচ্ছানির্বাসন নিলে! মৃদু গলায় বলে দিবাকর।

কাকা ?

কিছু বলছো মা-জননী ?

কলকাতার খবর মধ্যে মধ্যে আমাকে দেবেন।

দেবো বৈকি মা-জননী। সুযোগ সুবিধা হলেই সংবাদ প্রেরণ করবো।

বাড়ির কাছাকছি যেতেই কানে এলো—

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দেরই নন্দন,
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন।

কুসুমকুমারীর মা শরৎশশী কৃষ্ণের শতনাম করতে করতে আঙ্গিনার ফুলগাছ থেকে সাজিতে ফুল তুলেছিলেন। দোরগোড়ায় পৌঁছে কুসুম ডাকল, মা !

কে ?

মাগো আমি !

শরৎশশী এগিয়ে এলেন, ওমা তুই ? আয় মা আয়। তা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—

কেন, তোমার কাছে আসতে হলে কি বলে-কয়ে আসতে হবে ?

ঐ সময় দিবাকর বললে, আমি তাহলে চলি মা-জননী !

সে কি, এখুনি যাবেন ?

হ্যাঁ মা-জননী, ঐ নৌকাতেই ফিরে যাবো।

বিশ্রাম করবেন না? আহারাদি করবেন না?

না মা-জননী, আমাকে বিদায় দাও।

কুসুম আর বাধা দিল না।

দিবাকর দরজার মুখ থেকেই প্রস্থান করলো।

কুসুমকুমারী একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে মায়ের দিকে ফিরে বললে, চল মা ঘরে।

শরৎশশীর মনটা যেন কেমন বিচলিত হয়। বিবাহের পরে যে মেয়ে শ্বশুর-বাড়ি থেকে গত আট বৎসর কখনো আসে নি, আসার কথা বললে জানিয়েছে, কেমন করে যাই মা, তোমার জামাই যে শিশুর মত, সর্বদা দেখাশোনা যে আমাকেই করতে হয়। সেই মেয়ে হঠাৎ এত বছর বাদে চলে এলো কোন পূর্বসংবাদ না দিয়েই! ঘরে এসে বললেন শরৎশশী, তা হ্যাঁ রে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ চলে এলি? সব সংবাদ শুভ তো?

হ্যাঁ মা, শুভ বৈকি—সব ভাল।

তা জামাই বাবাজীকে একা রেখে এলি, তার সব দেখাশোনা—

সে ব্যবস্থা না করেই কি এসেছি মা?

ব্যবস্থা—কি ব্যবস্থা করে এলি রে?

আবার তার বিয়ে দিয়েছি।

বিয়ে! সে কি?

হ্যাঁ, মা।

এই বয়েসে আবার বিয়ে করলেন জামাই?

পুরুষের আবার বয়েস কি মা!

আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না কুসুম!

বংশরক্ষা তো করতে হবে মা।

তাই আবার এই বয়েসে বিয়ে করলেন জামাই?

আমি সব যোগাড়যন্ত্র করে বিয়ে দিয়েছি সরস্বতীর সঙ্গে। আমার প্রয়োজন সে সংসারে ফুরিয়ে গেল তাই চলে এলাম। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সেদিন বুঝতে পারি নি মা আমার সতীনের দুঃখটা। বুঝতে পারলাম সরস্বতীকে ঘরে আনবার পর।

কুসুম!

মাগো?

বোধ হয় ভাল করলি না মা।

ভাল—মন্দ জানি না মা, যা করেছি স্বামীর কথা ও তার বংশের কথা ভেবেই করেছি।

শরৎশশী আর কিছু বললেন না।

২১

কুসুমকুমারী বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর যে কটা দিন আনন্দচন্দ্রকে নিবারণচন্দ্রের গৃহে থাকতে হয়েছিল মনের মধ্যে কোথাও তার যেন এতটুকু শান্তি ছিল না।

ফাইন্যাল পরীক্ষা কোনমতে শেষ করলো—ডাক্তারীর ডিপ্লোমাটা পাবার জন্য। ঐ বাড়িতে প্রাণ যেন তার হাঁপিয়ে উঠেছিল। কেন যেন তার সর্বদা মনে হতো সে যেখানেই যায় সেখানেই কোন-না-কোন দুঃখ ও অশান্তি এসে হাজির হয়।

রাধারমণের গৃহে থাকাকালীন সময়ে সুহাসিনীর পুনরায় বিবাহ দেবার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে রাধারমণের সংসারে অশান্তির ঝড় উঠলো—যে ঝড়ে সুহাসিনী সংসার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল, ভবতারিণী সংসার থেকে দূরে চলে গেলেন—একদা জমজমাট মল্লিকবাড়ি শ্মশানে পরিণত হলো। রাধারমণের বংশটাই লোপ পেয়ে গেল।

তারপর সে এলো কলুটোলায় নিবারণচন্দ্রের গৃহে। নিবারণচন্দ্রের সংসারটাও যেন কেমন হয়ে গেল—কুসুমকুমারীর ঐ সংসার থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

আসলে সুহাসিনীকে যেমন আনন্দ ভালবেসেছিল, তেমনি বুঝি ভালবেসেছিল কুসুমকুমারীকে। আনন্দ কি বুঝতে পারে নি কেন শেষ পর্যন্ত কুসুমকুমারী স্বামীগৃহ ছেড়ে শান্তিপুরে চলে গেল! স্বামীর প্রতি বুকভরা একটা অভিমান নিয়েই কুসুমকুমারী মায়ের কাছে চলে গেল। আঘাতটা নিবারণচন্দ্রর বুকেও কম বাজে নি।

কুসুমকুমারী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবারণচন্দ্রর কাছে সংসারটা যেন শূন্য হয়ে গেল, এবং তাঁর অজ্ঞাতেই মনটা তাঁর সরস্বতীর ওপরে যেন ক্রমশঃ একটু একটু করে বিমুখ হয়ে উঠতে থাকে।

সরস্বতী বালিকা হলেও সেটা বুঝতে পারে। বেচারী আড়ালে বসে বসে চোখের জল ফেলে। নিবারণচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী রত্নাবতী সংসারে থেকেও যেন আর সংসারে ছিলেন না।

স্বামী তার কোন সন্তানাদি হলো না তাই দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। রত্নাবতী একান্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন ব্যাপারটা গ্রহণ করেছিল—মেনে নিয়েছিল। এবং কুসুমকুমারী সংসারে আসার পর যখন সে দেখতে পেল স্বামী তার কুসুমকুমারী-অন্ত প্রাণ হয়ে উঠেছে—সে ধীরে ধীরে স্বামী ও সংসারের দিক থেকে ফিরিয়ে নিল—একটু একটু করে অনেক দূরে চলে গেল। তার নন্দগোপালকে নিয়ে সে মেতে উঠলো।

মন তার সর্বক্ষণ ঠাকুরের কাছেই পড়ে থাকে। কুসুম চলে যাবার পর এতকাল যে সংসারের হালটা সে নিজের হাতে ধরে রেখেছিল সে সংসারের যে কি হলো, কেমন করে চলছে—সে সংবাদটুকু সে নিত না। ফলে সংসারে দেখা দিতে লাগল বিশৃঙ্খলা।

সরস্বতী হিমসিম খেয়ে যায়।

স্বামীও কেমন যেন গম্ভীর। সারাটা দিন বহির্মহলেই থাকেন। সেই মধ্য-রাত্রির পর আসেন, আহার্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মেঝেতে আহার্যবস্তু ঢেকে রেখে একপাশে তার আঁচল বিছিয়ে হাতের ওপরে মাথা রেখে সরস্বতী ঘুমিয়ে পড়ে।

কোন কোন রাত্রে নিবারণচন্দ্র এসে তাকে ডেকে তোলেন, আবার কোন কোন রাত্রে অভুক্তই তিনি শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়েন।

ঘুম যখন ভাঙ্গে সরস্বতীর, সে দেখতে পায়—আহার যেমনি ঢাকা ছিল তেমনি ঢাকা রয়েছে—পালঙ্কের শয্যায় স্বামী নিদ্রাভিভূত। অভুক্ত স্বামী যখন শয্যায় আশ্রয় নিয়েছেন, বেচারী লজ্জায় মরে যায় যেন, নিরুপায় হয়ে কেবল চোখের জল ফেলে।

যতই ছেলেমানুষ হোক সরস্বতী, সে বুঝতে পারে মেজদিদি এ সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াতেই এই সব কিছু ঘটছে সংসারে। কিন্তু তার অপরাধটা কোথায়, সে তো মজদিদির পায়ে ধরে মিনতি জানিয়েছিল বার বার, মেজ দি গো তুমি যেও না!

মেজদিদি শুনলেন না তার কথা, তার কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করলেন না।

বড়দিদি রত্নাবতীকেও বলতে গিয়েছিল সরস্বতী, কিন্তু রত্নাবতী কেবল বলেছেন, তা আমি কি করতে পারি ছোট, তোর কথাই যখন শুনলো না সে, তুই তার খুড়তুতো বোন হওয়া সত্ত্বেও, আমার কথা কি আর সে শুনবে!

তবু একটিবার মেজদিকে তুমি বলো বড়দিদি।

না, তোদের সংসারের ব্যাপারে আর আমায় জড়াস না।

স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে যে দুটো কথা বলবে সরস্বতী সে সাহসটুকুও তার নেই। স্বামীর সামনে যেতেও যেন কেমন ভয় করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সংসারের মধ্যে যেন কেমন একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দাস-দাসীর দল বাড়ির মেজগিন্নী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। যার যা কাজ কেউ তা করে না। ডাকলে তাদের সাড়াও পাওয়া যায় না।

বাড়ির রাঁধুনী বামুন বিধুমুখী অনেকদিন ঐ সংসারে আছে, বয়েসও হয়েছে—কুসুমকুমারী এই সংসারের হাল ধরবার পর সকালে এসে সে-ই ভাঁড়ার খুলে সব ব্যবস্থা করে দিত, কি রান্না হবে বলে দিত। কিন্তু এখন বেলা গড়িয়ে যায়, দুটো উনুন দাউ দাউ করে জ্বলে—কেউ কোন নির্দেশ দেয় না।

রান্নাঘরে বসে থাকে বিধুমুখী।

এ ক'দিনে ইতিমধ্যে নিবারণচন্দ্র আহার না করেই আদালতে চলে গেলেন, রান্না তখনো হয় নি। সরস্বতী রন্ধনশালায় প্রবেশ করে দেখে কিছুই রান্না হয় নি।

বামুনদিদি এখনো রান্না হয় নি!

কেমন করে হবে বাছা, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র কি কেউ বের করে দিয়েছে?

আমি বড়দিদির পুজোর সব গুছিয়ে দিচ্ছিলাম—সরস্বতী বলে।

ভাঁড়ারটা দিয়ে গেলেই তো পারতে। কি যে হয়েছে এ সংসারের, মেজগিন্নী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—না আমাকে তোমরা ছুটি দাও বাপু এবারে!

আমি যে কিছু জানি না, বুঝি না বামুনদিদি—সরস্বতী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে।

এ বাড়ির ছোটগিন্নী তুমি, তোমারই তো সব কিছু বুঝতে হবে।

সরস্বতীর যেন কান্না পায়।

তা বাছা, মেজগিন্নী কবে আসবে জানো কিছু?

জানি না তো!

তাও জানো না? তবে জানো কি? এ সংসারে গিন্নী হয়ে এসেছো কি করতে বাছা?

সরস্বতী কেঁদে ফেলে বলে, আমি তো এখানে আসতে চাই নি বামুনদিদি—তুমিই আমায় বলো বামুনদিদি আমি কি করবো!

সরস্বতীর কান্না দেখে বিধুমুখীর যেন কেমন মমতা হয়, বললে, কেঁদো না বাছা—এ বাড়ির সকলের রকমসকম বুঝি না, একটা দুধের মেয়ের ঘাড়ে সব কিছু ফেলে দিয়ে মেজগিন্নী চলে যায় কেমন করে তাও বুঝি না! চল দেখি ভাঁড়ারে, দেখি কোথায় কি আছে! আমার যেমন পোড়া বরাত—বলি ভাঁড়ারের চাবি কোথায়? না তাও জানো না?

ভয়ে ভয়ে সরস্বতী বললে, চাবি আমার কাছে।

আঁচলে চাবির গোছা বাঁধা ছিল সেটা দেখাল সরস্বতী।

চল ভাঁড়ারে।

তারপর থেকে বিধুমুখীকে চাবি ফেলে দেয় সরস্বতী, বিধুমুখীই যা করবার করে।

সারাটা রাত কখন যে কেটে গেল, সরস্বতী জানতেও পারে নি। পালঙ্কের শয্যায় শায়িত স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে সরস্বতী বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

বিধুমুখী রান্নাঘরে তরকারি কুটছিল, সামনে দাঁড়িয়ে সরকার যোগেন।

সরস্বতীকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে বললে, ছোটমা, বাজার থেকে কি আনতে হবে বলে দিন, বেলাবেলি না গেলে কিছু পাওয়া যাবে না।

কত টাকা দেবো বামুনদিদি? সরস্বতী শুধালো।

গোটা চারেক টাকা এনে দাও, বামুনদিদি বললে।

দেরাজ খুলে টাকা এনে দিল সরস্বতী।

বুঝে-শুনে বাজার করিস যোগেন। বিধুমুখী বললে।

ঐ সময় দাসী সনকা এসে বললে, কত্তাবাবু কি কাল রাতে কিছু খায় নি ছোটমা?

সরস্বতী চুপ করে গেল।

সনকা বললে, যেমন তো তেমনই পড়ে আছে থালা বাটিতে।

বিধুমুখীই এবারে শুধালো, কাল কি কত্তাবাবু কিছু খান নি ছোটবৌ?

না।

কেন?

কখন যে এসেছেন ঘরে কিছুই জানি না—

ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?

সরস্বতী চুপ করে থাকে।

বিধুমুখী এ বাড়ির অনেক দিনের পুরাতন লোক।

নিবারণচন্দ্রের বিবাহের আগে থেকেই এই বাড়িতে আছে। বিধুমুখী তরকারির বঁটি একপাশে কাত করে রেখে সোজা নিবারণচন্দ্রের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো।

নিবারণচন্দ্র তখন উঠে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

কত্তাবাবু ?

কে, ও বামুনদিদি !

তোমাদের কি আক্কেল-পছন্দ বলে কিছু নেই !

কি হলো ?

শুধাচ্ছো কি হলো ! এত বড় সংসারের ঝক্কি সামলাতে ঐ দুধের মেয়ে পারে ?

সে যখন বাড়ির গিন্নী, তাকেই তো দেখতে হবে।

দেখতে হবে—বললেই তো হলো না, তা মেজগিন্নী আসছেন কবে ?

তার আমি কি জানি ?

তোমার পরিবার—এ-বাড়ির গিন্নী, তা তুমি জানবে না তো জানবেটা কি উনি ! তারই বা আক্কেলটা কি, ঐ দুধের মেয়ের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল !

নিবারণচন্দ্র আর দাঁড়ান না। ঘর ছেড়ে চলে যান। বিধুমুখীকে তিনিও ভয় করেন।

আনন্দচন্দ্রের পরীক্ষার ফল বেরুলেই সে চলে যাবে। যে ক'টা দিন পরীক্ষার ফল না বের হয়, তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

নিবারণচন্দ্রের গৃহে তার আর এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা করছিল না। একটা মানুষ এ বাড়ি থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব কেমন এলোমেলো বিশৃঙ্খলা হয়ে গিয়েছে। সব যেন কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব।

হঠাৎ ঐ সময়ে গ্রাম থেকে সংবাদ এলো, পিতা খুব অসুস্থ।

ভৈরব জ্যাঠা সংবাদটা প্রেরণ করেছেন। সংবাদ পেয়েই আনন্দচন্দ্র দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

বাইরের ঘরে যেখানে নিবারণচন্দ্র একটা জটিল মামলার মীমাংসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন আনন্দ সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কাকামশাই !

কে ?

আমি আনন্দ।

কি সংবাদ আনন্দ, আমায় কিছু বলবে ?

হ্যাঁ, আমি আজই দেশে যাচ্ছি।

তোমার পরীক্ষা ?

সে তো হয়ে গিয়েছে।

হয়ে গিয়েছে, কবে হলো।

তা দিন দশেক হলো আজ্ঞে—

কিছু জানতে পারলে ?

আজ্ঞে না। এখনো কিছু জানতে পারি নি। ডাঃ চিবার্সের সঙ্গে তো আপনার যথেষ্ট জানাশোনা আছে—আপনি যদি একটি বার—

আদালত থেকে ফেরার পথে আজ যাবো'খন। হ্যাঁ আনন্দ, শুনলাম তোমাদের মেডিকেল কলেজে কি সব গোলমাল চলছে।

হ্যাঁ, অধ্যক্ষ ডাঃ চিবার্স ঔষধ চুরির অপবাদ শুনছিলাম পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছেন—জাত তুলে বাঙ্গালী বলে গালাগালও করেছেন—সেই ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই বাংলা বিভাগের ছেলেরা বিজয়কৃষ্ণ গোসাঁইয়ের নেতৃত্বে ধর্মঘট করেছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তো আমি চিনি হে—শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশের সন্তান।

শুনলাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে নাকি বিজয় দেখা করেছে, সব কিছু তাঁকে বলেছে।

হু, জল তাহলে বেশ ঘোলা হয়েছে—সাহেব বেটাদের ঔদ্ধত্য ক্রমশঃ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

দেখুন না, অধ্যক্ষকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে হবে। বিজয়কৃষ্ণকেও চিনি, অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ স্পষ্টবক্তা ও জেদী—বললে আনন্দ।

তা কটা দিন পরে দেশে গেলে হতো না আনন্দ।

আজ্ঞে খবর পেলাম পিতৃদেব অত্যন্ত অসুস্থ—

তাই নাকি, তবে তো আর বিলম্ব করা চলে না। তুমি আজই যাত্রা কর।

গ্রামে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল আনন্দর। পিসিমণির মুখেই সব শুনলো আনন্দ। গত মাসখানেক ধরে ভারতচন্দ্র আমাশয়ে প্রায় শয্যাশায়ী।

নিজের চিকিৎসা নিজেই করেছেন।

আনন্দকে কোন সংবাদ দেন নি কারণ তার শেষ পরীক্ষা তখন বলতে গেলে ঘরের দরজায়। শেষ পরীক্ষার সময়টা তাকে ব্যস্ত করা ভারতচন্দ্র যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি।

যদিও বোনেরা বার বার আনন্দকে কলকাতায় একটা সংবাদ দেবার জন্য বলেছিল।

বিশেষ করে বিন্দুবাসিনী।

বিন্দুবাসিনী বলেছিল, দাদা, নশেরে একটা সংবাদ দিলি হতো না। তোমার এমন অসুখ।

না রে বিন্দু, তোর শেষ পরীক্ষা ঘরের দরজায়, এহন আলি পরীক্ষার বিঘ্ন ঘটবে।

তাতে আর হইছে কি—সামনের বার না হয় পরীক্ষা দেবে নে—।

না না, তারে কিছু জানানোর কাম নাই। ভারতচন্দ্র বলেছেন।

বিন্দুবাসিনী কি আর করে—চুপ করে যায়।

আনন্দচন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত পা মুখ ধুয়ে পিতা যে ঘরে শুয়েছিলেন সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। ভারতচন্দ্রের দেহটা যেন একেবারে রোগশয্যার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

চক্ষু বুজে পড়েছিলেন ভারতচন্দ্র।

আনন্দর বড় পিসি শয্যার শিয়রে বসেছিল।

বাবা!

কেডা?

বাবা আমি আনন্দ। আনন্দচন্দ্র এসে শয্যার পাশে উপবেশন করল।

আইছো—ক্ষীণ কণ্ঠে ভারতচন্দ্র বললেন।

আমাকে একটা সংবাদ দেন নি কেন বাবা! আনন্দচন্দ্র বললে।

পরীক্ষা দিছো?

হ্যাঁ।

পাস করবা তো?

মনে হয় পাস করবো।

জানি তুমি পাস করবা। মনডা বড় উদ্বিগ্ন হয়েলো।

আনন্দচন্দ্র পিতার পায়ে হাত বুলাতে লাগলো।

সেই রাত্রেই—রাত্রি তখন গোটা দুই হবে—ভারতচন্দ্রের শেষ সময় ঘনিয়ে এলো। পিতার ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ির গতি দেখে বুঝতে পারে পিতার শেষ সময় উপস্থিত।

আনন্দ তথাপি একটা ঔষধ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়।

ভারতচন্দ্রের বাধা দেন, না, আর নয়—

এই ঔষধটা খান বাবা—আনন্দ বললে।

না, আমি চললাম।

বাবা!

কাঁইদো না। সংসারের ভার এবারে সব তোমারেই নিতি হবে। কিছু রাখতি পারি নাই—

আশীর্বাদ করুন বাবা—

তুমি আমার সোনার ছাওয়াল, সবারে দেখো।

কথা বন্ধ হয়ে গেল ভারতচন্দ্রের।

প্রাণবায়ু নির্গত হলো।

পিসিরাই সব ব্যবস্থা করলেন।

আনন্দর তখন কিই বা বয়স—মাত্র তো কুড়ি বৎসর। যা হোক যথাসময়ে শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। এবং যেদিন সব কাজকর্ম মিটে গেল নিবারণচন্দ্র কলকাতা থেকে সংবাদ পাঠালেন, আনন্দচন্দ্র ডাক্তারী পাস করেছে।

আরো মাসখানেক বাদে আনন্দচন্দ্র কলকাতায় গেলেন। গ্রামেই তিনি ডাক্তারী করবেন—গ্রামের বয়স্ক জনেরা তাঁকে সেই পরামর্শটি দিয়েছেন। ডাক্তারী করতে হলে কিছু কিছু জিনিস ও ঔষধপত্রের প্রয়োজন, সেই সব কেনাকাটা করতে হবে।

কিন্তু ভারতচন্দ্র তো কিছুই রেখে যান নি।

হঠাৎ মনে পড়ে তার মেজপিসির সেই সোনার বাদশাহী মোহরের কথা। তা থেকেই গোটা দুই মোহর সে নিয়ে গেল।

নিবারণচন্দ্র সব শুনে বললেন, গ্রামে ডাক্তারী করবার জন্য যা যা প্রয়োজন সব একটা ফর্দ করে ফেল আনন্দ, কত টাকা লাগবে একটা হিসাব করে বলো—যা লাগে আমি দেবো তোমাকে।

আপনি দেবেন!

হ্যাঁ, তোমার মেজকাকীমার তাই বাসনা ছিল। আমাকে কথাটা অনেকবার বলেছেনও।

আনন্দচন্দ্রর মনে পড়ে যায় কুসুমকুমারীর কথা।

আনন্দচন্দ্র বললে, খুড়ীমা আর আসেননি?

না।

শান্তিপুরেই আছেন?

তাই তো শুনেছি। নিবারণচন্দ্র বললেন।

পরের দিন বাজার ঘুরে কিছু কিছু ঔষধপত্র কিনে আনন্দচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার পরে ফিরতেই দাসী এসে বললে—দাদাবাবু ছোটমা ডাকছেন।

কোথায় ছোটমা ?

অন্দরে।

চল।

একটা আসন বিছিয়ে মেঝেতে, সামনে এক গ্লাস জল ও একটা শ্বেতপাথরের রেকাবীতে কিছু ফল সাজিয়ে অদূরে দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী।

মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা।

এত কি দিয়েছেন ছোট কাকীমা!

ঘোমটার ভিতর থেকেই মৃদু গলায় সরস্বতী বললে, সারাদিন তো কিছু খাওয়া হয়নি আপনার, সেই কোন্ সকালে চারটি মুখে দিয়ে বের হয়েছিলেন।

সরস্বতীর গলার স্বরে মমতা যেন ঝরে পড়ে।

কুসুমকুমারীর কথা মনে পড়ে যায়।

পরিধানে সরস্বতীর একটা মলিন কস্তাপাড় শাড়ি। গায়ে সামান্য অলংকার। কুসুমকুমারীর সারাগায়ে অলংকার যেমন ঝলমল করতো, তার কিছুই নেই সরস্বতীর অঙ্গে। কেমন যেন কৃশ মনে হলো।

ছোটকাকীমা আপনাকে বড় রুগ্ন দেখাচ্ছে, দেহ কি ভাল নেই ?

ভালই তো।

সরস্বতী ইতিপূর্বে আনন্দর সঙ্গে কোন কথা বলতো না। আজই প্রথম সে কথা বলছে।

আমার একটা কাজ করে দেবেন ?

কি করতে হবে বলুন ?

একটিবার শান্তিপুরে যাবেন ?

শান্তিপুরে !

হ্যাঁ, মেজদিদি সেখানেই তাঁর মায়ের কাছে আছেন—জানেন না বোধহয় তিনি আমার সম্পর্কে জেঠাইমা !

জানি। আমিই তো আপনার মামার কাছে ফরিদপুরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলাম—আর সে কারণে আজো আমি অনুতপ্ত—

অনুতপ্ত কেন ?

আনন্দচন্দ্র চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

তা আমাকে সেখানে কেন যেতে হবে ছোটকাকীমা ?

আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো ?

না অসুবিধা কি, এখন বলুন, কেন যেতে হবে সেখানে ?

মেজদিদিকে বলবেন আমার হয়ে তিনি যেন ফিরে আসেন। বলবেন—

কি বলবো ?

তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে, এবার তিনি এলেই আমি ছুটির জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

আনন্দচন্দ্র অবাক্ হয়, এ তো কোন বালিকা বা কিশোরীর কথা নয় !

কই, খেতে শুরু করুন।

আনন্দ আহার্যে মনোনিবেশ করল। খাওয়া শেষ হলে উঠে পড়লো আনন্দ-চন্দ্র।

দাসী সনকা জলের ঘটি হাতে বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

তাকেই শুধাল আনন্দচন্দ্র, সনকা, ছোটকাকীমার শরীরটা ভাল না মনে হলো ?

এ সময় তো শরীর একটু খারাপ হবেই দাদাবাবু, ওঁর পেটে যে সন্তান এসেছে—

সত্যি !

হ্যাঁ।

সংবাদটা শুনে আনন্দচন্দ্রের খুব আনন্দ হয়।

মেজকাকীমা সংবাদটা পেয়েছেন ?

জানি না।

ঠিক আছে, আমি তো শান্তিপুরে যাচ্ছিই—নিজেই সংবাদটা দিয়ে আসবো। আনন্দ বললে।

কিন্তু যাবো স্থির করেই দশ-বারো দিন দেরি হয়ে গেল আনন্দর। নৌকায় কোন এক সন্ধ্যায় আনন্দ গিয়ে শান্তিপুরে পৌছাল।

মুহুরী দিবাকরের কাছ থেকেই আনন্দ প্রয়োজনীয় সব সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়েছিল যাত্রার পূর্বে। বাড়ি চিনে নিতে আনন্দর কষ্ট হয় নি।

কুসুমকুমারীর জননী গৃহে ছিলেন না, কুসুমকুমারী একাই ছিল। রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিল কুসুমকুমারী, আঙ্গিনায় পা দিয়ে আনন্দ ডাকল, খুড়ীমা !

কে ?

মেজখুড়ী আমি—

আমি কে ? কুসুমকুমারী বের হয়ে এলো রন্ধনশালা থেকে। হাতে প্রদীপ

আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আনন্দ, খুড়ীমা আমি আনন্দ—

ওমা আনন্দ, এসো এসো !

একটা আসন বিছিয়ে দিল কুসুমকুমারী আনন্দকে, এতদিনে মেজখুড়ীমাকে মনে পড়লো বুঝি! মাথার চুল ছোট দেখছি—

বাবার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে।

কতদিন হলো?

মাস তিনেক হবে।

তা কোথা হতে আসছো আনন্দ?

কলকাতা থেকে।

সেখানকার সব খবর ভাল তো?

ভাল। ছেটখুড়ীমাই আমাকে পাঠালেন—

কে, সরস্বতী?

হ্যাঁ। একটা আনন্দসংবাদ আছে মেজখুড়ীমা।

আনন্দ-সংবাদ!

হ্যাঁ, ছোটখুড়ীমা সন্তানসম্ভবা—

সত্যি?

হ্যাঁ, মেজখুড়ীমা; তাই তিনি বলে দিয়েছেন এবার আপনাকে ফিরে যেতে।

কুসুমকুমারী নীরব। মনে হলো সে যেন কি ভাবছে।

আমি কিন্তু আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আনন্দচন্দ্র বললে।

২২

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন যেন এক গ্রীক ট্র্যাজেডি।

আর সেই ট্র্যাজেডির নায়ক মধুসূদনের পতন যেন দুটি আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্বে ও বিভ্রান্তিতে। মধুসূদনের জীবনের দুটি মূল আদর্শ ছিল মহাকাব্য কত দূর এবং ইংলণ্ড কত দূর। পঞ্চাঙ্কে যদি মাইকেলের ট্র্যাজিক জীবন-নাট্যকে বিচার করা যায়, তা হলে দেখা যায় জন্মকাল থেকে খৃষ্টান ধর্মান্তর গ্রহণ প্রথম অঙ্ক এবং যার মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণই প্রধান ঘটনা।

শিক্ষা ও সেই সময়কার কালের হাওয়া তাঁকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের দিকে ঠেলেছিল। এবং ঐ ধর্মান্তর গ্রহণই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ককে চরম পরিণতির দিকে তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল। মধুসূদন মাদ্রাজে চলে গেলেন এবং ঐখানেই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অঙ্কের শেস। মাদ্রাজে অবস্থান, ইংরাজ ললনার পাণিগ্রহণ ইত্যাদি তাঁকে তাঁর জীবনের তৃতীয় অঙ্কের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেখানে বসে মধুসূদন

ক্যাপটিভ লেডি ইংরাজী কাব্য রচনা করলেন এবং প্রকাশ করলেন। তারপর ফিরে এলেন আবার কলকাতায়। সেই সময়ই অর্থাৎ ঐ জীবনের তৃতীয় অঙ্কে—বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও বাংলা ভাষায় নতুন আগ্রহ—বাংলা ভাষায় নাটক রচনা জীবননাট্যে তাঁর তীব্র বেগ সঞ্চার করেছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পতন মাদ্রাজ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিলাতযাত্রা পর্যন্ত। কলকাতায় অবস্থান তাঁর জীবন-নাটকের তৃতীয় অঙ্ক।

বস্তুতঃ ঐ সময়টাই তাঁর জীবনের বোধ করি শ্রেষ্ঠ সময়। মধু গুপ্তের মতে, যাঁকে মধুসূদন গুপ্ত জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, যাঁর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিল, সেই মাইকেলের জীবনে ঐ সময়টাই তাঁর জীবন ও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়টি বৎসর। খ্যাতি, অর্থ, সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ঐ সময়েই তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু মধু গুপ্ত জানত না অলক্ষ্যে যাঁর জীবন ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়ে চলেছিল, ঐ সময় থেকেই তার পূর্বাভাস বা সূচনা। মনে তাঁর শান্তি ছিল না। মন তখন তাঁর পড়ে আছে সর্বক্ষণ দূর ইংলণ্ডের দিকে—হোমার, দান্তের কবিপ্রতিভার সান্নিধ্যলাভের জন্য। সেই সঙ্গে মহাকাব্য রচনা ও ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসার স্বপ্ন—সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ।

ইতিমধ্যেই মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হয়েছে।

মধু গুপ্ত জানত, মাইকেলের জীবনে যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যলাভ না হতো, তাহলে তাঁকে আরো বড় বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিত। খৃষ্টধর্মের প্রচারক পাদ্রীদের প্রতি বিদ্যাসাগরের কোনদিনই বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না এবং ঐ পাদ্রীদের প্রভাবে যে সব লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন তাদের সম্পর্কে অনেক সময় বিদ্যাসাগর রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ্যেই করতেন।

বিদ্যাসাগর প্রায়ই শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সমবয়স্ক কয়েকজন ছেলের সঙ্গে বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে খেতে গল্প করতেন। একদিন ঐরকম এক সভায় গল্প করছেন বিদ্যাসাগর, এক বাঙ্গালী পাদ্রী ঐ সময় সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন।

বিদ্যাসগর তাঁকে ডাকলেন এবং শুধালেন, কি চান আপনি বলুন তো?

পাদ্রী বললেন, আপনাদের স্যালভেশান চাই।

বিদ্যাসাগর বললেন, ওরা ছেলেমানুষ। সারাটা জীবনই ওদের সামনে পড়ে আছে। ওদের ওসব কথা শোনাবেন না। বরং এক কাজ করুন—আমি বুড়ো হতে চললাম, ধর্মের কথা আমাকে শোনান, কাজ হবে।

পাদ্রী ঐ ধরনের প্রশ্নে কেমন যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চলে গেলেন। অথচ বিদ্যাসাগর যে এদেশী বা বিদেশী পাদ্রীমাত্রের প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন,

তাও নয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এবং খৃষ্টান সমাজের মুখপাত্র পাদ্রী ডল সাহের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ডল সাহেব বিদ্যাসাগরের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন। ডল সাহেব Useful Arts School নাম দিয়ে ধর্মতলায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজীর সঙ্গে এদেশীয় লোককে শিল্প, সঙ্গীত, ব্যায়াম ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া।

বস্তুতঃ ধর্মকে তিনি ধর্মের ভিতর দিয়ে জীবনে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর কিন্তু ধর্ম নিয়ে কখনোই জীবনে বিশেষ মাথা ঘামান নি। তাঁর বক্তব্য ছিল, পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানুষ ধর্ম নিয়ে তর্ক করে আসছে। চিরদিন তাই করবে। কোন দিন কোন মীমাংসায় পৌছানো যাবে না। তাই হয়ত বিদ্যাসাগর ধর্মসংস্কার এবং নতুন কোন ধর্ম প্রচারের চেষ্টা কোনদিন করেন নি।

মাইকেল ব্যাপরাটা বোঝেন নি গোড়ায়। তাই তাঁর মন কিছুটা বিরূপ হয়েছিল প্রথম দিকে বিদ্যাসাগরের প্রতি।

কিন্তু সে সম্পর্কের নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রকাশ হবার পর। মাইকেল ঐ সময় রাজনারায়ণকে একটা পত্র লেখেন —As soon as you get this book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out any amount of adverse criticism, especially when that criticism is from an honest friend who wishes me well.

প্রথমে বিদ্যাসাগর ঐ কাব্যের গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি, মনে হয় কিছু বিরূপ সমালোচনাও করেছিলেন। যা রাজনারায়ণের মধুসূদনকে লেখা এক পত্রে জানা যায়। যার উত্তরে মধুসূদন লিখেছিলেন, These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song. ফলে বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের মধ্যে প্রথম সম্পর্কের সূত্রপাত কিছুটা তিক্ততার মধ্য দিয়েই, অথচ বিস্ময় এই ঐ সম্পর্ক পরে মানবিকতার মাধুর্যে 'ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে।

যার ফলে তিন মাসের মধ্যেই মধুসূদনের সকল অভিমান দূর হয়ে গেল। এবং দু' বছরের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে ওঠে।

কেবল বন্ধু বলে নয়, মাইকেল বিদ্যাসাগরকে "first man among us" বলেও আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। একসময় রাজনারায়ণকে মধুসূদন লেখেন, He

(Vidyasagar) has taken great interest in my proposed visit to England, in fact the most active promoter of my views on this subj ct.

মাইকেলের ইউরোপ যাত্রা পরিকল্পনায় সবচেয়ে সক্রিয় সমর্থক ছিলেন বিদ্যাসাগরই। ১৮৬২র ৯ই জুন মাইকেল ইউরোপ যাত্রা করলেন, ১৮৬৩র মে মাসে এবং জুলাই মাসের শেষে ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করলেন।

মধুসূদন গুপ্ত মাইকেলের বিলাত যাত্রার কথাটা শুনেছিল কিন্তু তার বেশী কিছু জানতে পারে নি। বিলাত যাত্রার আগে মাইকেল তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের কলকাতায় রেখে যান, এবং তাঁর বিষয়সম্পত্তি ও টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে যান।

মাইকেলের স্ত্রী আঁরিয়তের সঙ্গে মধুর আলাপ ছিল। মধ্যে মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত মাইকেলের গৃহে যেত। সেই সময়ই আঁরিয়তের সঙ্গে মধুর আলাপ।

কলেজের ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হবার পরই মধু একদিন মাইকেলের গৃহে গেল।

আঁরিয়েত তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিদারুণ দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। চিরদিন মাইকেল টাকা হাতে না থাক, ধারকর্জ করে ঠাট বজায় রেখেছেন। দু'হাতে খরচ করেছেন।

মাইকেলের পরিবারের আজ দুরবস্থা দেখে মধু গুপ্তর চোখে জল আসে।

'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা, যে কাব্য লিখতে লিখতে একদিন বন্ধু রাজনারায়ণকে বলেছিলেন, My dear Raj, this will make me immortal—আজ তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদের এ কি দুরবস্থা!

কথাটা মাইকেল মিথ্যা বলে যান নি। ঐ একটিমাত্র গ্রন্থ—মেঘনাদবধ কাব্যই মাইকেলকে এ-দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখবে চিরকাল। বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণকমল।

আঁরিয়ত মধুকে সাদর আহ্বান জানালেন, এসো এসো, মিঃ গুপ্ত।

মধু কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে চারিদিকে দৈন্যের ও অভাবের সুস্পষ্ট চিত্র দেখে বললে, এ কি দেখছি মিসেস দত্ত, আপনার এ দুরবস্থা কত দিন?

আঁরিয়ত হাসলেন। বিষণ্ণ করুণ হাসি।

আশ্চর্য, ঐ বিদেশিনী মহিলা মাইকেলকে ভালবেসেই সুখী—তাঁর সুখেই সুখ—তাঁর দুঃখেই দুঃখ।

তা এমনি করে কতদিন কাটাচ্ছেন মিসেস দত্ত?

তা আজ মাস সাত-আট হলো।

আপনি আমাকে এ খবর জানান নি কেন?

সামান্য সাহায্যে তো এ দুঃখ আর অভাবের সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, মিঃ গুপ্ত !

তা হয়ত যায় না, কিন্তু—

কবিকে আমি চিঠিতে সব জানিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি তো যতদূর জানি, আপনাদের একটা ব্যবস্থা করেই কবি ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন।

তাই, কিন্তু—

কিন্তু কি ?

যাদের উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে—বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত ভার দিয়ে আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন—they didn't keep their promise !

আশ্চর্য !

That is human nature, মিঃ গুপ্ত ! ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে ?

কিন্তু আপনাদের একটা ব্যবস্থা না হলে—

মাইকেল চিঠি দিয়েছেন।

দিয়েছেন চিঠি ?

হ্যাঁ।

কি লিখেছেন কবি ?

আমাদের তাঁর কাছে চলে যাবার জন্য লিখেছেন। টাকার যোগাড় হলেই চলে যাবো—তা তোমার ইংলণ্ড যাবার কি হলো গুপ্ত ?

আমি এখন কিছু স্থির করি নি। পরীক্ষার রেজাল্ট বের হোক, তারপর বাবাকে বলবো।

তোমার বাবার তো অনেক টাকা আছে আমি শুনেছি—he is a rich man—তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।

I also think so.

তবে আর বাধাটা কোথায় ?

বাধা আছে মিসেস দত্ত আরো—

কি বাধা ?

আমার মা—মাই মাদার, তুমি জানো মার কথা, তোমায় আমি বলেছি—

তিনিও কি অন্যান্য হিন্দু নারীর মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ?

না হয়ে তো উপায় নেই।

Poor lady !

মধু হাসলো। তারপর বললে, আজ তোমার এখান থেকে আমি কিন্তু খেয়ে যাবো মিসেস দত্ত।

খেয়ে যাবে!

হ্যাঁ। অনেকদিন তোমার হাতের রান্না খাই নি, আমি মার্কেট থেকে এখুনি গিয়ে মাটন কিনে আনছি—তুমি রান্না কর, তা ছাড়া তুমি তো চলে যাচ্ছো—আর কবে তোমার হাতের রান্না খাবো কে জানে!

খাবার কথায় আঁরিয়তের মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল।

ঘরে তো কিছুই নেই। কি রাঁধবে—কি খাওয়াবে ওকে?

মধু বের হয়ে গেল তখুনি গাড়িতে চেপে।

আঁরিয়তের ছু' চোখে জল এসে যায়।

সেই দিনটা অনেকক্ষণ ধরে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে, হৈ-চৈ করে রাত্রের দিকে ফিরে গেল মধু।

মধু মায়ের কাছে বিলাত যাবার কথাটা না বললেও পিতা রামপ্রাণ গুপ্তকে বলেছিল।

রামপ্রাণ পুত্রের মুখে তার ইউরোপ যাবার বাসনা শুনে চুপ করে ছিলেন। কোন কথা বলেন নি। বস্তুতঃ তার ইচ্ছা ছিল না একমাত্র পুত্র তার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপ যায়, সাগর পাড়ি দেয়। কিন্তু নিজে প্রচণ্ড সাহেবীভাবাপন্ন হওয়ায় এবং ইংরাজ জাতির গোঁড় ভক্ত হওয়ায় পুত্রের ইচ্ছায় সরাসরি বাধাও দিতে পারলেন না।

কিন্তু তিনি ভালভাবেই জানতেন স্ত্রী কমলাসুন্দরী সহজে সম্মতি দেবে না ঐ ব্যাপারে। অন্য কোন কারণে নয়, একমাত্র পুত্র সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশ যাবে, তাঁর বুকের নিধি দূরে চলে যাক—সেটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না ঐ কথাটা ভেবেই।

পুত্র যখন আবার বললে, আমি ভাবছি বাবা, পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলেই আমি চলে যাবো—

রামপ্রাণ বললেন, দেখো সত্য কথাই তোমাকে বলি, তোমার মা হয়ত তোমার এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন না—

তা জানি বাবা।

মায়ের সম্মতি যদি তুমি আদায় করতে পারো—

আপনার কোন আপত্তি থাকবে?

না।

ঠিক আছে, মায়ের সম্মতি না পেলে আমিও যাবো না—আপনাকে কথা দিচ্ছি।

সেই কথাটা ভাবতে ভাবতেই সারাটা পথ এসেছে মধু।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করে মধু দেখলো নীরজাসুন্দরী নেই ঘরে। মধু জামা-কাপড় ছেড়ে বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসল।

দু'চুমুক গ্লাসে দিয়েছে নীরজা এসে ঘরে ঢুকল।

নীরজা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, মায়ের শরীরটা ভাল না।

ভাল না! কি হয়েছে মার? সকালেও তো যখন তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম—

গত সাত-আট দিন ধরেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না মায়ের।

কই, কিছু তো তুমি আমায় বলো নি? তা কি হয়েছে?

সেই বাতের ব্যথাটা বেড়েছে, আর জ্বর—

জ্বর! কবে জ্বর হলো?

জ্বর তো দিন-দশেক থেকে—সামান্য সামান্য জ্বর—

বাবা জানেন?

আমি বলেছিলাম বাবাকে বলি কথাটা, কিন্তু মা বলতে দেন নি।

মধু গ্লাসের তরল পদার্থটা সবটুকু গলায় ঢেলে মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। বললে, চল, মাকে দেখে আসি।

আপনি মা'র ঘরে যাবেন এখন?

হ্যাঁ।

মধু এসে কমলাসুন্দরীর ঘরে প্রবেশ করল।

শয্যার উপাধানে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে কমলাসুন্দরী চোখ বুজে পড়েছিলেন। পদশব্দে চক্ষু মেলে তাকালেন।

কে?

মা!

কে রে?

মা, আমি—

মধু! আয় বাবা। এখনো ঘুমাস নি?

মধু এসে মায়ের শিয়রে দাঁড়াল, তোমার দশ দিন থেকে জ্বর চলেছে, কথাটা আমাকে বলো নি কেন?

কেন রে! কমলাসুন্দরী হাসলেন, আমার চিকিৎসা করবি?

কেন, ডাক্তার ডেকে আনতে তো পারতাম।

না রে, তার আর দরকার নেই।

মা!

আয় আমার পাশে এসে বোস।

মধু মায়ের শয্যায় বসলো।

নীরজাসুন্দরী দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

২৩

কমলাসুন্দরী পুত্রের দিকে সস্নেহে তাকালেন, আয় বাবা।

মা, তোমার অসুখের বাড়াবাড়ি হয়েছে আমাকে জানাও নি কেন? আমি তো বাড়িতেই ছিলাম।

কমলাসুন্দরী মৃদু হাসলেন।

কালই আমি সাহেব ডাক্তারকে ডেকে আনবো।

তা আনিস, কিন্তু হ্যাঁরে, মা বাপ কি কারো চিরদিন বেঁচে থাকে?

মায়ের কণ্ঠস্বরে চোখে-মুখে যেন কেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে মধু। মা যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক। দু'চোখের দৃষ্টিতে তাঁর যেন কেমন একটা বিষণ্ণ করুণ ভাব।

আমার পাশে এসে বোস মধু! কমলাসুন্দরী বললেন।

মধু মায়ের ডাকে আগ্রহে শয্যায় তাঁর পাশটিতে এসে বসল।

মধু!

কিছু বলবে মা?

কয়দিন থেকেই ভাবছিলাম তোকে একটা কথা বলব বাবা—

বলো না মা—কি কথা বলবে!

হ্যাঁরে উনি বলছিলেন—একটু ইতস্ততঃ করে কমলাসুন্দরী বললেন কথাটা, কিন্তু কথাটা শেষ করলেন না।

কি বলছিলেন বাবা?

তুই নাকি বিলেত যেতে চাস? কথাটা কি সত্যি বাবা?

কয়দিন থেকেই মধু ভাবছিল কথাটা মাকে বলবে, কিন্তু কেমন করে মায়ের কাছে কথাটা উত্থাপন করবে, শেষ পর্যন্ত সেটাই ভেবে পাচ্ছিল না।

কিন্তু আজ যখন কমলাসুন্দরী নিজেই কথাটা তুলল, মধু কতকটা যেন সহজ ভাবেই বললে, হ্যাঁ মা।

বিলেত যেতে চাস তুই সত্যি-সত্যিই!

বাবাকে বলেছি কথাটা, বাবার আপত্তি নেই—

কিন্তু কেন মধু? বিলেত না গেলে কি বড় ডাক্তার হওয়া যায় না? আমি বলছি বাবা, এখান থেকে পাস করেই একদিন তুই বড় ডাক্তার হবি।

আমি ডাক্তারী সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে চাই, যা এখনো এদেশে সম্ভব নয়। ওদেশে গেলে আমি আরো অনেক শিখতে পারবো। তুমি বাধা দিও না মা, দু'তিন বৎসর পরে আবার আমি ফিরে আসবো কথা দিচ্ছি তোমাকে।

না বাবা।

মা!

না, বিলেত তুই যাস নে।

সে-দেশে না গেলে বড় হওয়া যায় না। যাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মানুষ বলো বরাবর, সেই রামমোহনও তো বিলেত গিয়েছিলেন।

কিন্তু কই বিদ্যাসাগর মশাই তো যান নি। ওসব চিন্তা তুই ছেড়ে দে বাবা।

বিলেত আমার চিরদিনের স্বপ্ন মা, তুমি 'না' করো না মা।

অতঃপর অনেকক্ষণ কমলাসুন্দরী চুপ করে রইলেন, তারপর একসময় বললেন, আমাকে তাহলে একটা কথা দে মধু—

কথার প্রয়োজন কি মা, তোমার আজ্ঞাই তো আমার কাছে সর্বদা শিরোধার্য।

যত দিন আমি অন্ততঃ বেঁচে আছি, কথা দে বাবা, এ দেশ ছেড়ে কোথাও তুই যাবি না।

মা!

বল বাবা, যাবি না?

বেশ মা, তাই হবে।

মধু—

কথা দিচ্ছি মা, আমি যাবো না।

কমলাসুন্দরী চক্ষু দুটি বোজালো। আর কোন কথা বললো না। মধু তথাপি কিছুক্ষণ শয্যার ওপরে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইলো, তারপর একসময় মা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে শয্যা থেকে উঠে পড়ল।

নীরজাসুন্দরী অনতিদূরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে। মা ও ছেলের

কথাগুলো সে কেবল শুনে যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চোখাচোখি হলো মুহূর্তের জন্য, তারপর ঘরে থেকে বের হয়ে গেল। নিজের ঘরে এসে মধু পুনরায় কেদারায় উপবেশন করল।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য তার বিলাত যাবার ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেল। তা হোক, মনে মনে বলে মধু, মা'র অনিচ্ছায় সে বিলেত যাবে না। ঐ মায়ের দিক থেকেই যে একটা ভয় ছিল না তা নয়—বাধা এলে ঐ মায়ের দিক থেকেই যে আসবে তা জানত মধু।

তার বাবাও সেই রকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

বস্তুতঃ বিলাত যাবার পরামর্শ টা তার অধ্যাপক ড্রামণ্ড সাহেবই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মধু, after you get your degree—what next ! have you thought over that matter ?

No, Sir.

Why don't you go to England !

একেবারে যে কথাটা আমার কখনো মনে হয় নি তা নয় সাহেব—

তাহলে ?

আমাদের পক্ষে বিলাত যাওয়া—অনেক বাধা-বিপত্তি আসবে !

কিসের বাধা ?

সে অনেক। সমাজের দিক থেকে, বাড়ির দিক থেকে--

But why ? তুমি আরো শিখতে আরো জানতেই তো যাবে সে দেশে !

জানি, তবু—

No, no. Madhu You must go to England ! You have got talent—you must not spoil it !

ড্রামণ্ড সত্য সত্যই মধুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

বরাবর মধু ক্লাসে লেখাপড়ায় সেরা ছাত্র।

যেমন তীক্ষ্ণধী তেমনি বুদ্ধিমান।

মধু নিজেও জানত, তার বাবা রামপ্রাণ গুপ্ত বাধা দেবেন না। বাধা যদি আসে তো আমার মায়ের দিক থেকেই।

গ্লাসে বোতল থেকে মদ ঢালতে গিয়ে মধুর নজরে পড়লো সামনে দাঁড়িয়ে নীরজাসুন্দরী। যদিও এক ঘরে এক শয্যায় তারা শয়ন করে না, দু'জনের মধ্যে ব্যবহারটা কিন্তু অনেক সোজা হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে বেথুন স্কুলের ক্লাসের পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছিল—নীরজা খুব ভাল ভাবে পাস করেছে।

নীরজা!

বলুন।

কিছু বলবে?

না তো।

বোস ঐ চেয়ারটায়। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বসতে হবে না, আপনি বলুন আমি দাঁড়িয়েই শুনছি।

আমার বিলেত যাওয়ার ব্যাপারটা, তুমি তো শুনলে সব কথা—অবিশ্যি মাকে যখন কথা দিয়েছি, মা যতদিন বেঁচে আছেন হয়তো যেতে পারবো না—তবে এও আমি জানি মা শেষ পর্যন্ত সম্মত হবেনই, তোমার কি মনে হয় নীরু?

নীরু!

এমন ছোট্ট করে এত স্নেহকোমল কণ্ঠে আজ পর্যন্ত কখনো তো ডাকেন নি তাকে তার স্বামী! ঐ ছোট্ট ডাকটির মধ্যে দিয়ে নীরজাসুন্দরী যেন নতুন এক দিগন্তের সন্ধান পায়। কি এক পুলকশিহরণে তার সারা শরীরটা যেন সহসা কেঁপে উঠলো।

মনে হলো তার, ঐ সুর যেন শেষ না হয় কোন দিন। যতদিন সে বেঁচে আছে, ঐ সুরটি যেন তার দু'কান ভরে কেবল বাজতেই থাক।

নীরু! আবার ডাকল মধু।

বলুন।

তুমি—হ্যাঁ, তোমারও মত জানা প্রয়োজন। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

না।

সত্যি বলছো? মধু কথাটা বলে নীরজাসুন্দরীর মুখের দিকে তাকাল।

আপনি যা ভাল বুঝবেন নিশ্চয়ই করবেন, নীরজাসুন্দরীর বললে, আপনি আরো বড় হোন, আপনি সুখী হোন—সেটাই তো আমার সমস্ত অন্তরের কামনা।

কিন্তু তুমি তো জান, আমাদের সমাজ ব্যাপারটা মেনে নিতে চাইবে না কোনমতেই, আমাকে জাতিচ্যুত করবে সমাজপতিরা।

তা করুন। তাঁরা—

তাহলে তোমার কি হবে?

আমার! ঐ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

মধু বললে, বাঃ, আমার জাত গেলে তোমার জাতও তো যাবে। অবিশ্যি তুমি যদি আমার সঙ্গে ঘর করতে চাও—

আপনাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো! আপনার চরণের তলেই তো আমার স্থান।

জাত দেবে?

দোব।

দেবে!

নিশ্চয়ই দেবো।

মধুর কথাটা শুনে ভারি আনন্দ হয়। সে বললে, জান নীরু, অনেক দিনের ইচ্ছা আমার আমি ও-দেশে যাবো।

কথাটা মধুর শেষ হলো না, কমলাসুন্দরীর ঘর থেকে তার দাসী শ্যামা ছুটতে ছুটতে এলো, বৌরানী!

কি? কি হয়েছে শ্যামা?

মা—মা যেন কেমন করছেন, আপনি শীগগির আসুন।

নীরজাসুন্দরী তক্ষুনি শাশুড়ীর শয়ন-কক্ষের দিকে দ্রুতপদে চলে গেল। মধুও দ্রুতপদে নীরজাকে অনুসরণ করে।

কমলাসুন্দরীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো, কমলাসুন্দরী শয্যায় নিথর হয়ে পড়ে আছেন—দুটি চক্ষু মুদ্রিত।

মা। নীরজা ডাকলো।

কোন সাড়া এলো না কমলাসুন্দরীর দিক থেকে—কেবল চোখের পাতা দুটি সামান্য বিভক্ত হলো আর ঠোঁট দু'টি থিরথির করে কাঁপতে লাগল।

মধু মায়ের হাতটা তুলে নাড়ী পরীক্ষা করে ডাকে, মা—মাগো!

আর একটু তাকালেন মাত্র কমলাসুন্দরী, তাও যেন মনে হলো—কষ্টে তাকালো সে।

মা—কি কষ্ট হচ্ছে মা?

কমলাসুন্দরীর তখন কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আপনি শীগগিরি একজন বড় সাহেব ডাক্তার ডেকে আনুন, মধুর দিকে তাকিয়ে উৎকন্ঠিত ভাবে কথাটা বললে নীরজাসুন্দরী।

মধু আর দেরি করে না।

নীচে এসে কোচোয়ানকে দিয়ে গাড়ি জুড়িয়ে বের হয়ে গেল। ড্রামণ্ড সাহেব তাঁর বাংলোতেই ছিলেন, ডিনারের পর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সাহেব পড়াশুনা করতেন।

বেয়ারা রামরূপ চিনতো মধুকে।

প্রায়ই তো সে যেতো সাহেবের গৃহে।

রামরূপ শুধালো, কেয়াবাত বাবু?

সাহেব আছেন?

হ্যাঁ, তাঁর স্টাডিতে।

তাঁকে গিয়ে আমার কথা বলো, বলো বিশেষ দরকার—

রামরূপ ভিতরে গিয়ে একটু পরে ফিরে এলো, চলিয়ে—সাব বোলাতে হে!

গায়ে একটা ড্রেসিংগাউন, সামনে হুইস্কির গ্লাস, মুখে পাইপ সাহেব একটা আরামকেদারায় বসে বই পড়ছিলেন।

মধুকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, What's the matter my boy! এত রাত্রে?

স্যার, মা—আমার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে স্যার।

Ah, this late hour of night! কি হয়েছে কি?

মনে হচ্ছে cerebral হিমারেজ—দয়া করে একটিবার চলুন স্যার, মধু কেঁদে ফেললে।

ড্রামণ্ড সাহেব জানতেন মধু তার মাকে কি রকম ভালবাসে।

Don't worry my boy—একটু অপেক্ষা কর, আমি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি। সাহেব পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সাহেবের বেশী সময় লাগল না। খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এলেন।

গাড়িতে করে খিদিরপুরে পৌঁছাতেও বেশী সময় লাগল না।

সাহেবকে নিয়ে মধু ঘরে ঢুকে দেখলো—শয্যায় নিথর হয়ে মা চোখ বুজে পড়ে আছেন।

ড্রামণ্ড কমলাসুন্দরীকে পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন বিষণ্ণভাবে।

স্যার—

I am sorry my child—মনে হচ্ছে it's a case of Pontonic haemorrage I can't give you any hope. কোন আশাই দিতে পারছি না।

সাহেবের কথাই ঠিক হলো।

পরের দিন ভোরে কমলাসুন্দরীর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল, জ্ঞান আর ফিরে এলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

রামপ্রাণ গুপ্ত চুঁচুড়া থেকে ফিরে এলেন।

ব্যবসার একটা কাজে আগের দিন দ্বিপ্রহরে চুঁচুড়া গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন অবিশ্যি রাত আটটা নাগাদ ফিরবেন কিন্তু কাজে আটকে পড়ে ফিরতে পারেন নি।

স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ রামপ্রাণ গাড়ি থেকে অবতরণ করেই পেলেন।

গিন্নীমার খুব অসুখ—ভৃত্য বললে, রাত্রে সাহেব ডাক্তার এসেছিল।

রামপ্রাণ সোজা এসে স্ত্রীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন।

মৃতা কমলাসুন্দরীর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে নীরজাসুন্দরী ফুলে ফুলে কাঁদছিল, এবং শিয়রের ধারে বসে মধু।

সব দাসদাসীরা এসে ঘরের মধ্যে ভিড় করেছে।

সবাই কাঁদছে।

বাবা! মধু ডাকল।

চলে গেছে? রামপ্রাণ বললেন।

হ্যাঁ বাবা, এই কিছুক্ষণ হলো।

কি হলো হঠাৎ? কাল যাবার সময়ও তো আমার সঙ্গে কথা বলছিল?

হঠাৎ মাঝরাত্রে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন—মধু বললে।

রামপ্রাণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধীর পায়ে স্ত্রীর শেষ শয্যার পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে, মৃত্যু নয় যেন নিদ্রা, নিশ্চিন্তে যেন ঘুমিয়ে আছে কমলাসুন্দরী।

প্রশান্ত মুখখানা, কোথায়ও এতটুকু কুঞ্চন পর্যন্ত নেই।

কপালের সিন্দূরের গোলাকার টিপটা যেন জ্বলজ্বল করছে। সুদীর্ঘ জীবনের সাক্ষী। সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী। সেই কবে মাত্র আট বৎসর বয়েসে এই সংসারে এসেছিল—শাড়িটা পর্যন্ত পরতে পারত না—কোমরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়াত। যেন একটা কাচকড়ির পুতুল—যেমন গায়ের বর্ণ স্বর্ণচাপার মত তেমনি লক্ষ্মীর মত মুখশ্রী। রামপ্রাণের জননী জ্ঞানদাসুন্দরী বলতেন আমার মা লক্ষ্মী। অসম্ভব দুরন্ত ও চঞ্চল প্রকৃতির ছিল কমলাসুন্দরী। কতদিন তার পড়ার বই ছিঁড়ে ফেলেছে।

কালির দোয়াত ভেঙ্গেছে।

কত সময় রাগে রামপ্রাণ দুম্‌দুম্ করে কমলাসুন্দরীর পিঠে কিল বসিয়ে দিয়েছেন, কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞানদাসুন্দরীর কাছে গিয়ে নালিশ করেছে।

আমাকে মেরেছে—

কে মারল আমার মা-লক্ষ্মীকে?

তোমার ঐ ছেলেটা—

কেন ? মারল কেন ?

ওর দোয়াত ভেঙ্গে দিয়েছি।

অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করতো কমলা। কখনো মিথ্যা বলতো না।

আসুক ও, আমিও ওকে মারব—এসো তুমি, আমার কোলে এসো।

যেন ছায়াছবির মত অতীতটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে রামপ্রাণ গুপ্তর।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মৃতা স্ত্রীর ঠাণ্ডা হিম কপালের ওপরে হাত রাখলেন রামপ্রাণ, বললেন নিম্নকণ্ঠে, চলে গেলে কমলা, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে পারলে না !

কয়েকবার স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর যেমন নিঃশব্দে একটু আগে ঐ কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন—তেমনি নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

নীরজাসুন্দরী তখনো ফুলে ফুলে কাঁদছে।

২৪

সরস্বতী সন্তানসম্ভবা।

আনন্দচন্দ্রের মুখে কথাটা শুনে কুসুমকুমারীর মনের মধ্যে যে আনন্দ হওয় উচিত ছিল তা কিন্তু হলো না। বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা কিচকিচ করে বিঁধছে।

সে যে সন্তান দিতে পারলো না তার স্বামীকে, সেই সন্তান আজ এসেছে সরস্বতীর গর্ভে। সরস্বতী তার স্বামীর সন্তানের মা হবার অধিকার অর্জন করেছে।

সরস্বতী মা হতে চলেছে! তার স্বামীকে ও সেই সঙ্গে তার উর্ধ্বতন সাত পুরুষকে পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার করবে এক গণ্ডুষ জল দিয়ে। সরস্বতীই তার স্বামীর সত্যিকারের সহধর্মিণী।

সে যে বন্ধ্যা সেটা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে চলেছে। সে এক ব্যর্থ নারী এ সংসারে।

স্বামীর গৃহ ছেড়ে এসে এখন সে তার মায়ের গৃহে দেবতা গোপালের চরণে আশ্রয় নিয়ে মনপ্রাণ তার গোপালকে নিবেদন করেছিল।

পূজার মধ্যে দিয়ে সে তার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত দুঃখ গোপালের চরণেই অর্পণ

করেছিল। গোপালকেই সে সন্তান মনে করে তৃপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ বুঝতে পারছে—তার চাইতে বড় মিথ্যা বুঝি আর নেই।

গোপালকে সে তার চিরআকাঙ্ক্ষিত সন্তানের মত পায় নি বুকের মাঝখানটিতে।

গোপাল এক পাথরের নিষ্প্রাণ বিগ্রহই থেকে গিয়েছে।

আনন্দ বললে, কি ভাবছেন কাকীমা?

অ্যাঁ! চমকে উঠে কুসুমকুমারী বললে, কিছু বলছিলে আনন্দ?

বলছিলাম কি স্থির করলেন?

কিসের কি স্থির করবো আনন্দ?

কলকাতায় ফিরে যাবার কথা বলছিলাম কাকীমা—

না, আনন্দ।

কি, না?

আর সেখানে আমি ফিরবো না।

ফিরবেন না! কেন?

সরস্বতীকে দুঃখ করতে বারণ করো আনন্দ।

কিন্তু কাকীমা—

আমি আশীর্বাদ করছি সে স্বামী-পুত্র নিয়ে রাজেন্দ্রাণীর মত সংসার করুক। সংসার তারই—স্বামীও তার। সেখানে আমি গেলে মঙ্গল হবে না।

এ আপনি কি বলছেন কাকীমা? তা ছাড়া আমি যে অবস্থা তাঁর দেখে এসেছি—থেকেও যেন তিনি নেই সংসারের মধ্যে। এক উদাসিনী যোগিনী। না কাকীমা, আমার অনুরোধ, অভিমান করে আর দূরে থাকবেন না। আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে চলুন।

না।

কাকীমা—একটা কথা বলি, ছোট কাকীমার দেহের যা অবস্থা দেখে এসেছি, পুত্র-প্রসবের ধকলটুকুও মনে হয় না তিনি সহ্য করতে পারবেন। তিনি আপনারই ফেরার পথের দিকে চেয়ে আছেন। আপনি না ফিরে গেলে—

শরীর কি সত্যিই খুব খারাপ আনন্দ ছোটর?

আমি একজন ডাক্তার—আমার মনে হয়—

কি মনে হয় আনন্দ?

পুত্র-প্রসবের ধকল হয়ত সত্যিই তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন না।

তাহলে কি হবে আনন্দ?

আপনি প্রসবের সময় উপস্থিত থাকলে হয়ত মনের মধ্যে ছোট কাকীমা অনেকখানি বল, সাহস পাবেন।

বলছো ?

হ্যাঁ। আপনি আর অমত করবেন না—চলুন।

ঐ সময় পাশে এসে কুসুমকুমারীর মা শরৎশশী দাঁড়িয়েছিলেন, ওরা দেখতে পায় নি। শরৎশশী বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কুসুম যাবে বৈকি বাবা। এ সময় দূরে থাকা কি ওর পক্ষে সম্ভব ?

মা !

না কুসুম, এ সময় সেখানে না যাওয়াটা তোর আদৌ সংগত হবে না।

শরৎশশী বস্তুতঃ গোড়া থেকেই ব্যাপারটা ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। মেয়ের ঐভাবে স্বামীগৃহ থেকে চলে আসাটা কেন যেন তিনি ভালভাবে নিতে পারেন নি।

আর একটি সতীন এসেছে বলেই স্বামীগৃহ হতে চলে আসতে হবে, এ কেমন কথা ! এমনটা তো নিত্য ঘরে ঘরে ঘটে। কত মেয়ে দুই-তিনজন সতান নিয়েও স্বামীর ঘর করছে।

কিন্তু মা—

শরৎশশী মেয়েকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, না। কাল প্রত্যুষেই চলে যা কুসুম।

চলে যাবো ?

হ্যাঁ, যাবি বৈকি। এ কি মান-অভিমানের সময় কুসুম, ভুলে যাস নে তুই মেয়েমানুষ। স্বামীর মঙ্গলেই তোর মঙ্গল, স্বামী যাই করুন না কেন—স্ত্রীলোকের বড় ধর্ম আর নেই মা, আর বিবাহিতা স্ত্রীলোকের স্বামীর গৃহই তো একমাত্র স্থান। জীবনে-মরণে স্বামীই একমাত্র গতি।

মা—

লেখাপড়া শিখে তোর এমন মতিগতি হবে এ আমার ধারণারও অতীত ছিল।

শরৎশশী মেয়ের এভাবে চলে আসাটা প্রথম থেকেই ভালভাবে নেন নি। কিন্তু সাহস করে কথাটা এতদিন বলতে পারেন নি।

স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসার পর হতে কুসুমকুমারীর মনের মধ্যেও বুঝি শান্তি ছিল না।

চিরদিন শুনে এসেছে স্ত্রীলোকের স্বামীই ইহকাল পরকাল, তার কোন ত্রুটি বা দোষগুণের বিচার করার অধিকার স্ত্রীর নেই। তাছাড়া সেই তো আগ্রহ করে স্বামীর আবার বিবাহ দিয়েছিল।

স্বামীর বংশরক্ষা হবে না—সে তার স্বামীকে কোন সন্তান দিতে পারল না, কথাটা সর্বক্ষণ তার মনকে কি ক্ষতবিক্ষত করে নি? স্বামী কোনদিন তাঁর মুখে কথাটা প্রকাশ না করলেও তাঁর দুঃখটা কি কুসুমের অবিদিত ছিল?

আরো একটা কথা, যখনই তার মনে হয়েছে নিবারণচন্দ্র তার উপরে কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন—একান্ত সরল অসহায় মানুষটি—তার অবর্তমানে হয়ত কত অসুবিধা হচ্ছে।

যে মানুষ র সে আহারের কথা, স্নানের কথা স্মরণ করিয়ে না দিলে মনেই পড়তো না, তার অবর্তমানে কি ভাবে তাঁর দিন কাটছে—যখনই ভেবেছে কথাটা, কুসুম ছটফট করেছে। মনে হয়েছে যে আবার ফিরে যায়।

তাছাড়া সরস্বতীরই বা দোষ কি! সেই তো তাকে ঐ সংসারে এনেছিল! সে তো তারই ছোট বোনটি!

শরৎশশী আবার বললেন, আনন্দ, তুমি এসেছো বাবা খুব ভাল করেছো, ওকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও, আমি সব গোছগাছ করে দিচ্ছি।

পরের দিনই প্রত্যূষে আনন্দের সঙ্গে কুসুমকুমারী নৌকায় আরোহণ করে এবং বেলা চারটে নাগাদ বড়বাজারের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল।

সেখান থেকে পাল্কী ভাড়া করে কুসুমকুমারীকে পাল্কীতে বসিয়ে দিল। পাল্কী আগে আগে চলে—পিছনে পিছনে আনন্দ হেঁটে চলে।

কলুটোলায় নিবারণচন্দ্রর গৃহদ্বারে এসে যখন থামল, শীতের বেলা তখন শেষ হয়েছে, মুমূর্ষু দিবালোকে চারিদিক ম্লান।

কুসুম পাল্কী থেকে অবতরণ করে সর্বাঙ্গ একটা চাদরে ঢেকে অন্দরের পথে অগ্রসর হলো।

বাইরের ঘরে আনন্দ এসে প্রবেশ করল।

নিবারণচন্দ্র ফরাস-পাতা চৌকিটার উপরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, আনন্দকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তার দিকে মুখ তুলে তাকালেন নিঃশব্দে।

কাকীমাকে শান্তিপুর থেকে নিয়ে এলাম কাকাবাবু।

কাকীমা!

হ্যাঁ, নিয়ে এলাম কাকীমাকে।

ছোট বৌ বোধ হয় আর বাঁচবে না আনন্দ—

চমকে ওঠে আনন্দ নিবারণচন্দ্রর গলার স্বরে যেন, বলে, কি হয়েছে ছোট কাকীমার?

শেষ রাত থেকে প্রসব-বেদনা উঠেছে—এখনো কিছু হয় নি। মানদা দাইকে সকালেই আনিয়েছি, সে একটু আগে বলে গেল—

কি—কি বলে গেল দাই ?

গর্ভের সন্তানটি বোধ হয় তার বাঁচবে না, আর যদি বাঁচেও, ছোট বৌকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে কি না—

আমি হাসপাতাল থেকে একজন ধাত্রীবিদ্যায় বিশারদ ডাক্তারকে ডেকে আনবে কাকাবাবু ?

কি বলছো তুমি আনন্দ ? পুরুষ-ডাক্তার আসবেন প্রসব করাতে এ বাড়িতে।

তাতে কি ?

না না, লোকে শুনলে বলবে কি ?

এ আপনাদের একটা মিথ্যা সংস্কার কাকাবাবু। আজকের দিনে এ সংস্কার অর্থহীন।

না, না আনন্দ—

কাকাবাবু, একটা মানুষের জীবনের দাম বেশী, না সংস্কারের ?

অন্দরে পা দিয়েই সংবাদটা পেয়েছিল কুসুমকুমারী।

ভোররাত্রি থেকে সরস্বতীর প্রসববেদনা উঠেছে। মানদা দাইকে ডাকা হয়েছে—এখনো কিছু হয় নি। সরস্বতী ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

কুসুম আর দেরি করে না, পথের জামাকাপড় ছেড়ে সোজা চলে যায় যে ঘরে সরস্বতী ছিল।

ঐ প্রাসাদোপম বাড়ির মধ্যে ঐ ঘরটিই নীচের তলায় একেবারে একধারে—চিরদিন পরিত্যক্তই থাকে। ঘুপচি ঘুপচি গোটা দুই জানালা—ঘরের মধ্যে বাইরের আলো প্রবেশ করে না বললেই চলে। অন্ধকার—বাতাস একেবারেই খেলে না। সেই স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘরের মেঝেতে সরস্বতী নির্জীবের মত পড়েছিল, ঘরের এক কোণে প্রদীপদানে একটি প্রদীপ জ্বলছিল মিটিমিটি করে।

ঘরের সর্বত্র একটা ঝাপ্‌সা আলোছায়া। শ্বাস যেন রুদ্ধ করে আনে ঘরের রুদ্ধ বাতাস।

মানদা দাই একপাশে চুপটি করে বসেছিল।

মধ্যে মধ্যে ব্যথা যখন আসছে, সরস্বতীর দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মানদা সরস্বতীর কোমরে হাত বুলোচ্ছে।

কুসুমকুমারীর কি জানি কেন দুটি চক্ষুর কোণে জল এসে যায়।

কুসুমকুমারী ডাকল, ছোট!

কে? সরস্বতী চক্ষু মেলে তাকাল।

ছোট, আমি—

এসেছো ছোড়দি?

কুসুমকুমারী এগিয়ে গিয়ে শায়িতা যন্ত্রণাকাতর সরস্বতীর পাশটিতে বসলো; তার গায়ে একটা হাত রাখল, খুব কষ্ট হচ্ছে ছোট?

না, ছোড়দি। কিন্তু তুমি—

কি আমি রে?

আবার আমাদের ফেলে চাল যাবে না তো?

না রে না।

সত্যি বলছো?

সত্যি বলছি—আর যাবো না।

না—ওঁকে ফেলে আর যেও না। উনি যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই এ সংসারে জানেন না। তুমি চলে গেলে তারপর একদিনও ভাল করে খান নি—! রাত্রে ঘুমান নি। আমার ভয় করতো—লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল কাঁদতাম।

এখন আর কথা বলিস না।

একটা বোধ হয় ব্যথার ঢেউ আসছিল, দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত মুঠিতে কুসুম-কুমারীর একটা হাত চেপে ধরল সরস্বতী।

তারপর সারাটা র‍্যাত্রি অতিবাহিত হলো—সরস্বতীর সন্তান আর ভূমিষ্ঠ হয় না। ব্যথায় সে কাতরাতে থাকে কেবল। কুসুমকুমারী শঙ্কিত হয়ে উঠে।

সে এবার স্বামীর ঘরে ছুটে যায়।

নিবারণচন্দ্র শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর বসেছিলেন স্তব্ধ হয়ে।

শুনছো!

কে, মেজো বৌ?

হ্যাঁ।

তুমি—তুমি কখন এলে?

কেন, আনন্দর সঙ্গে এসেছি!

কই আনন্দ তো কিছু বললো না আমায়—

সে-সব কথা পরে হবে, তুমি তাড়াতাড়ি একজন সাহেব ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাও—ছোটর অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না।

সাহেব ডাক্তার ?

হ্যাঁ।

কি বলছো তুমি মেজ বৌ ?

ঠিকই বলছি—সংস্কার বড়, না ছোট বৌয়ের প্রাণটা বড় ?

কিন্তু মেজ বৌ—

আমি বলছি আর দেরি করো না। আনন্দকে ডেকে আমার কথা বলে মেডিকেল কলেজ থেকে একজন সাহেব ডাক্তারকে ডেকে আনতে বলো।

নিবারণচন্দ্র তখনো ইতস্ততঃ করছেন।

প্রসব করাতে সাহেব ডাক্তার আসবে, এ যে তাঁর চিন্তারও অতীত।

কোনদিন যা আজ পর্যন্ত হয় নি তাই আজ—

কাজটা কি ভাল হবে মেজবৌ ?

ঠিক আছে, আমিই বাইরের ঘরে আনন্দকে গিয়ে বলছি। কুসুমকুমারী আর দাঁড়াল না—ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আনন্দ জেগেই ছিল।

সারাটা রাত তারও ঘুম হয় নি।

ছোট কাকীমার যে এখনো কিছু হয় নি সে বুঝতেই পারছিল। সে চিন্তিত হয়েছিল আরো বেশী একজন পাস-করা ডাক্তার বলে।

কুসুমকুমারীকে ঘরে ঢুকতে দেখে আনন্দ বললে, কি হলো কাকীমা ?

এখনো কিছু হয় নি আনন্দ। ছোট ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে—তুমি এক কাজ কর—

কি করতে হবে আমায় বলুন ?

তোমাদের হাসপাতালে গিয়ে একজন সাহেব ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।

আমি কথাটা অনেক আগেই কাকাবাবুকে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না কিছুতেই।

বুঝতেই পারছো, সাহেব ডাক্তার আসবে সন্তান ভূমিষ্ঠ করাতে—

কিন্তু প্রয়োজনের কাছে তো কাকীমা ওসব ভাবলে চলবে না!

ঠিক। তুমি যাও তাড়াতাড়ি—

আনন্দ জামাটা গায়ে দিয়ে তখুনি বের হয়ে গেল।

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে সাহেব ডাক্তার এলেন আনন্দর সঙ্গে।

কুসুমকুমারীই সংবাদটা পেয়ে বাইরে এসে সাহেব ডাক্তারকে অন্দরে ডেকে নিয়ে গেল।

ছোট অপরিসর অস্বাস্থ্যকর ঘরটার মধ্যে ঢুকেই তো সাহেব ভ্রূ কোঁচকালেন, What's this ? এই ঘরে delivery হবে—most unhygenic ! Open all the windows—আলো আসতে দাও ঘরে।

কুসুমকুমারী নিজেই জানালাগুলো খুলে দিল।

সাহেব ডাক্তার ফরসেপসের সাহায্যে প্রসব করালেন বটে—সন্তানটি বাঁচলেও সাহেব বুঝতে পারলেন প্রসূতিকে বাঁচানো যাবে না।

তার তখন শেষ অবস্থা।

সরস্বতী টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ছেলে হয়েছে—ছেলে হয়েছে !

শঙ্খধ্বনিতে সারা বাড়ি মুখর হয়ে উঠলো।

সারা বাড়িতে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

ছোড়দি ! ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল সরস্বতী।

ছোট !

কি হয়েছে ছোড়দি ?

তোর ছেলে হয়েছে ছোট—সোনার চাঁদ ছেলে রে—দেখবি ছেলে ?

জবাব দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারল না সরস্বতী, বার-দুই টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিল, তারপর তার মাথাটা কুসুমকুমারীর কোলে ঢলে পড়ল।

ছোট ! অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে কুসুমকুমারী।

সাহেব ডাক্তার তখনো যান নি। বাইরের ঘরে নিবারণচন্দ্রর সঙ্গে কথা বলছিলেন, পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ।

সাহেব ডাক্তার বলছিলেন, হাসপাতালে ভর্তি করতে পারলেই ভাল হতো—She requires saline—

কিন্তু সাহেব ডাক্তারের কথা শেষ হলো না, মানদা দাই ছুটে এলো, সাহেব শীগগিরি চল—ছোট মা কথা বলছেন না !

সাহেব তখুনি ত্বরিত পদে ছুটে গেলেন।

কুসুমকুমারীর কোলে তখনো সরস্বতীর মাথাটা।

সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন, She is dead.

মারা গেছে ? কুসুমকুমারীর কণ্ঠ হতে কোনমতে শব্দটা বের হলো।

সাহেব বললেন, I am sorry, Madam, she is dead.

সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। দরজার গোড়াতেই আনন্দ দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে সাহেব বিষণ্ণভাবে বললেন, I am sorry, Mr. Gupta—

She is dead.

মারা গেছেন !

হ্যাঁ। আমি কিছুই করতে পারলাম না—এত দেরি করে তোমরা আমায় ডেকে এনেছো !

পরিপূর্ণ বিষাদের ছায়া বাড়িটার মধ্যে নেমে এলো। আনন্দর সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিরানন্দ। কুসুমকুমারী তখনো মৃতা সরস্বতীর দেহটা কোলে নিয়ে পাথরের মতই বসে আছে। সরস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন সরস্বতী ঘুমোচ্ছে। পরম নিশ্চিন্তে কুসুমকুমারীর কোলে মাথাটা রেখে ঘুমাচ্ছে।

সরস্বতীর মৃত্যুশীতল কপালে হাত বুলাতে বুলাতে কুসুমকুমারী বললে, এমনি করে আমার উপর তুই শোধ নিয়ে গেলি ছোট ! আমাকে ক্ষমা চেয়ে নেবার অবকাশটাও দিলি না !

নবজাত শিশু মানদা দাইয়ের কোলে চিৎকার করে কান্না শুরু করেছে।

বাইরের ঘরে ফরাসের উপর বসেছিলেন নিবারণচন্দ্র যেন প্রস্তরমূর্তির মত।

সরস্বতীকে বোধ করি তিনিই হত্যা করলেন। স্ত্রীর অধিকার দিয়ে বিবাহ করে এনেছিলেন, কিন্তু সে অধিকারের মর্যাদা তিনি কতটুকু রেখেছেন। আদর করা দূরে থাক—নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কখনো একটার বেশী দুটো কথা বলেন নি তার সঙ্গে। শেষদিকে তো কাছে এলেও সরস্বতী বিরক্ত হতেন নিবারণচন্দ্র। কেন—কি অপরাধ ছিল তার ?

তবু—তবু সে তার কর্তব্যটুকু পালন করে গিয়েছে।

এ সংসারের দাবিটি সে পূরণ করে দিয়ে গেল।

এ বংশের উত্তর পুরুষকে সে জন্ম দিয়ে গেল।

সাহেব ডাক্তার স্পষ্টই বলে গেলেন, নিতান্ত অবহেলা করে সরস্বতীকে তাঁরা মেরে ফেললেন। সাহেব ডাক্তার চলে যাবার পর হতেই নিবারণচন্দ্রর মনের মধ্যে যে কথাটা ঘোরাফেরা করছিল—সেটা তাঁর তিন-তিনবার বিবাহ। বিদ্যা-সাগর মশাই যেটা বলেছেন, বহুবিবাহ সমাজের একটা কুপ্রথা। এদেশে বহু-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলে আসছে। নিবারণচন্দ্র নিজেও এই বহুবিবাহ প্রথা বিশেষ করে কুলীনদের মধ্যে যা প্রচলিত, সেটাকে ঘৃণ্য ও দূষণীয়ই মনে করে এসেছেন।

নিজে একজন আইন-ব্যবসায়ী হয়ে মনে মনে ভেবেছেন, রাষ্ট্রীয় আইন তৈরী করে ঐ প্রথার মূলোচ্ছেদ করা আশু কর্তব্য।

কিন্তু নিজের বেলা সে কথাটা তাঁর মনে হয় নি।

তিনি নিজে একজন কুলীন বলে, অন্যায় অশোভন জেনেও বার বার তিনবার বিবাহ করেছেন। অবিশ্যি মনের মধ্যে তাঁর প্রবল একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল—পুত্র-লাভ, বংশরক্ষা। আর সেই বংশরক্ষা করার জন্য সরস্বতীকে তৃতীয়বার বিবাহ করলেন।

মুখে তিনি কসুমকুমারীকে যাই বলুন না কেন, অচেতন মনে যে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল—সেই আকাঙ্ক্ষাই কি তাঁকে তৃতীয়বার বিবাহে অনুপ্রাণিত করে নি?

কি এমন ক্ষতি হতো যদি নাই হতো তার বংশরক্ষা?

সমস্ত ব্যাপারটাই হিন্দুধর্মের একটা অন্ধ কুসংস্কার বই তো নয়!

বড় বৌ রত্নাবতী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

নিবারণচন্দ্র যেন একটু বিস্মিতই হন।

এ ঘরে তো কখনো রত্নাবতী পা দেয় না। কেবল এই ঘরই বা কেন, দ্বিতীয়বার কুসুমকুমারীকে যেদিন নিবারণচন্দ্র বিবাহ করে এনে এই গৃহে তুললেন, সেই থেকেই রত্নাবতী যেন ঠাকুরঘরের মধ্যে নিজেকে নির্বাসিত করেছিল।

ঠাকুর আর ঠাকুরপূজা নিয়েই থাকতো সর্বদা রত্নাবতী।

সংসারের কোন ব্যাপারেই আর সে ছিল না।

বাড়ির মধ্যে থাকলেও তাকে বড় একটা দেখাই যেতো না—তার গলাও শোনা যেত না।

নিবারণচন্দ্রর সঙ্গেও তো কতদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। নিবারণচন্দ্র বোধ করি রত্নাবতীকে একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলেন।

বড় বৌ!

হ্যাঁ, আমি। এটা তো শোকের সময় নয়—বাড়ির মধ্যে কতক্ষণ আর মৃতদেহ পড়ে থাকবে? মৃতদেহ সৎকারের একটা ব্যবস্থা কর!

হ্যাঁ। যেন নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এলেন নিবারণচন্দ্র। বললেন, ঠিকই বলেছো—

ছোট বৌ ভাগ্যবতী, তোমার এতদিনকার পুত্রের সাধ মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার সৎকার যেন সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। তুমি আর বসে থেকো না—সব ব্যবস্থা করো।

বড় বৌ!

কি বলছো?

মেজ বৌ কোথায়?

সে তো ছোট বৌয়ের মৃতদেহটা কোলে করে বসে আছে এখনও। কথাগুলো বলে রত্নাবতী আর দাঁড়াল না—কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

মুহুরী হরিপদকে ডেকে পাঠালেন ভৃত্য শম্ভুচরণকে দিয়ে, হরিপদকে এ ঘরে পাঠিয়ে দে শম্ভু!

একটু পরে শম্ভুচরণের সঙ্গে মুহুরী হরিপদ এসে ঘরে ঢুকলো, আমাকে ডেকেছেন বাবুমশাই?

হ্যাঁ, সব তো শুনেছো!

আজ্ঞে।

আনন্দ বোধ হয় তার ঘরেই আছে, তাকে সঙ্গে করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার ও সৎকারের ব্যবস্থা করো।

যে আজ্ঞে।

টাকাপয়সা আছে তো?

আজ্ঞে আছে।

হরিপদ ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিল, নিবারণচন্দ্র আবার ডাকলেন, শোন, যাত্রার আগে আমাকে জানিও—আমিও শ্মশানে যাবো।

আপনি?

হ্যাঁ, আমাকেই তো তার মুখাগ্নি করতে হবে।

মানদা দাই কিছুতেই নবজাত শিশুটিকে শান্ত করতে পারছিল না।

রত্নাবতী এসে ঘরে ঢুকলো, আহা রে বাছা রে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাকে হারালো। এক কাজ কর্ দেখি দাই—পলতে করে ওকে একটু দুধ খাওয়া।

মানদা দাই বললে, তাই দাও দেখি একটু দুধ পাঠিয়ে, বোধ হয় ক্ষিদেই পেয়েছে।

রত্নাবতী নিজে গিয়ে রূপোর বাটিতে দুধ নিয়ে এলো।

মানদা দাই একটা সলতে পাকিয়ে সেটাই দুধে ভিজিয়ে শিশুর ঠোঁটের কাছে ধরতেই চুক চুক করে শিশু সলতে চুষতে লাগল।

শিশুর কান্না থেমে গেল।

হ্যাগা বড়মা, আমি কি বাচ্চাকে নিয়ে এই ঘরেই থাকবো?

তা বাছা অন্ততঃ তিনটে দিন তো এই ঘরেই থাকতে হবে।

ঠিক আছে, তাই থাকবো। তুমি বিছানা একটা পাঠিয়ে দিও।

কুসুমকুমারী একই ভাবে মৃতার মাথাটা কোলে নিয়ে একপাশে বসেছিল।

রত্নাবতী এসে পাশে দাঁড়াল, আর বসে থেকে কি হবে মেজ? এবার উঠে ওকে সাজিয়ে নে!

কুসুমকুমারী বড় বৌয়ের মুখের দিকে তাকাল।

তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে।

তুমি ছোটকে সাজিয়ে দাও বড়দি, আমি পারবো না।

পারবো না বললে তো হবে না ভাই।

না, না, না—আমি পারবো না, আমাকে মেরে ফেললেও পারবো না বড়দি।

ওর শাড়ি-টাড়ি কোথায় কি আছে, আমি তো কিছুই জানি না মেজ।

আমি এনে দিচ্ছি। কুসুম বললে।

মাথাটা মেঝের ওপরে মাদুরের উপর নামিয়ে দিয়ে কুসুমকুমারী ছোট বৌয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিবাহের সময় তাকে যে পোর্টমাণ্টোটা দেওয়া হয়েছিল, কুসুম-কুমারী দেখলো তার গায়ে তালায় চাবি দেওয়া। সেই ঘরেরই শয্যার উপাধানের তলায় চাবির গোছাটা ছিল, সেটা বের করে এনে কুসুম ডালাটা খুলে ফেললো চাবির সাহায্যে।

বিবাহের সময় এ বাড়ি থেকেই দামী দামী বেনারসী শাড়ি দেওয়া হয়েছিল সরস্বতী যত দিন বেঁচে ছিল কোন দিন তার একটাও ব্যবহার করে নি। যেমন পাট করা দেওয়া হয়েছিল তেমনি পর পর পাট করা সাজানো।

তারই ভিতর থেকে লাল রঙের বড় বড় সোনালী ফুল ও কল্কা তোলা একটা শাড়ি বের করে নিল কুসুম—আলতার শিশি, সিঁদুরের গাছকৌটা—সবকিছু নিয়ে আবার আঁতুড়ঘরে গেল।

রত্নাবতী দাঁড়িয়ে ছিল—তার সামনে সব নামিয়ে রাখল কুসুম নিঃশব্দে।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে দাহকারীরাই সরস্বতীর মৃতদেহ ধরাধরি করে বহিরাঙ্গনে খাটিয়ার উপর এনে শুইয়ে দিল। পরনে লাল টকটকে বেনারসী শাড়ি—পায়ে রক্তের মত লাল আলতা—কপাল ও সিঁথিতে সিন্দুর, রাজরাজেশ্বরীর মতই যেন দেখাচ্ছিল সরস্বতীকে।

মৃত্যু নয়—নিদ্রা—

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল আনন্দচন্দ্র।

তার মনে হচ্ছিল—এই মৃত্যু!

জীবনের শেষ!

সবে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা দিয়েছিল সরস্বতী। এই বয়েসেই সে

চলে গেল। ও যেন এই সংসারে এসে প্রবেশ করেছিল বিশেষ একটি প্রয়োজন সম্পন্ন করতে, প্রয়োজন শেষ হলো চলে গেল।

সবারই একদিন মৃত্যু হয়—এই জাগতিক নিয়ম।

কিন্তু এই এত অল্পবয়সে মৃত্যুটা যেন বড় মর্মান্তিক।

এই বয়সেই বা কেন—মৃত্যু সর্বদাই বুঝি মর্মান্তিক।

বড় নিষ্ঠুর।

আনন্দচন্দ্র যেন দেখতে পেল কালো একটা ছায়া কুয়াশার মত সরস্বতীর চারপাশে তাকে ঘিরে রেখেছে।

সে ছায়ার একটা রূপ আছে।

সে রূপ বড় নিষ্ঠুর।

সেন মশাইও অল্প দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—ঐ মৃতের মুখখানির দিকে তাকিয়ে।

তাঁর যেন মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, সে মুখে অনেকখানি অভিমান!

ক'টা দিনই বা ছিল এই সংসারে?

বোধ করি এই বংশের কাছে কিছু ঋণ ছিল, সেই ঋণটুকু পরিশোধ করতেই যেন এসেছিল সে এ সংসারে।

মনে মনে বার বার বলতে লাগলেন সেন মশাই, ক্ষমা করো—ছোটবৌ আমায় ক্ষমা করো।

চমক ভাঙলো মিলিত হরিধ্বনিতে—দাহকারীরা খাটিয়া স্কন্ধে তুলে নিয়েছে, হরিবোল, হরিবোল।

সেন মশাইয়ের চোখের কোণ দুটি ঝাপসা হয়ে যায়।

২৫

শবযাত্রীদের পিছনে পিছনে নিবারণচন্দ্রও শ্মশানে এসে পৌঁছালেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম আকাশকে আবির রঙে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্যদেব তখন পাটে বসেছেন। গোধূলির ম্লান রক্তিম আলোয় আকাশ বিষণ্ণ। শ্মশানযাত্রীরা দাহকার্যের ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

নিবারণচন্দ্র এসে গঙ্গার ধার ঘেঁষে একটি নির্জন জায়গায় উপবেশন করলেন।

এই তো সংসার! এই হল মানুষের জীবন! আজ আছে কাল নেই!

আজ যে হেসে কথা বলছে কাল হয়ত সে থাকবে না। কেবল দু'দিনের মায়ার খেলা—

আমার স্ত্রী—আমার স্বামী—আমার পুত্র—আমার কন্যা। মায়ায় আবদ্ধ জীব। কিই বা বয়স হয়েছিল সরস্বতীর—মনের পাতায় নিবারণচন্দ্রের ভেসে ওঠে একখানি অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখ।

ফুলশয্যার রাত্রি।

কুসুমকুমারীই নিজের হাতে সেরাত্রে সরস্বতীকে সাজিয়ে স্বামীর ঘরের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলেছিল, যা ঘরে যা। সরস্বতী কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো। তখন কুসুমকুমারীই সরস্বতীকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরের দরজায় বাইরে থেকে কপাট দুটো টেনে দিয়েছিল। সে জানত না নিবারণচন্দ্র সে ঘরে নেই।

সত্যিই সে সময় নিবারণচন্দ্র বহির্মহলে তাঁর কাছারিঘরে বসেছিলেন।

একাকী চুপটি করে চৌকির উপরে ফরাসের উপর বসেছিলেন নিবারণচন্দ্র। হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় কুসুমকুমারী সেই ঘরে এসে ঢুকতেই উপবিষ্ট নিবারণ-চন্দ্রকে সে দেখতে পেয়েছিল।

এ কি—তুমি এখানে বসে আছো, আমি ভেবেছিলাম তুমি শয়নঘরে!

নিবারণচন্দ্র কুসুমকুমারীর মুখের দিকে তাকালেন।

ছিঃ ছিঃ, তুমি এখনো এখানে বসে আছো আর আমি সরস্বতীকে তোমার ঘরে দিয়ে এলাম। ওঠো চল—রাত অনেক হয়েছে।

কুসুম!

কি?

এ তুমি কি করলে কুসুম?

আমি তোমার সহধর্মিণী, সহধর্মিণীর কর্তব্যটুকুই পালন করেছি মাত্র। তা ছাড়া তোমার মত নিয়েই তো যা করবার করেছি।

না না কুসুম, আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল।

ছিঃ, ওকথা বলো না।

আমি যে কিছুতেই মন থেকে ওকে গ্রহণ করতে পারছি না মেজবৌ।

ভুলে যেও না—তুমি সরস্বতীকে বিবাহ করেছো। ও তোমার স্ত্রী। চল ওঠো, ঘরে চল।

নিবারণচন্দ্রের দ্বিধা তবু যায় না। কুসুমই তখন স্বামীর হাত ধরে তুলে শয়ন-ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে শিকল খুলে দেয়। বলে, যাও ভিতরে যাও, ওকে বঞ্চনা করো না। যাও।

নিবারণচন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন।

ঘরের এক কোণে দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছিল। সেই মৃদু আলোয় নিবারণচন্দ্র দেখলেন, পালঙ্কের পাশে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠনবতী সরস্বতী।

ক্ষণকাল ইতস্তত করলেন, তারপর এগিয়ে গিয়ে অবগুণ্ঠনবতী সরস্বতীর সামনে দাঁড়ালেন।

হাত বাড়িয়ে গুণ্ঠন তুলে দিলেন সরস্বতীর।

চন্দনচর্চিত কপাল, তার মধ্যে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে গোলাকার সিন্দূরের টিপটি।

নিমীলিত দুই চক্ষুর কোণ বেয়ে অশ্রুর ধারা।

কেমন যেন মায়া হলো নিবারণচন্দ্রের।

সেই মুহূর্তে সত্যিই তাঁর মনে হয়েছিল, তাই তো, ওর কি দোষ। ঐ বালিকার তো কোন দোষ নেই।

নিবারণচন্দ্র তাকিয়ে ছিলেন সম্মুখে দণ্ডায়মানা সরস্বতীর দিকে। কিশোরীর দেহ ছুঁয়ে তখন সবে বুঝি যৌবন জেগে উঠছে। সেই সদ্য জাগা যৌবনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা যেন জেগে উঠলো। মুহূর্তে সেই দেহবল্লরী যেন তাঁর মনের মধ্যে কি এক কামনা জাগায়।

সরস্বতী কাঁপছিল।

নিবারণচন্দ্র আরো দু'পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে সরস্বতীর অতি সন্নিকটে দাঁড়ালেন। তারপর সরস্বতীর দিকে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটি পরম স্নেহে ঈষৎ তুলে ধরলেন।

সরস্বতী কাঁদছিল। প্রবহমাণ অশ্রুর ধারা তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করে দিচ্ছিল। দু'বাহুর মধ্যে টেনে নিলেন সেই কম্পমান দেহবল্লরী নিবারণচন্দ্র। সরস্বতীর মাথাটা তাঁর বিশাল বক্ষের ওপরে এলিয়ে পড়ল।

কই, তখন তো একটিবার কুসুমকুমারীর কথা মনে হয় নি তাঁর?

আপনা হতেই যেন নিবারণচন্দ্রর দৃষ্টি অদূরে প্রসারিত হলো—যেখানে খাটিয়ার উপরে সরস্বতীর মৃতদেহটা শেষ শয়নে শায়িত। কিন্তু স্পষ্ট কিছু চোখে পড়লো না গোধূলির আবছা আলোছায়ায়।

কেবল কিছু দূরে প্রজ্বলিত একটি চিতার রক্তাভ আলোকে অস্পষ্ট সব মনে হচ্ছিল।

নিবারণচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে প্রবহমাণ গঙ্গার জলরাশির দিকে তাকালেন। প্রকৃতির বুক থেকে আলোর শেষ বিন্দুটুকুও তখন মুছে গিয়েছে।

জল নয়, একটা ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকার দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করে তোলে। আর

কানে আসে একটা মৃদু স্রোতের শব্দ। ভাগীরথী বহে চলেছে—কল কল ছল ছল শব্দে।

ক্লান্তিহীন অনন্ত স্থায়ী একটা শব্দ।

ওপারে অন্ধকার।

কাকামশাই!

কে?

আমি।

আনন্দ? কিছু বলছো?

হ্যাঁ—মুখাগ্নি করতে হবে যে।

আমাকেই করতে হবে?

হ্যাঁ, আপনিই একমাত্র কাকীমার মুখাগ্নির অধিকারী।

আমিই!

হ্যাঁ আপনিই—আপনাকেই মুখাগ্নি করতে হবে।

নিবারণচন্দ্র আর কোন প্রতিবাদ তুললেন না। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন।

মুখাগ্নির পূর্বে কিছু করণীয় ছিল, একে একে সব সম্পন্ন করলেন নিবারণচন্দ্র। তারপর চিতায় শায়িতা সরস্বতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রজ্বলিত প্যাকাটির গোছা হাতে নিয়ে।

হস্তধৃত প্যাকাটির আলোয় সরস্বতীর মুখখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

সরস্বতী যেন ঘুমিয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে।

ইহজগতের সকল দুঃখকে অতিক্রম করে এক পরম শান্তির জগতে পাড়ি দিয়েছে। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন নিবারণচন্দ্র, তারপর প্রজ্বলিত প্যাকাটির গোছা সরস্বতীর মুখের কাছে ধরে মনে মনে বললেন, ক্ষমা করো সরস্বতী—তুমি আমায় ক্ষমা করো।

রাত্রির তৃতীয় যামে শবদাহ শেষ করে সকলে আবার গৃহে ফিরে এলো।

অন্দরে প্রবেশের মুখে নিবারণচন্দ্রর কানে এলো এক শিশুর কান্না। নবজাত শিশুটি কাঁদছে।

বেচারী মা কি তা জানতেই পারল না!

জন্মমুহূর্তেই মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো!

সিক্ত বস্ত্র পরিবর্তন করে নিবারণচন্দ্র শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করতেই বড় বৌ এসে ঘরে প্রবেশ করল, হাতে তার শ্বেতপাথরের গ্লাসে মিছরির সরবৎ।

এক মাস দশ দিন হবে।

কি হয়েছিল ?

সেরিব্রাল হিমারেজ।

তারপরই একটু হেসে মধু বললে, আমি সামনের মাসে বিলাত যাচ্ছি আনন্দ

বিলাত ?

হ্যাঁ—আরো পড়াশুনা করতে।

তোমার বাবার সম্মতি পেয়েছো ?

হ্যাঁ। আপত্তি ছিল মায়ের, তা তিনি—

আচ্ছা চলি ভাই—আনন্দ বললে।

একদিন খিদিরপুরে আমাদের গৃহে এসো না ?

আমি কালই গ্রামে ফিরে যাচ্ছি মধু।

কালই ?

হ্যাঁ—তা ছাড়া তুমি জান না মধু, আমার পিতৃদেব স্বর্গে গিয়েছেন।

সে কি—কবে ?

মাস তিনেক হলো। বুঝতেই পারছো সমস্ত সংসারটা এখন আমার মাথার ওপরে। তাই যত তাড়াতাড়ি পারি গ্রামে বসে ডাক্তারী শুরু করতে হবে। আচ্ছা চলি।

আমিও তো চললাম।

ভাল কথা, তুমি আর দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ, কিছুদিন আগে ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম সস্ত্রীক।

তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ—কতকটা তো তারই ইচ্ছায় যেতে হয়েছিল।

মধু গুপ্ত চলে গেল।

আনন্দচন্দ্র তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনন্যোপায় মাইকেলের স্ত্রী আঁরিয়াতের কলকাতার বাস উঠিয়ে দিয়ে পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিয়ে স্বামীর কাছে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ ছিল না তাঁর সামনে।

১৮৬২, ৯ জুন মাইকেল বিলাত যাত্রা করেন এবং জুলাই মাসের শেষে ইংলণ্ড পৌঁছান। তখনকার দিনে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ড যেতে দীর্ঘ সময় লাগত।

বিলাত যাত্রার পূর্বে তাঁর সম্পত্তি ইত্যাদির বিনিময়ে যে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা

করে গিয়েছিলেন—সেটা আদৌ কার্যকর হয় নি। যাঁরা তাঁকে তাঁর সম্পত্তির বিনিময়ে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি। তাই পুত্রকন্যাদের নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর পর মাইকেলকে গভীর আর্থিক সঙ্কটে পড়তে হয়। ১৮৬৩ মে আঁরিয়েত পুত্রকন্যাদের নিয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছান। মাইকেল অনন্যোপায় হয়ে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে প্যারিসে চলে যান। পরে সেখান থেকে যান ভার্সাইয়ে। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের কোন সুরাহা হয় না।

কলকাতা থেকে গিয়ে গ্রামে ডাক্তারী করতে বসলেও আনন্দচন্দ্র কবির সমস্ত সংবাদই রাখতো, তিনিও যশোরবাসী ছিলেন বলে।

অত বড় বিরাট একটা প্রতিভা—আনন্দচন্দ্রের মনে হয়েছে, প্রকাশের পথ না পেয়ে যেন কি এক দুর্নিবার আক্রোশে নিজের মধ্যেই যেন নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের প্রীতি ও সৌহার্দ্য না পেলে কবিকে হয়ত বিদেশে বিভূঁয়েই অনাহারে অপমৃত্যুর মুখোমুখি হতে হতো।

কবিও জানতেন ভারতবর্ষে যদি সত্যিকারের কোন শুভার্থী বা আপনজন তাঁর থাকেন তো ঐ একমাত্র বিদ্যাসাগরই, তাই বোধ হয় তিনি শেষ পর্যন্ত কোথাও কোন আশার ক্ষীণতম আলোও না দেখতে পেয়ে বিদ্যাসাগরকেই পত্রে তাঁর দুর্দশার কথা জানিয়েছিলেন—

You are the only friend who can rescue me from the painful position in which I have been brought, and in this you must go to work with the grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart.

এবং দ্বিতীয় পত্রে লিখেছিলেন—Just two years ago I left Calcutta. How did I think that I should be subjected to so much degradation and suffering…I shall stop with the pleasing hope of being in the hands of a real friend & righteous man.

কবি তাঁর তৃতীয় চিঠিতে লেখেন বিদ্যাসাগরকে—

I hope I shall not have to cry out with Rama in my poem of Meghanada "বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমাকে"……I hope you will write to me in France and that I shall have to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagar, but Karunasagar (করুণা-সাগর) also.

মধুসূদনের পত্র পাওয়া মাত্রই বিদ্যাসাগর মাইকেলকে ১৫০০ শত টাকা পাঠিয়ে দেন।

সে এক চরম মুহূর্ত কবির জীবনে।

বাইরে দারুণ শীত। ঘরে চুল্লী জ্বলছে না, কনকনে ঠাণ্ডা, তার উপর গত চার দিন ধরে তাঁদের প্রায় সকলের অনাহারে কাটছে।

এমন সময় আঁরিয়ত এসে স্বামীর কাছে দাঁড়াল।

কিছু বলবে আঁরিয়ৎ ?

ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চায়। কিন্তু আমার কাছে রয়েছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক। বলতে পারো এ দেশের লোকেরা আমাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে কেন?

Don't worry my dear ! The mail will be in today—I am sure to receive some news from Vidyasagar.

পরমুহূর্তেই ডাক-পিয়ন এসে দরজার ঘণ্টি বাজাল।

কে—কে বেল বাজায় দেখ তো আঁরিয়ৎ !

কে আবার ? নিশ্চয়ই কোন পাওনাদার—আঁরিয়ৎ বললে।

বললে বটে মুখে ঐ কথা—কিন্তু আঁরিয়ৎ গিয়ে দরজা খুলে দিল।

বিদ্যাসাগরের চিঠি, সঙ্গে পনের শত টাকা।

মাইকেল লিখেছিলেন ঐ টাকা পেয়ে—

How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend ! You have saved me !

কিন্তু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেদিন কবিকে বাঁচাতে পারেন নি। যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে মাইকেল জন্মেছিলেন—যে প্রচণ্ড শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল, সেই শক্তিই একদিন বন্দী প্রমিথিয়ুসের মত তাঁকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

বিদ্যাসাগর সেদিন ঐ বিরাট কবি-প্রতিভাকে বাঁচাবার জন্য কি না করেছেন। সাহায্য ভিক্ষা করে দোরে দোরে নানা জনের কাজ থেকে কর্জ করে অনেক টাকা বিদেশে কবিকে পাঠিয়েছিলেন সম্পূর্ণ তাঁর নিজের দায়িত্বে।

জাস্টিস অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৩০০০ টাকা, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা কর্জ করে কবিকে পাঠান। পরে তাঁকে এজেণ্ট নিযুক্ত করে যখন কবি ওকালতনামা পাঠান—বিদ্যাসাগর তখন কবির বিষয়সম্পত্তি বন্ধক রেখে আরো ১২,০০০ টাকা পাঠান।

১৮৬৬, ১৭ই নভেম্বর মাইকেল গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাস করেন। এবং ১৮৭৬ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে ফিরে আসেন।

বিদ্যাসাগর কবির থাকবার জন্য একটা বাড়ি ঠিক করেছিলেন কিন্তু মাইকেল সেখানে উঠলেন না, উঠলেন গিয়ে স্পেনসাস হোটেলে, বিলাসবহুল এপার্টমেণ্টে।

কিন্তু মধুস্থদনের কথা এখন থাক, আমরা আনন্দচন্দ্রের কাছে আবার ফিরে যাই।

ঔষধপত্র ও আবশ্যকীয় কিছু ডাক্তারী যন্ত্রপাতি নিয়ে আনন্দচন্দ্র আবার গ্রামে ফিরে এলো। শুরু করলো জীবিকার্জন। সংসারে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সেজ পিসী তো আগেই গত হয়েছিলেন। মাস চারেকের ব্যবধানে বড় পিসীমাতা ও সেজ পিসীমাতা, চন্দ্রকণা ও সরোজিনী, তার বিধবা বোন মারা গেলেন। রইলো বেঁচে একমাত্র বিন্দুবাসিনী।

কিন্তু সেও সংসার থেকে দূরে সরে গেল। পূজা-আর্চা নিয়ে মেতে উঠলো। সংসারের যাবতীয় ভার এসে পড়লো অন্নদাস্থন্দরীর উপর।

কিই বা বয়স তখন অন্নদাস্থন্দরীর—বয়স মাত্র ১৬।১৭। বেচারী যেন হিমসিম খেয়ে যায়।

আনন্দচন্দ্র রোজগারের ধান্ধায় উদয়াস্ত খেটে চলেছে।

কখনো নৌকায়, কখনো পদব্রজে দূর-দূরান্তরে রোগী দেখতে যায়। কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় আয় সামান্য। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না।

অভাব আর অনটন।

দক্ষিণারঞ্জনের যখন পাঁচ বৎসর বয়স অন্নদাস্থন্দরীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মাল। মায়ের চাঁপা ফুলের মত গাত্রবর্ণ পেয়েছিল ঐ পুত্র—হৃষ্টপুষ্ট—আনন্দচন্দ্র ছেলের নাম দিল মনোরঞ্জন।

ছেলেদের মা তাদের দেখবার সময় পায় না, রান্নাঘর ঢেঁকিঘর ও গোয়াল নিয়ে ব্যস্ত। বিন্দুবাসিনীই অগত্যা ওই দুইজনকে কাছে টেনে নেয়।

ঐ সময় আনন্দচন্দ্র তার বন্ধু মধুস্থদন গুপ্তর এক চিঠি পেল—

প্রিয় আনন্দ,

আমি মাসখানেক হইল বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। সম্ভবত মেডিকেল কলেজেই একটা চাকরি পাইয়া যাইব। কিন্তু আমি আজ একঘরে। সমাজ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নাকি সমাজে আমার ঠাঁই হইবে না।

কিন্তু আমিও স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছি—প্রায়শ্চিত্ত করিব না। তাহাতে সমাজ আমাকে গ্রহণ করুক বা না-করুক।

কেন প্রায়শ্চিত্ত করিব ?

আমি তো কোন কুকর্ম করি নাই।

আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও সমাজচ্যুতা। বেচারী ! আমি নীরজাকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে না আসতে, কিন্তু নীরজা আমাকে ত্যাগ করে নাই। তার স্বামীই নাকি তার সমাজ। তার স্বামী যেখানে সমাজ সেখানে। আশ্চর্য এইসব হিন্দুনারী !

তুমি বোধ হয় জান না—আমার পিতৃদেবও স্বর্গত হইয়াছেন আমার প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে। তুমি হয়ত কলিকাতায় আর আসো না। আসিলে অতি অবিশ্যি দেখা করিবে। ভুলিবে না তো ?

তোমার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ

মধু গুপ্ত।

আনন্দচন্দ্র পত্রটা পড়ছিল এমন সময় বৃদ্ধ কৈলাস এসে বললে, দাদাবাবু লম্বার চরের থেকে তমিজুদ্দীন শেখ আইছে। তার বড় পোলার আজ দশ দিন জ্বর। জ্বরের ঘোরে গতকাল থেকে প্রলাপ বকতিছে।

যাতিছি। হ্যারে মুগকলাই যা আছে তা ঝাড়পোঁছের ব্যবস্থা করেছিস ?

সে হবে নে। আমার কাম আমি জানি, তোমারে ভাবতি হবে না।

আনন্দচন্দ্র বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়।

গায়ে কোটটা চাপায়, স্টেথিস্কোপটা পকেটে ভরে ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে বেরুতে যাবে—অন্নদাসুন্দরী সামনে এসে দাঁড়াল।

কোথাও যাতিছ নাকি ?

হ্যাঁ। ক্যান ?

চাল বাড়ন্ত—

ক্যান, ও মাসে দু'মণ চাল আইলো না ? সব বেবাক খরচ কইরা থুইছো ?

হ্যাঁ, আমি খাইছি—

তাই কি আমি কইছি নাকি ?

সংসারে এতগুলান লোক, দুই মণ চাউলে কি হয় ?

দেহি রমজান শেকেরে যাওনের বেলায় কয়ে যাবানে—

মোনার আজ তিন দিন জ্বর—

কই, সে কথা তো আমারে কও নাই! সেডা গেল কনে? নশে কনে?

কনে আবার, দেখ গে চাঁদামণি আড়ায় মাছ ধরতিছে—

আনন্দচন্দ্র একটা রূঢ় বাক্য স্ত্রীর প্রতি উচ্চারণ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু অন্নদাসুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আর বলা হলো না।

অন্নদাসুন্দরী আবার সন্তানসম্ভবা।

পরনে একটা মলিন লালপাড় শাড়ি। গায়ে একখানিও অলঙ্কার নেই—অহাতে মাত্র দুটি শাঁখা ও লোহা। মাথায় ডগডগে সিন্দুর।

একে একে অন্নদাসুন্দরীর সমস্ত গহনা অভাবের সংসারে বেচতে হয়েছে।

কেমন যেন মায়া হলো আনন্দচন্দ্রের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

তাহলে আমি চলি—

এখন আবার কোথায় যাবা?

রোগী দেখতি লঙ্কার চরে।

আসো তো—

অন্নদাসুন্দরী আবার রন্ধনশালার দিকে চলে গেল।

আনন্দচন্দ্র ভাঙ্গা ছাতাটা নিয়ে বের হয়ে পড়লো।

ভাদ্রের প্রখর রৌদ্র বাইরে।

২৬

মধুসূদন গুপ্ত কি জানত না যে সে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সমাজ তাকে একঘরে করবে—জানত এবং জেনেশুনেই তো সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে সাগর-পাড়ি দিয়েছিল। মধুসূদনের স্ত্রী নীরজাসুন্দরী কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করলো না। সে তার স্বামীর অনুবর্তিনী হলো ছায়ার মতই। মধু অনেক বুঝিয়েছিল তাকে কিন্তু নীরজাসুন্দরী বলেছে, তুমিই আমার ইহকাল—পরকাল—দেবতা। যে সমাজে তোমার ঠাঁই নেই—আমারও সে সমাজে ঠাঁই নেই।

মধুকে তার খিদিরপুরের পিতৃগৃহও ত্যাগ করতে হয়েছিল, কারণ সেখানে ছিল গৃহদেবতা রাধাবল্লভ। দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের হাতে সে-গৃহ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে একটি ছোট বাড়ি দেখে প্রথমে গিয়ে উঠেছিল, পরে বৈঠকখানা অঞ্চলে উঠে আসে।

সেখানে থেকেই আনন্দচন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিল মধুসূদন।

মধু গুপ্তর দেশে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরেই মাইকেল গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তখনো বিদেশ অবস্থান করছে।

দেশে ফিরে মাইকেল স্পেনসেস হোটেলে তিনটি ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন এবং ব্যারিস্টারী শুরু করেন। ব্যারিস্টারী করে যা পেতেন তাতে করে স্ত্রী-পুত্রদের জন্য ইউরোপে মাসে মাসে যে টাকা পাঠাতে হতো, এবং কলকাতায় হোটেলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে কিছুই আর উদ্বৃত্ত থাকত না।

বিদ্যাসাগর মশাই যে টাকা ধার করে তাঁকে ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন—সে দেনার কথাও আর মনে পড়ত তো না তখন মাইকেলের, উপরন্তু আরো দেনা চারিদিকে করতে লাগলেন। বরাবরের সেই বেহিসেবী জীবন তাঁর। টলমল করে চলতে লাগল। ক্রমশ খরচের মাত্রা তাঁর আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল।

দেনা, দেনা আর দেনা—চারিদিকে কেবল উত্তমর্ণ। তারা টাকার জন্য সর্বদা তাগিদ দিচ্ছে।

একদিন বন্ধুবর মনোমোহন ঘোষ এসে বললেন, এ তুমি কি করছো মধু—হাত গোটাও, যা পাও তার থেকে কিছু কিছু উত্তমর্ণদের দিয়ে অন্য কোথাও উঠে যাও এই বিলাসবহুল হোটেল থেকে।

কোথায় যাবো—where Michael can live—

কেন, অন্য কোন একটা বাড়িতে।

No no—Madhu can't live like a beggar. সে রাজার মত জন্মেছে—রাজার জীবনই কাটাবে।

সেই সময়ই মাইকেলের একদিন মনে হলো একদা যিনি তাঁকে ইউরোপ বাসকালে সাহায্যে করেছিলেন, সেই বিদ্যাসাগরের কাছেই আবার প্রার্থী হবেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে বিমুখ করবেন না নিশ্চয়ই।

রাত্রে শয়নকক্ষে বসে—সামনে সুরার পাত্র। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখতে বসলেন—

If you had been a vulgar or common man like most of those who surrounded you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account……you are the Greatets Bengali that ever lived……Behold and help again one who loves you and has no friend who seems to come for him except yourself.

বিদ্যাসাগর মশাই যথাসময়েই চিঠিটা পেলেন মাইকেলের। কিন্তু বিদ্যা-সাগরের মত মানুষও মাইকেলের প্রতি কিছুটা বুঝি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে মাইকেলের বেহিসেবী বিলাসিতায় ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়। তাছাড়া ঐ সময় উত্তমর্ণদের ঘন ঘন তাগিদেও অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অত্যন্ত স্নেহ করতেন মাইকেলকে বিদ্যাসাগর মশাই। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে স্বীকার করতেন। তাঁর ধারণা ছিল মধুসূদন যদি অতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিলাসী এবং বেহিসেবী না হতেন, তিনি যা উপায় করতেন, তাতে করে তাঁর ভাল-ভাবেই দিন অতিবাহিত হতো।

পত্রের জবাবে লিখলেন বিদ্যাসাগর, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে যে টাকা ঋণ করে ইউরোপে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, কথা ছিল সে টাকা আপনি দেশে ফিরে এলে শোধ করে দেবেন—আবার যখন টাকার প্রয়োজন হলো আপনার, শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকে কোম্পানির কাগজ ধার করে টাকা পাঠাই। কথা ছিল তাঁর ধার শীঘ্র শোধ করে দেবো—কিন্তু কিছুই হয় নি, আমি অঙ্গীকার-ভ্রষ্ট হয়েছি। তাঁদের টাকা সত্বর পরিশোধ না করতে পারলে আমার অপমানের শেষ থাকবে না—ইত্যাদি।

তাছাড়া বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন। অধিক আর কি লিখিব। আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা আমি নিজে যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কায শেষ করিয়া লইব তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না।

জবাবে মাইকেল লিখলেন—Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain……I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.

মধুসূদন ঐ সময় সংবাদ পেয়েছিলেন ছোট আদালতের জজ ফেগ্যান সাহেব কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। মধু ঐ পদের জন্য ছোট লাটকে অনুরোধ করবার জন্য বিদ্যাসাগরকে বললেন, আপনি যদি ছোট লাট সাহেবকে একটা চিঠি দেন আমাকে ঐ কাজটি দেবার জন্য, আমার বড় উপকার হয়। কারণ আমি জানি, আপনি ব্রাহ্মণ হলেও দুর্বাসার বংশধর নন। আমি যাই করি না কেন, আপনার হৃদয়ের স্পর্শলাভে বঞ্চিত হবো না।

বিদ্যাসাগর সম্মত হলেন এবং ছোট লাটকে একটি চিঠি দিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মাইকেলের। জজ সাহেবও চাকরি ছাড়লেন না শেষ পর্যন্ত, এবং মধুসূদনেরও ঐ চাকরি হলো না। অনন্যোপায় মধুসূদন তখন তাঁর সমস্ত বিষয়-

সম্পত্তি বিক্রি করে অনুকূলচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্রের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করেন।

দেশের মানুষ মাইকেলকে সত্যিই সেদিন চিনতে পারে নি। তাঁর অনন্য প্রতিভার যোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতিও দেয় নি। নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলতে হবে কবির। জনরবই সেদিন কবিকে সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছিল। আসল কথা হলো, একটা কবন্ধ অর্ধসভ্য সমাজ সেদিন প্রেতনৃত্য করে বেড়িয়েছিল, এবং মাইকেলকে লোকচক্ষে হেয় ও অপমানিত করতে চেয়েছিল, অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ও সরল কবি মধুসূদন ঐ জনরবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন।

জনরবকেও হয়ত কবি উপেক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরই দু'চারজন বিশ্বস্ত বন্ধুও তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মধুসূদনকে ভুল বুঝতে শুরু করলেন।

আর তখনই তাঁর জীবনের করুণতম ট্র্যাজেডির শেষ পর্ব শুরু হলো।

ডাঃ মধু গুপ্ত তখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। কঠোর এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। সবকিছু ছেড়ে এসেও এবং সমাজ তাকে ত্যাগ করলেও মধু হতাশ হয় নি, মনোবল হারায় নি—এবং তার সেই দিনগুলোতে যে সর্বতো-ভাবে মধু গুপ্তকে সাহায্য করেছিল, সে তার পতিব্রতা স্ত্রী নীরজা—স্ত্রী নীরজা-সুন্দরী।

নিদারুণ একটা অভিমানে মধু তার সমস্ত পিতৃসম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে চলে এসে-ছিল। রামপ্রাণ গুপ্তর একমাত্র সন্তান হয়েও সে তার সমস্ত পিতৃসম্পত্তির উপর থেকে দাবি তুলে নিয়েছিল। ঐসব ঝামেলা ঝগড়াঝাঁটি ও মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে নিজেকে সে জড়াতে চায় নি। অবিশ্যি স্ত্রী নীরজাসুন্দরী সর্বতোভাবে সেদিন তার স্বামীকে সাহায্য করেছে।

মধু তার স্ত্রীকে বলেছিল, চল আমরা অন্যত্র কোথাও চলে যাই।

অন্যত্র চলে যাবেন?

হ্যাঁ। এ বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি সব কিছু ছেড়ে চলে যাবো নীরজা।

নীরজাসুন্দরী বললে, চলে যাবেন! কোথায় যাবেন?

যেখানে হোক—অন্য কোথায়ও।

কিন্তু কেন?

নিরন্তর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এই ভাবে ঝগড়াঝাঁটি করতে আমার সত্যিই ভাল লাগছে না।

কথাটা মিথ্যা নয়। মধু গুপ্তর বিদেশ থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহে

অশান্তি শুরু হয়েছিল। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মধু নিজে গিয়ে স্ত্রী নীরজাকে কলকাতায় তাদের খিদিরপুরের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। এবং বাড়িতে পা দিয়েই নীরজা বিস্মিত হয়েছিল—পুরাতন ভৃত্য ও লোকজন কেউ নেই—সব বিদায় হয়েছে—নতুন সব লোকজন, এবং স্বামীর খুল্লতাত ভাই অবনীমোহন ও সুধাংশুমোহন গৃহে জাঁকিয়ে বসেছে তাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে।

অবনীমোহনের স্ত্রী কাঞ্চনমালাই সংসারের কর্ত্রী।

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার এখানে এসে তার শাশুড়ীর মুখেই নীরজা শুনেছিল তার স্বামীর খুল্লতাত ভায়েরা দেশের বাড়িতে থাকেন সাতক্ষীরায়। কিন্তু তাঁরা কেউ কখনো খিদিরপুরের বাড়িতে আসেন নি। দেখেও নি তাঁদের নীরজা।

জানতে পারল তার শ্বশুরমশাইয়ের স্বর্গারোহণের পরই। তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁরা এখানে বৎসর দুই হোল জাঁকিয়ে বসেছেন। তারাই আজ যেন এ সংসারের, এ গৃহের সর্বেসর্বা।

তাঁরা নাকি রব তুলেছেন—বিদেশগমনের জন্য তার স্বামী ধর্মচ্যুত, সমাজচ্যুত হয়েছেন। কাজেই এ গৃহে তার স্বামী ও তার কোন অধিকার নেই। শুধু তাই নয়, এখানকার গৃহ, বিষয়-আশয় সব কিছু নাকি এসব তার শ্বশুরের উপার্জনে নয়। তার দাদাশ্বশুরেরও অর্থসাহায্য আছে। এ সবের সব কিছুর উপরই তাঁদের মধু গুপ্তর সঙ্গে সমান অধিকার বরাবরই ছিল—এতদিন তাঁরা গ্রাম ছেড়ে আসেন নি—কিন্তু আজ তার স্বামী সমাজচ্যুত, কাজেই তার এ সবের কিছুর উপর কোন অধিকার নেই।

এইভাবেই নাকি গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

মধু গুপ্ত প্রথমে সব কিছু হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ সে জানত ভাল ভাবেই সব কিছু তার পিতা রামপ্রাণ গুপ্তের স্বোপার্জিত। সারা জীবনের পরিশ্রমে তিনি সব কিছু গড়ে তুলেছেন।

কিন্তু অবনীমোহন বললেন, না। তা ছাড়া আদালতে প্রমাণ করবো, আমাদের জ্যেষ্ঠতাত রামপ্রাণ গুপ্তর ইচ্ছা অনুযায়ীই সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পিতৃদেবের ইচ্ছানুযায়ী ?

হ্যাঁ। খুড়োমশাইয়ের চিঠি আমাদের কাছে আছে। যে চিঠিতে তিনি আমাদের ঠাকুর্দামশাইকে লিখেছিলেন—

কি লিখেছিলেন ?

এখানকার বিষয়সম্পত্তি সব কিছুর উপরে আমাদের বংশের সকলের সমান অধিকার আছে। যেমন তোমার, তেমনি আমাদেরও।

কোথায় সে চিঠি ? আমি দেখতে চাই চিঠি !

প্রয়োজন হলে দেখাতে পারব বৈকি। অবনীমোহনের জবাব।

মধু গুপ্ত আর কিছু বলে নি।

ভেবেছিল, থাক গে—এত বড় বাড়িতে ওরা যদি থাকেই তো থাক।

কিন্তু দেখা গেল আসল মতলব ওদের অন্য রকম। নানা ছল-ছুতায় ওরা মধুর শান্তিভঙ্গ করতে লাগল। নানাভাবে অত্যাচার করতে শুরু করল। দিনে দিনে অশান্তি কেবল বেড়েই চলে। নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয় মানুষ মধুসূদন দু'দিনেই হাঁপিয়ে ওঠে। মন দিয়ে ডাক্তারিও করতে পারে না।

তাই অবশেষে মধু স্থির করেছে, এ গৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে তার স্ত্রীকে নিয়ে।

নীরজা বললে, এই অন্যায়কে মেনে নিয়ে আপনি আপনার পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাবেন ?

তাই যাবো নীরজা। এসব আর আমার ভাল লাগছে না। বৈঠকখানায় আমাদের একটা বাড়ি আছে—তুমি তো জান, সেখানেই আমরা চলে যাবো, থাকুক এরা এখানে।

নীরজা কিছু বললে না।

তোমার কি মত নেই নীরজা ?

এইভাবে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস ?

কিন্তু এইভাবে সর্বক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি আমার সত্যিই ভাল লাগছে না। তুমি কিছু ভেবো না নীরজা, আমি মূর্খ নই, চিকিৎসাশাস্ত্র ভাল করেই অধ্যয়ন করেছি—উপার্জন আমি করতে পারবো।

এই গৃহেই শ্বশুরঠাকুর ও মা শেষনিঃশ্বাস নিয়েছেন। তাঁদের সব স্মৃতি মনে হয়। এখনও বড় ঘরে গেলে মাকে দেখতে পাই—বসে আছেন পালঙ্কের উপরে, মানদা তাঁর পদসেবা করছে !

ওসব ভুলে যাও।

ভুলে যাবো ! কেমন করে ভুলে যাবো ?

নতুন করে তুমি সংসার পাতবে অন্যত্র গিয়ে—

নীরজাসুন্দরীর দু'চোখে জল।

কেঁদো না নীরজা। সবই আমাদের ভাগ্য।

বৈঠকখানার বাড়িটা দীর্ঘদিন ধরে এমনি পড়ে থাকায়, অব্যবহার্য হয়ে পড়ে-

ছিল। কাজেই কিছু সংস্কারের প্রয়োজন। কিছু সময় লাগবে। মধু তাই স্থির করে, কিছুদিন আপাততঃ অন্যত্র থাকবে। তারপর সংস্কার হয়ে গেলে বৈঠকখানার বাড়িতে উঠে যাবে।

সেইমতই ব্যবস্থা হলো।

যাবার আগের দিন মধু গিয়ে অবনীমোহনকে বললে, অবনী, কাল আমি এ গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

সে তো খুব ভাল কথা, আপনার যে সুমতি হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

মধু অতঃপর বললে, পিতৃদেবের কোথাও কিছু ঋণ ছিল মনে হয়, মনে করবো সে ঋণ এইভাবেই শোধ হল।

তা যাবেন কোথায় ? অবনীমোহন শুধায়।

সে জানার তোমার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না অবনীমোহন।

ভাল, ভাল। জানবার ইচ্ছাও নেই। তবে এক কাজ আপনি করতে পাবেন—আপনার ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন, আর—

বলো। থামলে কেন ?

দুই শত টাকা করে মাসে মাসে আপনি স্টেট থেকে যাতে পান, সে ব্যবস্থা আমি করবো।

অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার বদান্যতার জন্য অবনী। তুমি কি মনে করো যেসব সম্পত্তি ও অর্থ আমারই—তা থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করবো ভিক্ষুকের মত ! তা যদি ভেবে থাকো তো ভুলই করেছো।

ভাল ভাল, আরো ভাল।

বলতে গেলে যে সম্পত্তির উপরে মধুর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল সেই সম্পত্তি নিঃস্বার্থভাবে পশ্চাতে ফেলে রেখে একবস্ত্রে স্ত্রীকে নিয়ে খিদিরপুরের বাড়ি থেকে প্রস্থান করেছিল মধু।

নীরজা চোখের জল মুছছিল।

মধু বললে, কাঁদছো কেন নীরজা ? আবার আমি সব উপার্জন করবো। তুমি ক'টা বৎসর আমাকে কেবল একটু সময় দাও। চল।

একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে মধু ও নীরজা চলে গেল।

দোতলা জানালাপথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কাঞ্চনমালা। তার মুখে মৃদু হাসি।

অবনীমোহন এসে ঘরে ঢুকল।

কাঞ্চনমালা বললে, আপদ তাহলে শেষ পর্যন্ত বিদায় হলো!

হ্যাঁ।

যাক, বাঁচা গেল।

মাসখানেক বাদেই মধু বৈঠকখানার বাড়িতে এসে বসল এবং ডাক্তারি শুরু করল।

দিন-কে-দিন তার রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে তার নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে কলকাতা শহরে।

অর্থ আসতে শুরু করল।

নীরজা একটু একটু করে মনের মত করে সংসারটাকে গুছিয়ে নিতে লাগল।

মেডিকেল কলেজ থেকে চাকরির জন্য ডাক এলো মধুর, কিন্তু সে চাকরি সে নিল না।

২৭

আনন্দচন্দ্র ডাক্তারী শাস্ত্রটা ভাল ভাবেই অধ্যয়ন করেছিল। তাকে যে একদিন ডাক্তার হতে হবে সে তো তার শৈশব হতেই পিতা ভারতচন্দ্র মনের মধ্যে বারংবার বলে বলে একেবারে কথাটা গেঁথে দিয়েছিলেন।

বলতেন, না না। তোরে ডাক্তার হতি হবে। পাস করা ভাল ডাক্তার। তুই ডাক্তার হবি, এ আমার চিরদিনের স্বপ্ন, গাঁয়ে একটা পাস করা ভাল ডাক্তার নাই—গাঁয়ের লোকেদের ভাল চিকিচ্ছে হয় না। সবাই তো আর রোগ হলি পর কলকাতা শহরে যাতি পারে না—সে সামর্থ্য ও সময়ও নেই কারো।

কখনো বলতেন, আরো পরে আনন্দ যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, বুঝিছো, একটা কথা মনে রাখবা—আমি যদি তোমার পাস করার আগে মরেও যাই—তুমি কিন্তু এই গাঁয়েই এসে বসবা।

তাই হবে বাবা। আনন্দচন্দ্র বলেছে

হাঁ, ভুলবা না। কথাডা আমার। আমি তালি স্বর্গে বসেও তৃপ্তি পাবো। আমার আনন্দ ডাক্তার হইছে—পাস করা ডাক্তার।

ভারতচন্দ্র বোধ করি সেই দিনটির প্রত্যাশাতেই প্রাণটি ধরে রেখেছিলেন। পুত্রের মুখ থেকে পাসের সংবাদ পাবার পরই চোখ বুজলেন। আনন্দচন্দ্রের মনেও সেজন্য অনেকটা সান্ত্বনা ছিল।

কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করে আনন্দচন্দ্র যেন দিশেহারা হয়ে পড়তে লাগলেন। গ্রামের লোকেদের সামর্থ্যই বা কতটুকু আর তারা দিতেই বা পারে কত!

সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোগী দেখে—রোগীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাঁচটি বা সাতটি টাকার বেশী রোজগার হয় না।

তাতে করে সংসারের অতগুলি প্রাণীর চলেই বা কি করে। এক দিক করতে গিয়ে অন্য দিক খালি হয়ে যায়—ভাগ্যে বৎসরান্তে কিছু ধান কলাই মটর জমি থেকে পাওয়া যায়, তাই বা কতটুকু—বৎসরের ৬।৭ মাসের বেশী যায় না। শুধু চাল ডাল হলেই তো চলবে না—তেল, নুন আছে—বাড়িতে দুটো বাচ্চা ও প্রৌঢ়া পিসীমা, তাদের জন্য সের দুই দুধ লাগে—মাছ তরিতরকারিরও প্রয়োজন—তাছাড়া পরনের বস্ত্রও তো চাই।

অভাব আর দারিদ্র্য যেন সংসারের নিত্য কথা।

আশ্চর্য স্বভাব স্ত্রী অন্নদাসুন্দরীর। ঐ দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যেই সে যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতই সংসারের নিত্য চাহিদা সকলের মিটিয়ে যায়।

পরনে একটা একটা মলিন রিপু করা লালপাড় শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। কপালে ডগডগে একটা সিন্দূরের গোলাকার টিপ। হাতে দু'গাছি করে হাঙ্গরমুখী বালা ছাড়া আর কোন গহনাই নেই—আছে লোহা আর শাঁখা। ছোটখাটো মানুষটি, পুতুল-পুতুল গড়ন। মুখে কখনো একটি শব্দ নেই।

আনন্দচন্দ্র ওঠার অনেক আগেই রাত থাকতে থাকতেই শয্যা ত্যাগ করে চলে যায়—পাচ দুয়োরের ঘাটে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে, বাসী কাপড ছেড়ে কাচা কাপড় পরে—বাসী কাপড়টা ধুয়ে মেলে দেয়, তারপর গিয়ে ঢোকে রন্ধনশালায়।

চেলাকাঠ আর কুড়োনো শুকনো পাতা দিয়ে উনুন ধরায়। ভৃত্য কালা ঐ সময় গরুর দুধ দুইয়ে নিয়ে আসে।

মাঠান দুধ দোয়ায়ে আনলাম—বলে দুধের বোকনোটা রান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রাখে।

কাজলী গাইটা আজকাল আর বেশী দুধ দেয় না। দুধ বাঁটে শুকিয়ে গিয়েছে। মাত্র তিনপোটাক দুধ হয়—তাতে করে তো আর চলে না।

বাজার থেকে তাই প্রত্যহ সের দেড়েক দুধ আনতে হয়।

দুধের দাম তো ক্রমশই আক্রা হচ্ছে। আগে দুই পয়সা করে সের ছিল, এখন সেখানে চার পয়সা—এক আনা।

দুধের বোকনোটা তুলতে তুলতে অন্নদা বলে, আজ যে দুধ দেখতাছি দু পোটাকের বেশী হবে না!

ঐ যে দিতেছে ভাগ্য মাঠান। নেন লয়ে যান। আমি যাই গোয়ালডা পরিষ্কার করে কাজলীরে জাবনা দিয়ে আসি।

কালা!

বলেন মাঠান।

বাজারে নলেন গুড় ওঠে নাই?

না, এহনতক তো কই দেখলাম না।

পৌষ মাস তো পড়লো—আজ দেহিস দিনি, পালি দু'পয়সার আনবি।

পালি আনবো নে।

অন্নদা দুধটা গিয়ে একটা ছোট কড়াইয়ে ঢেলে উনুনে চাপিয়ে দেয়। ঐ সামান্য দুধের থেকেই ছোট এক গ্লাস দুধ অন্নদা প্রত্যহ স্বামীকে পান করায়।

দুধটা জ্বাল দিয়ে অন্নদা গ্লাসে করে দুধটা নিয়ে স্বামীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল।

আনন্দচন্দ্রের কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুম ভেঙ্গেছে। হাত মুখ ধুয়ে বাসী ধুতিটা ছেড়ে —ধোয়া একটা ধুতি পরে সবে এসে শয্যায় বসেছে, অন্নদা গ্লাস হাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

দুধটা খায়ে নাও।

তোমারে কত বলি বৌ, সামান্য ঐ দুধটুকু ছাওয়ালদের আর পিসিমণিরেই দিও---

তোমারও কিছু দুধের দরকার—বেহান থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভূতের মত খাটতিছো, ভাল মন্দ তো কিছু আর খাও না।

খাবো খাবো, আমার নদো বড় হোক—বাংলা নয় ইংরাজী বিভাগ থেকে পাস করাবো—শহরে সে ডাক্তারী করবে—আমার বন্ধু মধু গুপ্তের মত মুঠো মুঠো টাকা আনবে, তহন পেটভরে খাবো দেখো তুমি বৌ।

অন্নদা মৃদু হাসে। বলে, আচ্ছা—তা সে তো এখনো অনেক দেরি।

দেরি! কও কি বৌ! তোমার মনে পড়ে তোমায় যেদিন বিয়া করে আনলাম। মাঠের মধ্যি দে পাল্কি চড়ে আসতিছিলাম—মাঘ মাস তহন শেষ হয়

হয়—সরষের ক্ষেতে হলুদ ফুল ধরছে—এতটুকুন তুমি—সেদিনের তুমি দেখতি দেখতি তুই ছাওয়ালের মা হয়ে গেলে—দিন তো হু হু করে কহান দিয়ে যে চলে যায় জানতিও পারা যায় না।

অন্নদাসুন্দরী কি এক গভীর প্রেমের দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে। ঐ—ঐ মানুষটা আজ যেন তার জীবনের সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

এত বড় সংসারের সমস্ত কাজ, সর্বক্ষণ ব্যস্ত, তবু কেন তার একটা চোখ অনেকক্ষণ ঐ মানুষটিকেই ঘিরে আছে। পুতুল খেলতে খেলতেই একদিন এতটুকু অন্নদা ঐ মানুষটার চাদরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ওর পিছু পিছু বাপের ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল—তখন কে জানত ঐ মানুষটিই একদিন তার সমস্ত চেতনা-কামনাকে ঘিরে ধরবে!

আনন্দচন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি দেখতিছো অমন করে আমার দিকে তাকায়ে বৌ?

সহসা কি হল, লজ্জায় যেন অন্নদার ছোট ফর্সা মুখখানি রাঙা হয়ে ওঠে।

না, কি আবার দেখবো!

সত্যি বৌ—

কি?

তুমি সত্যি ভারি সুন্দর।

যাঃ!

তা যা কও—সত্যি কথাই কই। এ গাঁয়ে এমন সুন্দরী লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বৌ কই আর দুডো তো এ চোখে পড়লো না আজ পর্যন্ত।

থাক থাক, নাও এই দুধটুকু খেয়ে নাও। সলজ্জভাবে অন্নদা বললে।

এক চুমুকে দুধের গ্লাসটা খালি করে শূন্য গ্লাসটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল আনন্দচন্দ্র।

এটু তামুক সাইজে দেবা না বৌ!

আনতিছি। অন্নদা কলকেটা হুঁকোর মাথা থেকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অন্নদার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আনন্দ মনে মনে ভাবে, অর্থের অভাব তার সত্যি, কিন্তু এমন শান্তি কটা সংসারে আছে!

মনে পড়লো কটা দিন আগেকার কথা আনন্দচন্দ্রের।

কলকাতায় দু'দিনের জন্য গিয়েছিল—কিছু ওষুধপত্র কিনে আনতে। ঘুরতে ঘুরতে এক বৈকালে গিয়েছিল বৈঠকখানায় মধু গুপ্তের বাড়িতে।

পসার প্রচণ্ড জমে উঠেছে ডাক্তারীতে মধু গুপ্তর। বলতে গেলে নাওয়া-

খাওয়ার বুঝি সময় পায় না।

শিয়ালদার কাছেই বড় রাস্তার উপরে একটা মাঝারি আকারের ঘর নিয়ে ডিস্‌পেনসারি খুলেছে। সকাল আটটায় সেখানে যায়—ফিরে আসে দ্বিপ্রহরে সেই বেলা দেড়টা দুটো নাগাদ বাড়ি বাড়ি কল সেরে। পকেট ভর্তি করে টাকা আনে। আবার আড়াইটা নাগাদ দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ডিসপেনসারিতে যায়, ফেরে কোন দিন রাত দশটা বা এগারটায়।

ডিসপেনসারিতে রোগী দেখে ওষুধ দেয়। একটি ছোকরাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে—সে-ই ওষুধ তৈরী করে দেয়।

ফিস করেছে এক টাকা।

সাহেব ডাক্তারদের ফিস দু টাকা, তিন টাকা—কারো কারো চার টাকা।

তার শুরু হয়েছিল আট আনায়—তারপর বারো আনা—এই এক বৎসরেই ফিস করেছে এক টাকা পুরোপুরি।

আনন্দ যেদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে যায়, শরীরটা ভাল ছিল না বলে সেদিন বিকালে আর ডিসপেনসারিতে বের হয় নি। তার স্ত্রী নীরজাসুন্দরীই বের হতে দেয় নি।

আনন্দকে দেখে মধু গুপ্তর কি আনন্দ!

আরে আনন্দ যে—এসো এসো।

আনন্দ লক্ষ্য করে মধু একটু মুটিয়েছে। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা হয়েছে।

তারপর কলকাতায় কবে এলে?

গতকাল।

থাকবে তো কটা দিন?

না ভাই, আগামীকালই আবার ফিরে যাবো।

কেন—এলে যখন এতদিন পরে দুটো দিন থেকে যাও না হে।

না ভাই, গিন্নীর আবার ভরা মাস।

তা তোমার সন্তান-সন্ততি কটি?

দুই ছেলে।

বাঃ, তা বয়স কত হলো?

বড়টি নয় বৎসরের—মেজটি পাঁচ বৎসরের। তোমার সন্তান-সন্ততি কটি?

না—

কি, না?

কিছুই হয় নি।

একটিও না ?

না—একটিও না। মধু গুপ্ত যেন দুঃখের করুণ হাসি হাসলো। দাঁড়াও নীরজাকে ডাকি।

ভৃত্যকে ডেকে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবার জন্য ঐ ঘরে বললে মধু গুপ্ত।

তা মধু, তোমার খিদিরপুরের পৈতৃক ভবন ছেড়ে এখানে কেন ?

সে এক ইতিহাস ভাই—

ইতিহাস !

হ্যাঁ। জ্ঞাতিদের সে বাড়ি-সম্পত্তি সব ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

কেন, কেন ?

ঐ সময় নীরজা এসে ঘরে ঢুকল।

নীরজার বেশ গিন্নীবান্নী চেহারা হয়েছে। নীরজা আনন্দকে ঘরে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিতে যাচ্ছিল সলজ্জভাবে।

মধু বাধা দিল, থাক থাক, ওকে আর লজ্জা করতে হবে না। চিনতে পারছো না—দেখ তো চেয়ে চিনতে পার কিনা !

না—মানে—নীরজা ইতস্ততঃ করে।

পারলে না চিনতে ! আনন্দ—আনন্দচন্দ্র—

ওমা, তাই নাকি ?

কেমন আছেন ? আনন্দ শুধালো।

ভাল। আপনাদের খবর সব কি ?

ঐ চলে যাচ্ছে একরকম।

আপনি তো আপনার দেশের গ্রামেই প্র্যাকটিস করেন ?

হ্যাঁ। এসেছিলাম কলকাতায় কিছু ওষুধপত্র কিনতে—তাই ভাবলাম এলামই যখন মধুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

খুব ভাল করেছেন—বাড়ির খবর সব ভাল ?

ভাল।

তারপর আরো অনেক কথা হলো।

নীরজাসুন্দরী খুব সপ্রতিভ মেয়ে—হাজার হোক স্কুলে পড়া মেয়ে—বেথুন স্কুলে।

মধু ও তার স্ত্রীকে দেখে কথাবার্তা বলে খুব ভাল লাগলো আনন্দর। কিন্তু বুঝতে পারছিল—ওদের আনন্দের সংসারে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণের সুর

নিরন্তর ওদের স্বামী-স্ত্রীকে ঘিরে রেখেছে। আনন্দের কাছে সেটা কিন্তু চাপা থাকে না।

নীরজা বললে, আনন্দবাবু, আজ কিন্তু এখানে আপনি রাত্রে আহারাদি করে যাবেন।

না, না—এ যাত্রায় থাক সেটা, পরের বার—

নীরজা বললে, না। এতদিন পরে আপনাদের দুই বন্ধুতে দেখা—আহারাদি না করে যেতে দিচ্ছি না।

মধু গুপ্তও বললে, ঠিক বলেছ নীরজা। একেবারে আহারাদি করে তুমি যাবে আনন্দ।

স্বামী-স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে আর আনন্দ অসম্মতি জানাতে পারে না।

নীরজা রন্ধনশালার দিকে যেতে উদ্যত হতে মধু বললে, দেখো আনন্দকে খেতে বললে, ঘরে মাছটাছ আছে তো?

ও বেলায় তুমি গলদা চিংড়ি এনেছিলে বড় বড়—সেই তো আছে!

বেশ, তবে তাই রান্না করো।

দুই বন্ধুতে গল্পে মেতে উঠলো। কিন্তু ওদের গল্পে ব্যাঘাত পড়লো। এক রোগীর বাড়ি থেকে 'কল' এলো—একটিবার ডাক্তারবাবুকে যেতে হবে।

ঠিক আছে বৃন্দাবনবাবু, একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রস্তুত হয়ে আসি। আনন্দ তুমি একটু বোস ভাই—আমি যাবো আর আসবো। বেশী দূর নয়—কাছেই আরপুলি লেনে।

মধু গুপ্ত প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে যাবার পর আনন্দ ঐদিনকার হিতবাদীটা নিয়ে ওলটাতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে নীরজা এসে ঘরে ঢুকল। বললে, দেখলেন শরীরটা ভাল না বলে আজ ডিস্‌পেন্‌সারিতে বিকেলে যেতে দিলাম না, অথচ—

আমরা যে ডাক্তার, আর্তের সেবাই যে আমাদের ধর্ম।

কিন্তু তাই বলে শরীরের দিকে তাকাবেন না?

আনন্দ হাসলো।

সব স্ত্রীই সমান। অন্নদাও এতটুকু শরীর খারাপ হলে আনন্দকে বের হতে দেয় না। আশ্চর্য, অন্নদা ঠিক টেরও পায়—আনন্দের এতটুকু শরীর খারাপ হলে সে ঠিক বুঝতে পারে।

আপনি বসুন আনন্দবাবু, আমি উনুনে যেটা চাপিয়েছি সেটা নামিয়েই আসছি।

আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনি আপনার কাজ করুন গে।

নীরজা রন্ধনশালার দিকে চলে গলে।

বাড়িটা অদ্ভুত শান্ত—কোন গোলমাল নেই, শব্দ নেই। তার গৃহ সর্বদাই ছেলেদের চেঁচামেচি গোলমালে যেন প্রাণচঞ্চল থাকে।

বড় ছেলে দক্ষিণারঞ্জন একটু শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু ছোট ছেলে মনোরঞ্জন, মোনা, প্রচণ্ড দুরন্ত। চেহারাও তেমনি গাঁট্টাগোট্টা। বড়জন ছোটজনের সঙ্গে এ টে উঠতে পারে না।

এবার ছেলে না হয়ে একটি মেয়ে হলেই ভাল হয়।

নিজের চিন্তায় তলিয়ে ছিল আনন্দ, নীরজার গলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল। আনন্দবাবু!

আসুন। রান্না শেষ হলো?

হ্যাঁ। উনি এলে ভাতটা চাপাবো।

বসুন।

একটা কথা বলবো ভাবছিলাম আপনাকে—আপনার বন্ধুর সামনে বলতে পারবো না।

আনন্দ কৌতূহলী হয়ে বলে, কি কথা?

আমাদের কোন সন্তানাদি নেই, আপনি তো শুনলেন!

হ্যাঁ, মানে—

আপনিই বলুন—ঘরে দুটো একটা শিশু না থাকলে কি বাঁচা যায়? তা ছাড়া ঠাকুরের বংশ থাকবে না সেটা ভাবতেও আমার কান্না পায়।

তা আর কি করবেন বলুন! তা ছাড়া এখনো তো সময় যায় নি।

না, কলেজের সাহেব ডাক্তারকে দিয়ে উনি আমাকে পরীক্ষা করিয়েছিলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সাহেব ডাক্তার বলেছেন—

কি বলেছেন?

আমি কোনদিনই সন্তানের মা হতে পারবো না। আপনি আপনার বন্ধুকে বলুন আর একটি বিবাহ করতে।

আবার বিবাহ? সন্তানের জন্য?

আনন্দর মনে পড়ে গেল খুড়োমশাই নিবারণচন্দ্রের কথা। সন্তান কামনার কি মর্মন্তুদ পরিণতি। সরস্বতীর অকালমৃত্যু। কুসুমকুমারীর অভিমানে স্বামীগৃহ ত্যাগ।

নীরজা বললে, আমি সানন্দে মত দিচ্ছি—আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই।

আশ্চর্য এই হিন্দুনারী!

আনন্দের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না—ঐ হিন্দুনারীদের কথা ভাবলে। নিজের সর্বস্ব সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা কেমন অনায়াসেই এরা স্বামীর জন্য বর্জন করতে পারে।

একদা যে হিন্দুনারীরা স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে যেত—আইনত এ দেশে যা আজ নিষিদ্ধ—তার মধ্যেও হয়ত স্বামীর জন্য সবকিছু বর্জনের তপস্যাই ছিল। এ মেয়ে আবার বেথুনে পড়া মেয়ে—শিক্ষিতা।

কি ভাবছেন—আমার কথার জবাব দিলেন না তো?

তা মধু কি বলে?

বললাম তো, উনি শুনতেই চান না আমার কথা। বলেন আমি পাগল!

না-টা হয়ত মধুর সত্যিকারের মনের কথা!

তা হোক, আপনি তবু ওঁকে সম্মত করান। আমি জানি—

কি জানেন?

ওঁর মনের মধ্যেও একটা নিরুদ্ধ কামনা সর্বদাই গুমরে মরছে। উপায় থাকতে কেন ওঁর জীবনটাকে এইভাবে ব্যর্থ করে দেবো।

আনন্দ ভাবে, এই স্ত্রীকেই একদিন অবহেলা করেছিল মধু গুপ্ত। অন্য এক নারীর আকর্ষণে এর দিকে ফিরেও তাকায় নি।

না—

কি, না?

আমি ও-কথা মধুকে বলতে পারবো না।

পারবেন না?

না।

আমার একান্ত অনুরোধেও না! বলতে বলতে কথাগুলো নীরজার চক্ষু দুটি ছলছল করে ওঠে।

ঐ সময় মধু এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কি—কি কথা হচ্ছিল, এ কি তোমার চোখে জল কেন? স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মধু বললে।

নীরজা কক্ষ ত্যাগ করে করে চলে গেল।

কি বলছিল নীরজা তোমাকে আনন্দ—নিশ্চয়ই আমার আর একটি বিবাহের কথা।

হ্যাঁ!

পাগল! সত্যি ওকে কেমন করে বোঝাবো—ভগবান যখন দিলেন না—সন্তান আমাদের হয় নি—ঐ সব পুন্নাম নরক-টরক একটা অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র!

কিন্তু মধু—

না আনন্দ, আমার সন্তান হলো না বলে কোন দুঃখ নেই—কোন ব্যথা নেই মনে।

কিন্তু ওঁর—

একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

না, তা আমার মনে হয় না। উনি যখন চান—

উনি চাইলেও আমি চাই না। মধুর কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

আহারাদির পর বিদায় নিল আনন্দ।

খুব আনন্দ করে গেলাম। আনন্দ বললে।

নীরজা বললে, আবার শহরে এলে আসবেন।

নিশ্চয়ই।

সাত দিন বাদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আনন্দ জানতে পারলেন, অন্নদা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছে।

কন্যাটি দেখলেন। একটু রোগা।

অন্নদা ম্লানকণ্ঠে বললে, মায়ে ছাওয়াল হলো—

তাতে কি?

মায়ে ছাওয়াল হওন মানেই বিয়ার ভাবনা!

আনন্দচন্দ্র হো-হো করে হেসে ওঠে।

হাসতিছো?

তা আর করি কি—এখনই সে ভাবনা ক্যান?

তুমি বোঝবা না।

শোন বৌ, মেয়ের নাম দিলাম আমি কুসুম—

কুসুম?

হ্যাঁ।

মধু গুপ্ত মিথ্যা বলে নি।

এমন একদিন ছিল, স্ত্রী নীরজাসুন্দরীকে মধু গুপ্ত মনের মধ্যে কোথায়ও স্থান দিতে পারে নি। স্থান দেওয়া তো দূরের কথা—নীরজাকে সামনে দেখলেও মনটা তার বিরক্তিতে ভরে উঠত।

নীরজাও সেদিন নিঃশব্দে দূরে সরে গিয়েছিল।

স্বামীর মনের কথা জেনেই সে পারতপক্ষে স্বামীর সামনে বড় একটা আসত না। কিন্তু মনের মধ্যে তার একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে যদি সতী নারী হয়ে থাকে—কায়মনোবাক্যে যদি সে স্বামীকেই একমাত্র ভজনা করে থাকে—মনে মনে শ্রদ্ধা করে থাকে তো একদিন স্বামী তার প্রতি প্রসন্ন হবেনই। নিরুৎসাহ হয়নি সে। তার একান্ত কামনা ফলবতী হয়েছে। মধু গুপ্ত সমস্ত মন-প্রাণ দিয়েই স্ত্রীকে গ্রহণ করেছে। সত্যিই ভালবেসেছিল মধু গুপ্ত নীরজাকে। নীরজার পাশে আর এক নারীকে এনে সংসারে স্থান দেওয়া আজ তার পক্ষেও সম্ভব নয়।

সে-রাত্রে আনন্দ বিদায় নেবার পর দ্বিতলে এসে দেখলো নীরজা তার শয্যাটি পরিপাটী করে গুছিয়ে রাখছে।

নীরজা টের পায় নি স্বামী এসে কক্ষে প্রবেশ করেছে।

নীরজা!

স্বামীর ডাকে ফিরে তাকাল নীরজা।

আনন্দবাবু চলে গেলেন?

হ্যাঁ।

মুখটা অমন গম্ভীর কেন?

নীরজা!

বলো।

একটা কথার সত্য জবাব দেবে?

কি কথা!

আনন্দকে তুমি কিছু বলেছিলে?

কি বলব!

আমাদের সন্তান হলো না বলে—

শান্ত গলায় নীরজা বললে, কথাটা তো কিছু মিথ্যা নয়।

নীরজা!

ঠাকুরের বংশ থাকলো না—স্বর্গে বসে তিনি হয়ত—

লেখাপড়া শিখেও তোমার মনে আজো এত অন্ধ-কুসংস্কার নীরজা ?

সংস্কার নয়—

তবে কি ? মৃত্যুর পর কি হয় বা হতে পারে তা কেউ জানে ? স্বর্গ নরক সব মানুষের কল্পনাবিলাস ! আর সেই কল্পনাবিলাসের জন্ম আমাদের চিরাচরিত অন্ধকুসংস্কার থেকেই—

না না—

হ্যাঁ, তাই। আমি তো তোমাকে বলেই দিয়েছি, আমাদের সন্তান হলো না বলে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই—কোন দুঃখ নেই। সকলেরই কি সন্তান হয় ? তবে—

কি তবে ?

তোমার মনের মধ্যে যদি কোন দুঃখ থাকে, তুমি অনায়াসে দত্তক নিতে পারো।

আচ্ছা এবার আমার একটা কথার জবাব দাও, এক বা একাধিক বিয়ে কি কেউ এ সংসারে করে না ?

করে—তবে সেটা অন্যায়, পাপ—

অন্যায় ? পাপ ?

হ্যাঁ। আমার হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলে বিদ্যাসাগর মশাই যেমন বিধবাদের বিবাহের জন্য আইন পাস করিয়ে নিয়েছেন, আমিও পুরুষের একাধিক বিবাহ বন্ধ করার আইন পাস করিয়ে নিতাম। আজকের দিনে প্রায়ই যা ঘটছে—

নীরজার অধরোষ্ঠে হাসি দেখা দেয়।

হাসছো ?

তা কি করবো, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। শহরের একজন বড চিকিৎসকই হয়েছ, বুদ্ধি—কথাটা শেষ না করে নীরজা বললে, দেখো আমি জানি তুমি আমার মুখের দিকে চেয়েই আবার বিবাহ করতে সম্মত হচ্ছো না, কিন্তু—

না নীরজা, কথাটা পুরোপুরি তা নয়—অবিশ্যি এটা ঠিক তোমার কারণটা অন্যতম মুখ্য কারণ, কিন্তু আরো আছে—আমার জীবনের একটা নিজস্ব প্রিন্সি-পাল আছে—দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটাকে আমি অন্যায় মনে করি। কোন পুরুষেরই এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে—আচ্ছা কেন তুমি ঐ তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো, বেশ সুখে আনন্দেই তো আছি আমরা—

একে আনন্দ বলে, সুখ বলে ? সন্তান না হলে—বিবাহিত জীবনে পুরুষ বা নারী কেউই পূর্ণ হতে পারে না। জীবনটাই যে মরুভূমি হয়ে যায়। কথাগুলো

বলতে বলতে নীরজার চোখের কোণ দুটো জলে ভিজে ওঠে।

মধু যেন কতকটা অবাক বিস্ময়েই স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ওর স্ত্রী নীরজাকে।

কিন্তু কথা আর এগুলো না, ঠিক ঐ সময় ভৃত্য এসে বললে, একজন লোক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মধু গুপ্ত তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

ভৃত্য সঠিক সংবাদটি দেয় নি। কারণ সে জানত না ঠিক ব্যাপারটা। মধ্য-বয়সী একটি ভৃত্যশ্রেণীর লোক নীচের বসবার ঘরে মধু গুপ্তর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

মধু গুপ্ত প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসছো? কি চাও?

ডাক্তারবাবু, আমি আসছি চেতলা থেকে।

রোগীর অবস্থা কি খুব খারাপ?

সত্যিই খারাপ ডাক্তারবাবু, আপনি যদি এখুনি একটিবার চলেন আমার সঙ্গে তো বড ভাল হয়, আমি সঙ্গে গাড়ি এনেছি।

ঠিক আছে তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

রাত্রি তখন বারোটা প্রায় বাজে।

জনশূন্য রাজপথ। কদাচিৎ একজন বা দুজনকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি ঘরঘর চাকার শব্দ তুলে মন্থরগতিতে চলেছে।

মধু প্রশ্ন করে, কি হয়েছে রোগীর?

তা ঠিক জানি না ডাক্তারবাবু—

জান না?

আজ্ঞে না। আমি আসছি গিরিবালা আশ্রম থেকে। দুঃস্থ বিধবা মেয়েরা ঐ আশ্রমে থাকেন।

মধু নামটা শুনেছিল গিরিবালা আশ্রমের, কিন্তু কোথায় সেটা এই শহরের মধ্যে জানত না।

লোকটি আবার বললে, অসুস্থ আশ্রমের বড়মা। আজ কুড়ি-বাইশ দিন ধরে একটানা জ্বর চলেছে। একেবারে শয্যাশায়িনী।

আগে কোন ডাক্তারকে দেখাও নি?

না।

কেন?

বড়মাই ডাক্তার ডাকতে দেন নি।

কেন ?

তা জানি না ডাক্তারবাবু, তবে কোন ডাক্তার যে তাঁকে আজ পর্যন্ত দেখে নি তা জানি।

তবে আজ ডাক্তার ডাকতে এলে ?

বড়মা তো অজ্ঞান হয়ে আছেন সন্ধ্যা থেকে। মধ্যে মধ্যে ভুল বকছেন। আশ্রমের ছোটমা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে।

ছোটমা হঠাৎ এত দূরে আমাকে ডাকতে পাঠালেন কেন তোমাকে ? কাছাকাছি আশপাশে কি আর কোন ডাক্তার ছিল না ?

ছিল—

তবে ?

তা জানি না, আমাকে আপনার ঠিকানা দিয়ে বলে দিলেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

মধু আর কোন প্রশ্ন করলো না। প্রশ্ন করাটাও সমীচীন বোধ করল না কারণ লোকটি ভৃত্যশ্রেণীর—তার পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয়—তাছাড়া সে সামান্য আজ্ঞাবহ মাত্র।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ি এসে আদিগঙ্গার ধারে একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

ভৃত্যই আগে নামল গাড়ি থেকে, তারপর গাড়ির দরজা খুলে আহ্বান জানাল, নামুন আজ্ঞে।

দরজার কড়া নাড়তে একটু পরে দরজা খুলে গেল।

একটা সেজবাতি হাতে উন্মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বছর চল্লিশের বয়সের একটি মহিলা, পরনে সাদা থান। বোঝা যায় মহিলা বিধবা।

ছোটমা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

বৃন্দাবন ওঁকে ভিতরে নিয়ে এসো। আসুন ডাক্তারবাবু, মহিলা বললে।

বাড়িটা বেশ বড়। উপরে নীচে অনেকগুলো ঘর। সব ঘরেরই দরজা বন্ধ দেখা গেল।

একতলার শেষপ্রান্তের একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল মধু গুপ্ত অগ্রবর্তিনী মহিলাকে অনুসরণ করে। ঘরের দরজা ঈষৎ ভেজানো ছিল এবং দরজার মধ্যবর্তী সামান্য ফাঁক দিয়ে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল।

মহিলা আগে ভেজানো দরজাটা টেনে ভিতরে প্রবেশ করল—মধু গুপ্ত তার

পশ্চাতে পশ্চাতে কক্ষমধ্যে পা রাখল।

ঘরের কোণে একধারে একটি দীপাধার, সুদৃশ্য কাঁচের ঢাকনার মধ্যে একটি সেজবাতি জ্বলছিল, তার মৃদু আলোয় কক্ষটি স্বল্পালোকিত।

সেই আলোতেই মধু দেখলো, একটা চৌকির উপরে সামান্য শয্যায় একটি মহিলা শয়ন করে আছে। তার মাথার চুল খোলা—মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না মৃদু আলোর জন্য।

কি হয়েছে ওঁর? মধু গুপ্ত প্রশ্ন করে।

আপনি দেখুন—আপনিই তো ডাঃ মধুসূদন গুপ্ত?

হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা এবারে হাতের সেজবাতিটা শায়িতা রোগিণীর মুখের সামনে তুলে ধরল।

কে—কে ও? চমকে ওঠে মধুসূদন।

ক্ষণকালের আকস্মিকতা ও বিস্ময় কাটাবার পর আরো দু'পা এগিয়ে এলো রোগিণীর শয্যার পার্শ্বে মধুসূদন। না, তার ভুল হয় নি।

শয্যায় শায়িতা কাদম্বিনীই।

চিনতে পারছেন ডাক্তারবাবু?

মধুসূদন তাকায় প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে।

চিনতে পারছেন না? কাদম্বিনী!

হ্যাঁ, আপনি—

আমার নাম বিমলা। এই আশ্রম ওঁরই তৈরী। ওঁরই অর্থে—ওঁরই প্রাণ-ঢালা সেবায় ও পরিশ্রমে। ওঁকে আমরা মা বলেই ডাকি এই আশ্রমের সকলে।

কত দিন—কত দিন হবে—মধুসূদন মনে মনে বোধ করি হিসাব করার চেষ্টা করে, খুব কম করেও বছর আট তো হবেই। অনেকগুলো বছর। কিন্তু আট বৎ-সর পরেও মধুর চিনতে কষ্ট হল না কাদম্বিনীকে, কেবল শরীরটাই যা কৃশ হয়ে গিয়েছে, নচেৎ এই আট বছরেও কাদম্বিনী এতটুকু বদলায় নি।

বুকের মধ্যে একটা আবেগ একটা অস্থিরতা যেন অনুভব করে মধুসূদন। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কাদম্বিনী কোথায় আত্মগোপন করেছিল!

আর যে জীবনে মধুর কাদম্বিনীর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেও পারে নি। কিন্তু আজ রোগক্লিষ্ট কাদম্বিনীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে মধুর মনে হচ্ছে সে কাদম্বিনীকে ভোলে নি, ভুলতে পারে নি। নীরজার প্রাণঢালা ভালবাসা সত্ত্বেও কাদম্বিনীর স্মৃতি তার মনের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

বুকটার মধ্যে কি কাঁপছে ?

মধু এগিয়ে গিয়ে কাদম্বিনীর শয্যার ধারে রক্ষিত ছোট একটি টুলের উপর উপবেশন করল।

প্রথমে নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলো, নাড়ীর গতি দ্রুত।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যেন। চেতনাহীন কাদম্বিনী।

স্টেথো দিয়ে বেশ ভাল করে বুক পিঠ পরীক্ষা করল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশন বের করে ইঞ্জেকশন দিল। কাদম্বিনীর কিন্তু সাড়া নেই। চুপ-চাপ বসে রইলো টুলটার ওপরে মধুসূদন অপলক দৃষ্টিতে রোগিণীর দিকে তাকিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে কাদম্বিনী ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, উঃ মাগো।

এক বালতি ঠাণ্ডা জল আনতে পারেন ?

ঠাণ্ডা জল ! বিমলা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, মাথাটা ধুয়ে দিতে হবে আর গা-টা স্পঞ্জ করে দিতে হবে।

মা ভাল হবেন তো ডাক্তারবাবু ? বিমলা শুধায়।

জ্বরটা ভাল না। দেখি কি করতে পারি।

আমাদের যে আর এ সংসারে কেউ নেই ডাক্তারবাবু। বিমলা কেঁদে ফেলল।

কাঁদবেন না। যান এক বালতি ঠাণ্ডা জল তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন।

বিমলা চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে চলে গেল। এবং একটু পরে এক বালতি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। ইতিমধ্যে আশ্রমের অন্যান্য মেয়েরা এসে দরজার সামনে ভিড় করে। সকলের চোখেই উৎকণ্ঠা।

আপনারা এ সময়ে এখানে ভিড় করবেন না। মধুসূদন বললে। মেয়েরা দরজা ছেড়ে চলে গেল।

দরজা ও জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ করে দিন, মধুসূদন বিমলাকে বললে।

বিমলা দরজা ও জানালা বন্ধ করে দিল। বিমলাকেই সাহায্য করতে বললে মধুসূদন।

মাথা ধুইয়ে গা স্পঞ্জ করার পর গায়ের তাপমাত্রা একটু একটু করে কমতে লাগল। শেষরাত্রির দিকে কাদম্বিনীর জ্ঞান ফিরে এলো। সে চোখ মেলে তাকাল।

মধুসূদন কাদম্বিনীর কপালে হাত রেখে মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকল, কাদম্বিনী !

কাদম্বিনী তাকাল সেই ডাকে মধুসূদনের মুখের দিকে।

এখন কেমন বোধ করছো ?

ভাল।

কাদম্বিনী চেয়ে আছে মধুসূদনের মুখের দিকে।

কি দেখছো? মধুসূদন প্রশ্ন করে।

তুমি—

চিনতে পেরেছো?

তুমি—

হ্যাঁ আমি, মধু। তারপর বিমলার দিকে তাকিয়ে বললে, গরম দুধ একটু আনতে পারবেন?

এখুনি আনছি। বিমলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মধুসূদন কাদম্বিনীর কপালে হাত বুলোতে থাকে। কাদম্বিনী তার ডান হাতটা বাড়িয়ে মধুর হাতটা চেপে ধরল।

কিছু বলবে, কাদম্বিনী? মধুসূদন শুধায়।

তুমি কি করে সংবাদ পেলে?

তুমি যে মনে মনে আমাকে ডাকছিলে, সেই ডাক শুনতে পেয়েই তো—

কেন—

কাদম্বিনী!

কেন তুমি এলে?

এখনো বুঝতে পারছো না কাদম্বিনী, তোমাদের ভগবানই আবার আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাদম্বিনী কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে। দুটি চক্ষু মুদ্রিত। মুদ্রিত দুটি চক্ষুর দু'কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এভাবে নিজেকে নির্বাসিত করেছিলে কেন কাদম্বিনী? এত কাছে থেকেও কেন এতদিন জানতে দাও নি আমাকে?

এখন তো আমি ভাল হয়েছি, এবার তুমি যাও—

চলে যাবো?

হ্যাঁ, যাও।

বিমলা দুধের পাত্র হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

ডাক্তারবাবু দুধ—বিমলা বললে।

ওকে খাইয়ে দিন দুধটা।

বিমলা দুধটা খাইয়ে দিয়ে মুখটা আঁচলে মুছিয়ে দিল কাদম্বিনীর।

একটা কাগজ দিন—একটা মিকশ্চার লিখে দিয়ে যাচ্ছি, চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়াবেন মিকশ্চারটা। মধুসূদন বললে।

বিমলা দুধের শূন্য পাত্রটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তোমার স্ত্রী—

নীরজার কথা বলছো।

হ্যাঁ, কোথায় সে ?

কেন আমার কাছে ?

তাকে, আমার কথা—

নিশ্চয়ই বলবো। সে নিশ্চয়ই আসবে তোমাকে দেখতে।

না, না, না—

বলবো না ?

না। আর—

আর কি বল !

এখানে আর তুমি কখনো আসবে না, আমাকে কথা দাও।

আসবো না ?

না। দাও—কথা দাও—

কিন্তু কাদম্বিনী—

না, না—তোমাকে দেখলে আবার আমি দুবল হয়ে পড়বো।

বেশ, তাই যদি তোমার মনের একান্ত বাসনা হয় তো আসবো না আর—

না—এসো না।

একটা কথার জবাব দেবে কাদম্বিনী ?

বল।

যতীশ জানে তুমি এখানে আছো ?

না।

জানে না ?

না। সে জানে আমি পরিব্রাজিকার জীবন নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—

পরিব্রাজিকা ?

হ্যাঁ। মাস আষ্টেক ঘুরেছিলাম হিমালয়ে কিন্তু—

কিন্তু কি ?

আনন্দ বা সুখ কোনটাই পেলাম না। কথা বলতে বলতে কাদম্বিনী হঠাৎই যেন থমকে থেমে গেল।

কি হলো, চুপ করে গেলে কেন ?

বিমলা ঐসময় কাগজ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

বিমলার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিল মধুসূদন। বললে, ওষুধটা আনিয়ে নিতে পারবেন তো?

পারবো। আমি এখুনি পাঠাচ্ছি।

বিমলা আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ভোরের প্রথম আলোর ইশারা তখন জানালা-পথে কক্ষের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।

মধু! কাদম্বিনী ডাকল।

বল?

নীরজার কোন সন্তান হয় নি?

না।

তবে—

কি, তবে? কথাটা বলে মৃদু হাসলো মধুসূদন, সকলেরই তো সন্তান হয় না কাদম্বিনী। তবে আমার সে জন্য কোন দুঃখ নেই, নীরজা অবিশ্যি—সে কি বলে জান?

কি?

আমাকে আবার বিবাহ করতে!

আবার বিবাহ? না না, মধু—

ভয় নেই তোমার কাদম্বিনী—তোমার মধুকে কি তুমি চেনো না! আচ্ছা আজ উঠি—

আমার কথাটা মনে থাকবে তো?

একটা অনুরোধ করবো? যে কটা দিন তুমি পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে ওঠো, একটিবার করে এসে তোমায় দেখে যাবার অনুমতি দেবে?

আমি তো ভাল হয়েই গিয়েছি—

না। কথা দিচ্ছি তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর আর আসবো না।

না, না—তুমি আর এসো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

ভয় হচ্ছে বুঝি!

তোমাকে নয়—

তবে?

ভয় আমার নিজেকে—

কাদম্বিনী!

মুখটা ফিরিয়ে নিল কাদম্বিনী।

বাইরে আসতেই বারান্দায় বিমলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মধুসূদনের।—এই যে, যাবার আগে আপনাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার ছিল—

আপনার কথা জানলাম কি করে, ঠিকানাটা আপনার কোথা থেকে পেলাম—তাই কি ?

হ্যাঁ।

একটা খাতা আছে—

খাতা !

সে খাতায় মা'র অনেক কথা লেখা। সেই লেখা চুরি করে একদিন কিছু কিছু পড়েছিলাম। তার মধ্যে কেবল আপনারই কথা—সেই খাতা থেকেই আপনার সব কথা ও আপনার বর্তমান ঠিকানাটা পেবেছিলাম জানতে।

সেই খাতাটা আমাকে দেবেন ?

ওমা, সে কি ! কি করে তা সম্ভব ?

পড়ে আবার আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাবো—

সে খাতা যে মা'র শিয়রের উপাধানের তলায় থাকে সর্বদা।

মধুসূদন আর কিছু বললো না। রাস্তায় এসে নামলো।

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হয় নি মধুসূদনকে আবার পৌঁছে দেবে বলে। মধুসূদন গাডিতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

মধুসূদন ভাবছিল চলন্ত গাড়িতে বসে বসে।

কাদম্বিনী তাহলে বেঁচেই আছে ?

কাদম্বিনী বেঁচে আছে !

২৯

নীরজা সারাটা রাত্রি স্বামীর প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে-চেয়েই বসে বসে কাটিয়েছে।

নীরজা চিন্তা করছিল বসে বসে ঘরের মধ্যে, সেই যে তার স্বামী মধ্যরাত্রে এক রোগীর বাড়িতে গেল, প্রায় ভোর হয়ে এলো—এখনো সে ফিরল না কেন ?

অবিশ্যি এমন ঘটনা যে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি তা নয়।

হামেশাই ঘটে থাকে। তবু কেন জানি আজ নীরজা বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একসময় গাড়ির চাকার শব্দে তার সম্বিৎ ফিরে এলো।

বাতায়নপথে উঁকি দিয়ে দেখলো, তার স্বামী গাড়ি থেকে অবতরণ করছেন।

নিশ্চিন্ত হলো নীরজা। ছেলেমেয়ে কিছু না থাকায় স্বামীর প্রতি নীরজার ভাল-বাসাটা কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার নারী-জীবনের অতৃপ্ত অপত্যস্নেহ যেন তার স্বামীকে ঘিরেই একটা তৃপ্তির পথ খোঁজে তার নিজের অজ্ঞাতেই। নারীর স্ত্রী ও জননীর সমস্ত ভালবাসা প্রেম ও স্নেহ দিয়ে যেন নীরজা স্বামীকে আগলে আগলে বেড়াত সর্বক্ষণ।

সে একাধারে ছিল স্ত্রী ও জননী। আর ঐ দ্বিমুখী আকর্ষণে মধুসূদন তার স্ত্রী নীরজার কাছে ছিল দুটি ভিন্ন স্বাদের বস্তু।

বস্তুতঃ নীরজা যে তার স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য বলতো, তার মধ্যেও সে মধুসূদনের সুখটুকুর কথাই ভাবতো। তার মধ্যে তার নিজের চিন্তা ছিল না। স্বামীকে সুখী করার ইচ্ছাটাই ছিল প্রবল।

মধুসূদন কক্ষে প্রবেশ করতেই নীরজা বললে, এত দেরি হলো যে তোমার?

তুমি কি সারাটা রাত জেগেই ছিলে নীরজা?

চিন্তা হয় না বুঝি? সারাটা রাত কোথায় রইলে—

এমন তো আগেও হয়েছে নীরজা—

তা হোক। এবারে একটু বিশ্রাম করে নাও।

বাইরের পোশাক ছাড়বার জন্য নীরজা একপ্রস্থ ধুতি ও বেনিয়ান এনে ধরল সামনে।

শয়ন করেও মধুসূদনের চোখে ঘুম আসে না।

একটু গরম দুধ খাবে?

দুধ!

হ্যাঁ। সেই কখন খেয়েছো! নীরজা বললে।

তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না নীরজা, তুমি আমার পাশে এসে বসো।

নীরজা আর দ্বিরুক্তি করে না। পরম স্নেহে স্বামীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, আজ আর অত সকাল সকাল ডাক্তারখানায় বের হয়ো না।

নীরজা!

কিছু বলছো?

আজ যে রোগিণীকে দেখতে গিয়েছিলাম, সে কে জান?

কে? তোমার কোন পরিচিত নাকি?

শুধু পরিচিত বললেই বোধ হয় সবটা বলা হয় না নীরজা—

কে গো?

অনুমান কর—

কেমন করে করবো ?

করই না—কাকে দেখে এলাম !

সঙ্গে সঙ্গেই যেন জবাবটা উচ্চারিত হলো নীরজার ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে। সে বললে, কাদম্বিনী।

বিস্ময়ে অভিভূত মধুসূদন কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যার উপরে উঠে বসল। বললে, আশ্চর্য ! তুমি বুঝলে কী করে ?

জানি না তো। মনে হলো নামটা হঠাৎ, তাই বললাম।

সত্যি নীরজা, কাদম্বিনীর সঙ্গে এ জীবনে যে আবার কোন দিন দেখা হবে ভাবতে পারি নি।

কিন্তু আমি জানতাম—নীরজা বললে।

তুমি জানতে ? কি জানতে ?

কাদম্বিনীর সঙ্গে আবার তোমার দেখা হবে। এত বড় ভালবাসা, এ কি এমনি করে জলের বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়, না যেতে পারে ! তাহলে যে জগৎটাই মিথ্যে হয়ে যায়।

কিন্তু নীরজা—

তুমি যে ঘুমের মধ্যেও আজো তার নাম ধরে ডাকো।

আমি !

হ্যাঁ, তুমি। কত দিন ডাকতে শুনেছি তোমাকে !

নীরজা—

কি ?

তোমাকে আজো ঠিক চিনতে পারলাম না—

কেন ?

ঘুমের মধ্যে কখন কি বলেছি জানি না—আর সেটা আমার ইচ্ছাকৃতও নয়, কিন্তু তুমি—

বিশ্বাস করো, তার জন্য কখনো এতটুকু দুঃখ আমার হয় নি। তুমি যতটুকু আমাকে দিয়েছো, তাই ভগবানের আশীর্বাদের মত মাথায় তুলে নিয়ে নিজেকে নিজে বলেছি—ঐটুকুই যেন আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বজায় থাকে। ঐটুকু নিয়েই যেন একদিন তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে পারি।

মধুসূদন যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভোরের প্রথম আলো জানালাপথে কক্ষে এসে প্রবেশ করছে।

হঠাৎ নীরজার প্রশ্নে চমকে ওঠে মধুসূদন।

কি হয়েছে কাদম্বিনীর ?

মনে হচ্ছে—

কি, খারাপ কিছু নয় তো ?

জ্বরটা এখন একটু কম বটে ইনজেক্‌শন দেবার পর কিন্তু—

কিন্তু কি ?

মনে হয় আবার জ্বর আসবে—

ভয়ের কিছু নেই তো ?

আছে। ও বোধ হয় বাঁচবে না—

কেন কেন, ও-কথা বলছো কেন ?

চিকিৎসা করতে পারলে হয়ত—মানে চেষ্টা করতে পারলে কি হতো বলা যায় না, কিন্তু—

কিন্তু ?

হ্যাঁ, আমি ওকে কথা দিয়ে এসেছি—আর যাবো না সেখানে।

কেন ? না, না—এমন কথা দিলে কেন ?

বোধ হয় তাই ভাল হলো।

ভালো হলো ! কী বলছো তুমি ? না, না—অমন কথা বলো না। যেমন করে হোক কাদম্বিনীকে তোমায় ভাল করে তুলতেই হবে।

বললাম তো, কথা দিয়ে এসেছি আর যাবো না সেখানে।

আমি—আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। চল এখুনি যাবো সেখানে।

কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে এসেছি নীরজা—সত্যভঙ্গ করবো ?

কিসের সত্য ? ঐ সত্যের কোন দাম নেই। তাছাড়া সত্যভঙ্গের যদি কোন পাপ হয়ই সে আমারই হবে, তোমার নয়। আর যদি হয়ও পাপ, জেনো তার চাইতে বড় পাপ হবে আজ যদি একজন চিকিৎসক হয়ে তুমি তোমার চিকিৎসকের ধর্ম থেকে চ্যুত হও।

ঠিক বলেছো নীরজা, মধুসূদন বললে, আজ কাদম্বিনী রোগিণী—আমি একজন চিকিৎসক হয়ে তার চিকিৎসা যদি না করি—কথাটা শেষ করল না মধুসূদন, থেমে গেল অর্ধপথেই।

তুমি কিছু ভেবো না। মনের মধ্যেও সংশয় রেখো না। আজ তার রোগশয্যার পাশে তোমাকে ও আমাকে দু'জনকেই যেতে হবে। তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর আমরা যাবো।

বেলা দশটা নাগাদ একটা গাড়িতে করে দু'জনে—মধুসূদন ও নীরজা চেতলায় আশ্রমের দোরগোড়ায় এসে নামল। বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা হলো।

বৃন্দাবন বললে, আপনি এসেছেন ডাক্তারবাবু, খুব ভালো হয়েছে!

তোমাদের বড়মা কেমন আছেন বৃন্দাবন?

ছোটমার মুখে শুনলাম, আবার বড়মার জ্বর এসেছে।

ঔষধ খাওয়ানো হয়েছিল জানো কিছু?

ঔষধ তো আমি সকালেই এনে দিয়েছি ডাক্তারবাবু—

বিমলা দেবী—মানে তোমাদের আশ্রমের ছোটমা কোথায়?

বড়মার ঘরেই আছেন।

তাঁকে একবার সংবাদ দেবে?

নীরজা ঐ সময় বললে, কাউকে সংবাদ দিতে হবে না। আমি এসেছি—তুমি এসো। চল তো বৃন্দাবন, কোন্ ঘরে তোমাদের বডমা আছেন আমাকে নিয়ে চল।

আসুন আজ্ঞে—

নীরজা বৃন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল।

আধঘণ্টাটাক হবে জ্বরটা আবার এসেছিল কাদম্বিনীর। বিমলা শিয়রের ধারে বসে কাদম্বিনীর মাথায় হাওয়া করছিল চৌকিতে বসে। ওদের পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

বিমলা বললে, ডাক্তারবাবু আপনি এসেছেন, খুব ভাল হয়েছে। বড়মার আবার জ্বর এলো। চিন্তিত হয়ে পডেছিলাম, কি করবো?

আপনি সরুন, আমি ওকে দেখি।

মধুসূদন শিয়রের ধারে বসল। তারপর কাদম্বিনীর রোগতপ্ত কপালে হাতটা রাখল। জ্বরের তাপে যেন ঝলসে যাচ্ছে। মধুসূদনের হাতের শীতল স্পর্শে কাদম্বিনী চোখ মেলে তাকাল, চোখ দুটো রক্তবর্ণ।

তুমি! আবার তুমি এসেছো মধু?

কাদম্বিনী! মধুসূদন মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকল।

কেন—কেন তুমি এসেছো?

দিদি!

নীরজা এসে ইতিমধ্যে কাদম্বিনীর শিয়রের ধারে পায়ে পায়ে দাঁড়িয়েছিল। কাদম্বিনী নীরজার ডাকে তার দিকে তাকাল।

কে ?

দিদি, আমি নীরজা—তোমার ছোট বোন।

নীরজা ?

হ্যাঁ দিদি, ওঁর কোন দোষ নেই। আমিই ওঁকে তোমার চিকিৎসার জন্য জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি। ওঁকে কিছু বলো না।

নীরজা !

বলুন দিদি ?

ওকে তুমি নিয়ে যাও এখান থেকে—

আপনি একটু সুস্থ হলেই উনি চলে যাবেন।

কাদম্বিনী চোখ বুজল ক্লান্তিতে, সত্যিই সে আর যেন কথা বলতে পারছিল না।

দিনতিনেক তারপর জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য কাদম্বিনীকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলে। সেবার ভার নীরজাই নিজের হাতে তুলে নেয়।

ঘণ্টাখানেকের জন্য গৃহে যায়, স্বামীর জন্য কিছু রান্না করে রেখে আবার চলে আসে কোনমতে চারটি মুখে দিয়ে।

জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় কাদম্বিনী ভুল বকে—

মধু, তুমি ফিরে যাও। তোমার সামনে যে আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়ি—কেন বোঝ না, আমাকে আর পাপের ভাগী করো না।

মধু কলেজ থেকে বড় সাহেব ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলো।

তার সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা চলতে লাগল কাদম্বিনীর। দীর্ঘ এক পক্ষ-কাল রোগভোগের পর কাদম্বিনী আবার একদিন উঠে বসল। শীর্ণ দুর্বল দেহ। গলা থেকে একটা চিঁ চিঁ আওয়াজ বের হয়।

একদিন ঐ সময় কাদম্বিনী বললে, এবার তুমি বাড়ি যাও মধু—

তুমি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হও নি কাদম্বিনী !

ইতিমধ্যে মধুসূদন বন্ধু যতীশচন্দ্রকে সংবাদ দেওয়ায় সে প্রায় প্রত্যহই এসে বোনকে দেখে যায়। যতীশ পাশেই ছিল—সে বললে, মধু একজন ডাক্তার—তোর এ সময় মধুর একান্ত প্রয়োজন কাদু !

কাদম্বিনী আর কোন কথা বললো না।

আরো কয়েকদিন পর এক দ্বিপ্রহরে, কাদম্বিনী আরো সুস্থ হয়েছে—নীরজাকে বললে, ধন্য তোমার বুকের পাটা নীরজা !

নীরজা হাসে। বলে, কেন দিদি ?

তোর কি একটুও ভয় করে না রে ?

ভয়! কিসের ভয়?

বোকা মেয়ে—কেন বুঝিস না!

না বোঝার মত বোকা হয় তো আমি নই দিদি—

তুই বোকা—বোকা—

তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না দিদি, ইদানীং কিছুদিন ধরে তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম—

আমার কথা ভাবছিলি?

হ্যাঁ, দিদি।

কেন?

তোমাকে যে আমার আজ বড় প্রয়োজন দিদি—

নীরু!

তুমি ওঁকে বিয়ে কর দিদি, আমি—

নীরজা!

হ্যাঁ সত্যি বলছি, আমি নিজে দাঁড়িযে থেকে সব ব্যবস্থা করবো।

তারপর?

তারপর আবার কি! আমি তো হতভাগিনী, ওঁকে একটি সন্তান দিতে পারলাম না। তোমার কোলে নিশ্চয়ই একটি সন্তান আসবে—তখন সেই সন্তানের মা হবো। মা-মা ডাক শুনে এ জীবন সার্থক করবো। বল দিদি বল—তুমি সম্মত আছো—বলতে বলতে ব্যাকুল আগ্রহে দু'হাত দিয়ে নীরজা কাদম্বিনীর একটা হাত চেপে ধরল।

কাদম্বিনীর বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। এও কি সম্ভব! এমন স্ত্রীলোকও সংসারে আছে—যে হাসতে হাসতে নিজের স্বামীকে অন্য এক স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দিতে পারে!

নীরু, সত্যিই বোধ হয় গতজন্মে তুই আমার বোন ছিলি।

গতজন্মেই বা কেন, এজন্মেও কি আমি তোমার ছোট বোনটি নই দিদি?

নিশ্চয়ই, অস্বীকার করবো কি করে! কিন্তু নীরু, তা কোন দিনই সম্ভব নয়।

কেন—কেন সম্ভব নয় দিদি?

এত বড় আত্মত্যাগ আমার সইবে না বলে—কাদম্বিনী বললে।

দিদি!

গোড়া থেকেই আমার অন্যায় নীরজা—

দিদি?

হ্যাঁ বোন, মধু বিবাহিত জেনেও তাকে ভালবেসেছি কিন্তু যা ঘটে গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না। তাই অনেক দিন আগেই আমি স্থির করেছি—আমার অন্যায়ের এই প্রায়শ্চিত্ত। এ আমার ভাগ্যদেবতারই বিধান।

দিদি !

না বোন, তোর এত বড় ভালবাসা—এত বড় স্বামীপ্রেমের কি অমর্যাদা এতটুকুও হতে আমি দিতে পারি রে! না, তাহলে যে এ বিশ্বসংসারই মিথ্যা হয়ে যাবে !

ঐ মানুষটার কথা একবার ভাবো দিদি—বাইরে আমি যতই ওকে অধিকার করে থাকি না কেন, সমস্ত অন্তর জুড়ে আজো তুমিই আছো। তোমার কথাটা না হয় নাই ভাবলে, অন্ততঃ তাঁর কথাটা একবার ভাবো !

না, অবুঝ হোস নে। আমি আশীর্বাদ করছি তোর সন্তান হবে।

দিদি !

সন্তান হলে আমাকে জানাস, আমি সেদিন যাবো। তোর স্বামীর সন্তানের মা হয়ে যাবো।

মধুসূদনের সুদীর্ঘ চিঠিটা পেয়ে আনন্দচন্দ্র সব কথা জানতে পেরেছিল।

ভাই আনন্দচন্দ্র,

জীবনদেবতা যে আমাদের নিয়ে মধ্যে মধ্যে কি খেলা খেলেন ভেবে বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না ভাই। যে কাদম্বিনী ভেবেছিলাম আমার জীবনের পৃষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণভাবে বুঝি মুছে গিয়েছে—সেই মোছা পৃষ্ঠাগুলো জীবনে কোন দিন যে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠবে কল্পনাও করতে পারি নি।

সেদিন ভেবেছিলাম—জীবনের ঐ পর্বের হিসাবনিকাশ বুঝি শেষ হয়ে গেল। আর এও ভেবেছিলাম, এ ভালই হলো—কাদম্বিনী যদি ঐ ভাবে আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে না মুছে যেতো, নীরজা—আমার ধর্মপত্নীকে বোধ করি কোন দিন মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম না।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি ভুল করেছিলাম।

কাদম্বিনীকে কোন দিনই মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি। অবচেতন মনে তার স্মৃতিকে লালন করেছি।

কথাটা কখন সুস্পষ্ট হয়ে আমার সামনে ধরা দিলে, জানো? যেদিন দীর্ঘ আট বৎসর পরে অকস্মাৎ দৈবচক্রে কাদম্বিনীর রোগশয্যার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম—দৈবচক্রই বলবো, নচেৎ কলকাতা শহরে এত চিকিৎসক থাকতে আমারই বা

ডাক পড়লো কেন তার রোগশয্যার পাশে! আমার জীবনে দুই নারী—

নীরজা আর কাদম্বিনী।

নীরজাকে ভালবাসাই তো ধর্ম, কিন্তু কাদম্বিনীকে ভালবাসা তো বিবাহিত হয়েও আমার ধর্ম নয়।

আমি সেটা বুঝতে না পারলেও কাদম্বিনী সেটা বুঝতে পেরেছিল বলেই আমার জীবন থেকে সে সেদিন ঐভাবে সরে গিয়েছিল। সেই তার কাছে আমার প্রথম পরাজয়।

কাদম্বিনীকে সুস্থ করে তুলেছিলাম।

তারপর অকস্মাৎ একরাত্রে সে হাসতে হাসতে নীরজার কোলে মাথা রেখে ও আমার একটি হাত ধরে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল।

আনন্দ, দ্বিতীয়বার হার হল আমার কাদম্বিনীর কাছে।

কাদম্বিনী একপ্রকার যেন আমার মনে হয় কতকটা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিয়ে তার ও আমার ভালবাসাকে জয়ের মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেল।

কাদম্বিনী প্রমাণ করে দিয়ে গেল ভালবাসা মৃত্যুহীন। আমার প্রতি তার ভালবাসা কত বড়। এ যে আমার জীবনের কত বড় ক্ষতি একমাত্র তুমিই বুঝবে আনন্দ —কারণ তুমি আমার জীবনের সব কথাই জানো—তাই তোমাকে সব জানালাম।

তোমার কথা আমি ভুলি নি—নীরজাকে স্ত্রীর পরিপূর্ণ মর্যাদাই দিয়েছি। নীরজার দুঃখ তার কোন সন্তানাদি হলো না—সে দুঃখ তো আমার ক্ষমতা নেই লাঘব করবার।

সত্যি ওর মুখের দিকে তাকালে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু কি করব বলো?

মধ্যে মধ্যে আমার কি মনে হয় জান আনন্দ, মধুসূদন নামটার মধ্যেই বোধ হয় একটা অভিশাপ আছে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর কথা তোমার কি মনে পড়ে?

সেদিন গিয়েছিলাম দেখা করতে তাঁর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী আঁরিয়েৎ ছেলেমেয়েদের নিয়ে এদেশে ফিরে এসেছেন। তাঁকে দেখে মনে হলো যেন তাঁর জীবনটা বুঝি একটা গ্রীক ট্র্যাজিডি। গ্রীক ট্র্যাজিডির মূল কথা যেমন দুটি ভালোর বা দুটি আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং যার ফলে বিভ্রান্ত নায়কের পতন। মাইকেলেরও দুটি আদর্শ ছিল জীবনে, মহাকাব্য কত দূর—ইংলণ্ড কত দূর!

মেঘনাদবধ কাব্য তাঁর একটি আদর্শের অনবদ্য প্রকাশ—অন্যটিও তিনি ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে এসে ভেবেছিলেন—আর এক মেঘনাদবধ কাব্য বুঝি রচিত হলো। অচিরেই তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু তা হলো

না। কেন হলো না ? মনে হয়, আমার ক্ষেত্রে দুটিই কাম্য, দুটিই বরণীয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে দুটি পাশাপাশি এসে দাঁড়ালে যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য—সেই দ্বন্দ্বে মাইকেল আজ পর্যদুস্ত।

হাতে যা আছে তাতে বাজারও চলে না—চলতে পারে না, কিন্তু এক ব্রাহ্মণ আমারই সামনে এসে যখন তাঁকে জানায় সে কন্যাদায়গ্রস্ত, কিছু সাহায্যপ্রার্থী—মাইকেল তাঁর সব কয়'টি টাকা তার হাতে তুলে দিলেন। আঁরিয়েৎ একটা প্রতিবাদও জানাল না, কেবল দু' ফোঁটা অশ্রু তাঁর শীর্ণ আঁখির কোল ঘেঁষে ঝরে পড়ল।

ঐ এক আশ্চর্য নারী! কোন বিদেশিনী নারী যে এমন হতে পারে আমার ধারণারও অতীত ছিল। কবির প্রতি তাঁর ভালবাসা দিয়ে বোধ করি এক মহা-কাব্য রচিত হতে পারে।

সত্যি অত বড় একটা প্রতিভা আপন খেয়াল খুশি ও অপরিণামদর্শিতার মধ্যে ধীরে ধীরে কি করে নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছে, ভাবলেও কষ্ট হয়।

আজ তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা বোধ করি—তাঁর মেঘনাদবধ মহাকাব্য।

—কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

যার বসা উচিত ছিল মহাবলী রাবণের মত কনক-আসনে—হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র-মিত্র আদি সভাসদ পরিবৃত হয়ে—একি তার ভিখারীর বেশ দেখে এলাম।

আমার জীবনের অভিশাপও বোধ হয় আজ আমাকে ঐ পথেই টেনে নিয়ে চলেছে!

একদিকে আমার ডাক্তারী—এত সাধের চিকিৎসাবিদ্যা যা প্রাণপণে আমি অর্জন করেছি, যা সমাজে আমাকে এনে দিয়েছে অকল্পনীয় প্রতিষ্ঠা—অন্য দিকে আমার প্রেম, ভালবাসা—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে পড়ে আজ ভাই আমি সত্যিই দিশেহারা। না পারছি রোগীদের প্রতি মন দিতে, না পারছি নীরজার প্রতি কর্তব্য করতে।

আজ তুমি নীরজাকে দেখলে চমকে উঠবে আনন্দ—বিষাদের প্রতিমূর্তি—সে আজ সংসারে থেকেও যেন সন্ন্যাসিনী।

চিঠিটা পড়তে পড়তে আনন্দচন্দ্র যেন অতীতের ছাত্রজীবনে চলে গিয়েছিল।

সেই হিন্দু কলেজ—তারপর মেডিকেল কলেজ। সেই দর্মাহাটায় মল্লিক বাড়ি, কলুটোলায় সেন মশাইয়ের ওখানে। সেই সহধর্মিণী—সেই কুসুমকুমারী—

ছাত্রজীবনে বন্ধু বলতে ঐ একজনকেই পেয়েছিল আনন্দচন্দ্র—ঐ মধুসূদন গুপ্ত।

মধু গুপ্তের সাফল্য দেখে কত আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কে জানত তার সেই সাফল্যের অন্তরালে এক অশ্রুনদী প্রবহমাণা। মধুর কথা ভেবে বড় কষ্ট হয় আনন্দচন্দ্রের।

বড় ছেলে দক্ষিণারঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল। ডাকল, বাবা!

কি কথিছো?

আমার স্কুলের সব বইগুলান কিনি দেবা না!

দেহি—সামনের মাসে কলকাতা যাবো মনে করতিছি, তহন—

বই না পালি পড়ি ক্যামনে?

মোনাডা কোহানে—সে স্কুলে যায়? পড়াশুনা করে? তারে তো কখনো বই নিয়ে বসতে দেহি না!

জানি না। দক্ষিণারঞ্জন বললে।

তা জানবা কেন! ছোট ভাইরে একটু দেখবা—তাও পারো না।

ওটা হচ্ছে একটা দস্যি—কারো কথা শোনে নাকি!

ঐ সময় ছয় বৎসরের মনোরঞ্জন—দ্বিতীয় পুত্র এসে ঘরে ঢুকল।

আমার নামে দাদায় কি কতিছে বাবা!

কিছু কয় নাই—পড়াশুনা করতিছো?

করি—

মনে থাহে যেন—তোমরা দু' ভাই-ই ডাক্তারী পড়বা—ডাক্তার হতি হবে তোমাদের।

মনোরঞ্জন বলে, ডাক্তার হলি আমারে সক্কলে টাকা দেবে?

দেবে বৈকি।

তালি পড়বো—

মনোরঞ্জন আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এক বৎসরের কন্যা কুসুম হামা দিয়ে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। পিছনে পিছনে তার পিতামহী ভবসুন্দরী—দেখিছো কি দস্যি মায়েরে বাবা—এই আছে এই নেই!

আনন্দচন্দ্র বড় ভালবাসে ঐ কন্যাটিকে। এগিয়ে গিয়ে কুসুমকে বুকে তুলে নিল।

তরে একটা কথা কমু, ভাবতিছিলাম নশো।

কি কথা মা?

আনন্দ মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

ঐটা তো মায়ের বুকের দুধ কোন দিনই পেল না—একটু দুধের ব্যবস্থা কর !

কোথা থেকে আর করবো মা— দেখছো ত উদয়াস্ত খেটেও ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলাতে পারতিছি না—

তা কলি হবে ক্যান—ছাওয়াল একটু-আধটু দুধ না পালি—

দেহি কি করবার পারি—

অভাব আর অনটন !

কবে যে সুরাহা একটা হবে কে জানে।

৩০

গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা
বিলাপে !
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে।
কর্বুর-গৌরব-রবি।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়—বাহিরে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ডানা মেলে নেমেছে। নিজ কক্ষের মধ্যে মাইকেল অস্থির অশান্ত পায়ে পায়চারি করতে করতে মেঘনাদ বধ তাঁর প্রিয় কাব্যের নবম সর্গ থেকে আপন মনে আবৃত্তি করে চলেছেন—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?

স্ত্রী আঁরিয়েৎ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

কে ?

আমি—

আঁরিয়েৎ !

তুমি দিবারাত্র এত ভাবো কেন বলতে পারো ?

ভাবি কেন—মাই ডিয়ার, ভাবনা যে আমার চিরসঙ্গী—চিরসাথী—

ভেবে ভেবে তোমার ইদানীংকার চেহারা কি হয়েছে একবার আর্শীতে দেখ তো।

জান আঁরিয়েৎ, অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ছে—বিলাতযাত্রার আগে কিছুদিনের জন্য সাগরদাঁড়িতে গিয়েছিলাম—সেই মধুভরা নদী কপোতাক্ষ—

আহা, my dream !

সাগরদাঁড়ি আর কপোতাক্ষর কথা উঠলে মধু যেন আর মধুতে থাকেন না। কোন্ দূর এক স্বপ্নের রাজ্যে তাঁর মন চলে যায়।

মধু বলতে থাকেন, তুমি তো শুনেছ আমার মামার কথা—শ্রীযুক্ত বংশীধর ঘোষ। তিনি এসে বললেন, মধু, তুই বিদেশে চলে যাচ্ছিস? আবার কবে দেখা হবে কে জানে? দেশে আসাই আর হবে কিনা কে বলতে পারে!

মধু বললেন, ইংলণ্ড তো আমার মাতৃভূমি নয় মামা, তুমি দেখে নিও আমার এই চির শস্যশ্যামল জন্মভূমিতে আবার খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো।

তা আসবি জানি। আমি বলছিলাম—

কি মামা?

ক'টা দিনের জন্য আমার ওখানে চল না—যাবি?

যাবো মামা।

কাটিপাড়ায় মাতুলালয় মধুর। মধু গেলেন মাতুলালয়ে। মামীমা মধুকে ভালবাসতেন, কিন্তু হাজার হোক সেকেলে হিন্দু মহিলা—কুসংস্কার ও ধর্মের গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন।

খ্রীষ্টান মধু—খ্রীষ্টানের ছোঁয়ায় যদি থালা-বাসন সব নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে মামীমা মধুকে মাটির গেলাস ও কলাপাতায় খেতে দেন।

বংশীধর কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলেন, এসে দেখেন মধুর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কলাপাতায় ও মাটির গেলাসে তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড ক্রোধে বংশীধর জ্বলে উঠলেন। তিনি চাকরটাকে এক লাথি মেরে ফেলে দিলেন।

মধু বললেন—মামা, ওকে কেন মারলেন! ওর তো কোন অপরাধ নেই। আমি খ্রীষ্টান, সোনার বাসনে খেলে তা তো নষ্ট হয়ে যেত।

মামা বংশীধর বলে ওঠেন, যায় আমার যাবে, তাতে অন্যের কি? এক সেট সোনার বাসন বড়, না আমার ভাগ্নে মধুসূদন বড়?

মধুর চোখের কোণে জল এসে যায়।

ওরা জানবে কি করে—মহাকাব্যের রচয়িতা মধুসূদনকে মাটির পাত্রে খেতে দিয়ে ওরা তোকে অপমান করে নি—ওরা নিজেরাই ছোট হয়েছে!

মধুসূদন একটু হেসে বললেন—জান আঁরিয়েৎ, পরের দিন থেকে আমাকে সোনা

ও রূপোর বাসনে খেতে দেওয়া হয়েছিল। ক'টা দিন তারপর বড় আনন্দে কাটল।

আঁরিয়ৎ বুঝতে পারে, সুন্দর অতীত—আনন্দের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে স্বামীর বুকের মধ্যে অশ্রু ঝরছে।

মধুসূদন ঐ সময় লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে বসবাস করছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার বিয়ার্ড কাউচ তাঁর প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখিয়ে অযাচিতভাবে প্রিভি-কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগের প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন, মাসিক বেতন দেড় হাজার টাকা।

কিন্তু মধুর মাসিক দেড় হাজার টাকায় কি হবে? তাঁর দশ দিনের খরচাও তাতে ওঠে না। তাই মধু সে চাকরি ছেড়ে আবার ব্যারিস্টারি শুরু করেছেন।

সেই সঙ্গে আবার নতুন করে ধার করা শুরু।

শরীর ভেঙ্গে পড়েছে মধুর। হাইকোর্টে প্রায়ই যেতে পারেন না। ফলে যা হবার তাই হলো—ক্রমশঃ রোজগারপাতি কমে যেতে লাগল। সবদা পাওনা-দারদের তাগাদা। পাওনাদারদের ভয়ে মধু বাইরে কেউ এলে তার সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা, সর্বদা দরজা বন্ধ করে রাখেন।

আঁরিয়ৎ বললে, তুমি যদি এভাবে ভেঙ্গে পড় তো আমি কোন্ আশায় বুক বাঁধি বল?

আঁরিয়ৎ, আমার মধ্যে মধ্যে কি মনে হয় জান,আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমার নিজের ভাগ্য জড়িয়ে সারাটা জীবন তুমিও দুঃখই পেয়ে গেলে!

ছিঃ ছিঃ, ও-কথা বলো না, আমার মত সৌভাগ্যবতী কয়জন নারী এ সংসারে আছে?

মাইকেল মৃদু হাসলেন।

দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেবো না।

হায় রে আশা কুহকিনী—তারপর একটু হেসে বললেন,

> কর্বুর-গৌরব রবি চির রাহুগ্রাসে।
> সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
> লভিতে কি এই ফল?

দরজায় করাঘাত শোনা গেল।

কে? Who's there?

সাব্, আমি বেয়ারা। একজন বাবু—

না, না। আঁরিয়ৎ বলে দাও, মাইকেল গৃহে নেই।

ঐ সময় বাইরে এক পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, মধু আছো নাকি হে? আমি রাধা-কিশোর, হুগলীর খেজুর গ্রাম থেকে আসছি।

কে? রাধাকিশোর?

মধু এগিয়ে গিয়ে নিজেই দরজা খুলে দিলেন। এসো, এসো রাধা।

এ কি হে, ঘর অন্ধকার কেন?

চির অমাবস্যার রাত্রি বন্ধু!

ঐ সময় ভৃত্য ঘরে একটি সেজবাতি নিয়ে ঢুকল।

Let there be light and there was light! এসো, বহুকাল পরে, তারপর?

একটা বিশেষ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি ভাই মধু।

বিপদ? কিসের বিপদ?

একটা বিশ্রী মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি।

মামলা?

হ্যাঁ। তুমি যদি অনুগ্রহ করে আমার মামলাটার ভার নাও!

কিন্তু আমি কি ভাই পারবো? Mentally and bodily I am ruined. পারব কি তোমার কাজ করতে?

পারবে, নিশ্চয়ই পারবে।

আজ প্রায় এক মাস আমি বাড়ি থেকে বের হই না।

আমি সঙ্গে করে তোমায় নিয়ে যাবো।

ঠিক আছে, তুমি যদি কোন রকমে আমাকে আদালতে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে চেষ্টা করবো তোমার কাজটা করে দিতে।

ঠিক আছে—আমি নিজে তোমায় এসে নিয়ে যাবো। তাহলে সেই কথাই রইল কেমন?

বেশ।

কয়েক দিন পরে রাধাকিশোর এলো।

তিনি বুদ্ধিমান লোক, ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। পালকিতে করে গঙ্গাতীর পর্যন্ত মধুকে নিয়ে এসে নিজের বজরায় নদী পার হয়ে আর একটা পালকিতে মধুকে বসিয়ে হাইকোর্টে নিয়ে এলেন।

মধু কাজটা করে দিলেন।

রাধাকিশোর মধুকে প্রচুর টাকা দিতে চাইলেন কিন্তু মধু বললেন, বল কি

কিশোর, তুমি আমার বন্ধু, তোমার কাছ থেকে টাকা তো আমি নিতে পারি না!

কেন পার না, যাকে দিয়েই কাজটা করাতাম, তাকেই টাকা দিতে হতো।

না, না। Not a word more! ওই অনুরোধ তুমি আমাকে করো না ভাই।

দেখ মধু, কিছু মনে করো না—আমি জানি তোমার বর্তমানে খুবই টাকার প্রয়োজন, টাকাটা নাও।

উঁহু। টাকা নিতে পারবো না—তবে তুমি যদি একান্তই কিছু দিতে চাও আমাকে তোমার ঐ কাজের জন্য, well—তাহলে তুমি বরং আমাকে এক বোতল বারগেণ্ডি, ছ'টা বীয়ার আর একশো মালদার আম দিও।

হায় রে, এমন মানুষ মধু! শুধু প্রতিভা নয়, বিরাট একটা হৃদয় ছিল তাঁর।

অর্থের প্রয়োজন অথচ তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্য তাঁকে কুণ্ঠিত করেছে। পাওনাদারেরা সর্বক্ষণ তাঁকে উত্ত্যক্ত করছে, কিন্তু নিজের পাওনা টাকা নিতে পারেন নি।

রাধাকিশোর তথাপি বারংবার টাকা নেবার জন্য মধুসূদনকে অনুরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু মধুর সেই এক কথা—টাকা নিতে পারবো না।

ধারদেনায় এবং পাওনাদারদের তাগিদে তাগিদে উত্ত্যক্ত মধু বাড়ির বাইরে পর্যন্ত যান না, তারই মধ্যে হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করছেন।

সবটা নয়, কিছুটা অনুবাদ করে 'হেক্টর বধ' নাম দিয়ে বইটি প্রকাশ করলেন, উৎসর্গ করলেন বইটি বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে।

কিন্তু ঐ ভাবে কি আর সাহিত্য সৃষ্টি চলে? বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত মন নিয়ে? ভিতরে ভিতরে মধু মুষড়ে পড়তে থাকেন।

মহাদেব চাটুয্যে মধুর জমিদারি গ্রাস করে নিয়েছে, মধু একটি ক্ষীণতম প্রতিবাদও জানালেন না। যাক—সব যাক।

মামা সব শুনে বললেন, তুমি সব বিলিয়ে দিলে মধু?

মধু বললেন, আপনি জানেন না মামা, ঐ মহাদেব চাটুয্যে আমাকে আমার দুর্দিনে টাকা দিয়ে যে উপকার করেছিল, মনে করবো এ তারই ঋণ শোধ হলো।

আঁরিয়েৎ টাকার অভাবে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে। হাতে তাঁর তখন মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা অবশিষ্ট। গ্রামের পণ্ডিতমশাই এলেন মধুর সঙ্গে দেখা করতে।

উচ্ছ্বসিত ভাবে পণ্ডিতমশাই ছাত্রের প্রশংসা করলেন।

মধু তাঁর একদা পাঠশালার শিক্ষাগুরুকে প্রণামী দিলেন পঞ্চাশ টাকা।

আঁরিয়েৎ বললে, কিছু কম দিলে হতো না, আমাদের এই অভাবের সংসারে—

মধু বললেন, আমার পণ্ডিতমশাই, একশো টাকা দিতে পারলেই ওকে ভাল হতো।

আঁরিয়েৎ আর কি বলবেন—একেবারে চুপ। চেনে তো সে তার স্বামীকে।

ক্রমশঃ মধুর শরীরও ভাঙ্গতে শুরু করে।

অভাব, অভাব আর অভাব!

কোন অর্থাগম নেই কোন দিক থেকে। তার উপরে শরীরও অসুস্থ। আঁরিয়েৎ চোখে অন্ধকার দেখে। লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে আর থাকা সম্ভব নয়। মধু গৃহ বদল করলেন। লাউডন স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে এসে উঠলেন বেনেপুকুরের অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ার একটা বাড়িতে।

মধুর চোখে জল। রাজা মধুসূদনের এ কি ভাগ্যবিপর্যয়!

মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়াদায়ক বিধি রাবণের ভালে!

প্রিন্স দ্বারকানাথের বাবুর্চি তাঁর বাড়িতে রান্না করতো, তাকে আর রাখা সম্ভব নয় অত মাইনে দিয়ে। একটা চিঠি লিখে তাকে পাঠিয়ে দিলেন বন্ধু গৌরদাস বসাকের গৃহে।

I am sending one of the best cooks—I am sure you will relish his dishes. With love, your Madhu.

ঐ সময় এক মামলার তদ্বির করতে মধু গিয়েছিলেন পুরুলিয়া। পঞ্চকোটের রাজার বড় সাধ মধুকে একটিবার দেখেন। রাজা মধুকে তাঁর গৃহে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য এক কর্মচারীর সঙ্গে পুরুলিয়ায় হাতি, ঘোড়া, পালকি পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তারা গিয়ে শুনলো, মধু কলকাতায় আগের দিনই ফিরে গেছেন।

মধুর শরীর তখন খুবই খারাপ। পঞ্চকোটের আবহাওয়া ভাল। অন্ততঃ স্বাস্থ্যের কারণেই যদি ক'টা দিন মধু পঞ্চকোটে থাকেন, স্বাস্থ্যের উপকার হয়।

তাই পঞ্চকোটের রাজা যখন লিখলেন, আপনাকে দেখবার বড়ই বাসনা। আপনি যদি আমার রাজ্যের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন তো একান্ত খুশী ও বাধিত হবো।

কি ভেবে যেন চাকরিটা করবেন স্থির করলেন মধু।

বন্ধু গৌরদাস এসেছেন মধুর শরীর খারাপ শুনে।

অনেক দিন পরে দুই বন্ধুতে দেখা।

গৌর তুমি এসেছো, ভারী খুশী হয়েছি ভাই !

কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার মধু ?

মধু হাসলেন,

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে।
…কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তার লীলা ?

গৌরদাস মনে ব্যথা পান। মধুর আবৃত্তির মধ্যে যেন একটা কান্নার সুর। মধুকে তো এমনটি পূর্বে কখনো দেখেন নি।

মধু !

বল ভাই।

কিছুদিনের জন্য কোথায়ও গিয়ে ঘুরে আসতে পারতে—গৌরদাস বসাক বললেন।

তাই যাবো স্থির করেছি ভাই।

সত্যি ?

সত্যি। পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজারের চাকরিটা accept করেছি। দু'চার দিনের মধ্যেই সেখানে যাবো।

খুব ভাল, তাই যাও, কিন্তু ভাবছি একটা কথা—

কি ?

রাজার দাসত্ব করা কি তোমার পোষাবে ?

পোষাতেই হবে। এদিকে যে ভাঁড়ে মা ভবানী, তার উপরে নিত্য পাওনাদারদের তাগিদ। অন্ততঃ ওদের হাত থেকেও তো কিছুদিন রেহাই পাওয়া যাবে। কিছুটা mind-এর peace তো মিলবে।

মধুসূদন সপরিবারে গেলেন চাকরি নিয়ে পঞ্চকোটে।

কিন্তু ক'টা দিন যেতেই মধু বুঝতে পারেন, এখানে চাকরি করা তাঁর পোষাবে না। যে ব্যাপারটা মধু আদৌ পছন্দ করেন না, অসাধুতা, সেখানে সর্বত্র তাই।

রাজা তাঁর চাটুকারদের কথায় ওঠেন বসেন। মধু আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তাঁর রাজকর্মচারীদের অসাধুতা, দুর্নীতি দূর করবার জন্য কিন্তু ব্যর্থ হলেন। সবাই তাঁর বিপক্ষে। মধু স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশাই বন্ধ করে দিলেন।

সারাদিনের অবসাদ বিনোদনের উপায় নিলেন সাঁওতাল, কোল ও ভীলদের

নাচগানে। এদিকে রাজকর্মচারীরা মধুকে বিপদে ফেলতে বদ্ধপরিকর।

রাজার এক পেয়ারের নাপিত ছিল। রাজা তার কথায় ওঠেন বসেন। বলতে গেলে সেই নাপিতই ছিল রাজার প্রধান মন্ত্রণাদাতা। রাজকর্মচারীরা অবশেষে সেই নরসুন্দরেরই শরণাপন্ন হলো।

তুই একটা উপায় বের কর!

নরসুন্দর বললে, ভাববেন না, আমি দেখছি।

মধুসূদন অত্যন্ত বেশী মদ্যপান করতেন। মুখ থেকে তার অ্যালকোহলের গন্ধ বের হয় বলে মধু সর্বদা রাজার সামনে যেতেন মুখে নিজের একটা রুমাল চাপা দিয়ে।

অবশ্যই রাজার ঐ ব্যাপারে কোন কৌতূহল ছিল না।

কিন্তু ধূর্ত নরসুন্দর রাজাকে বোঝাল, হুজুর, আপনার গায়ে ফুলের গন্ধ অথচ সাহেব বলেন আপনার গা থেকে নাকি দুর্গন্ধ বের হয়!

অসম্ভব। তা হতেই পারে না। রাজা বললেন।

আমি যথার্থ বলছি হুজুর।

প্রমাণ দিতে পারিস?

নিশ্চয়ই।

পরে রাজা লক্ষ্য করলেন, নরসুন্দর মিথ্যা বলে নি। মধুসূদন তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় নাকে রুমাল চেপে রাখেন।

যা হবার তাই হলো। সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা দেখা দিল। মধু এসে অবধি পঞ্চকোটে পালাই পালাই করছিলেন, এই সুযোগে পঞ্চকোট ত্যাগ করলেন। আবার কলকাতা।

শরীর মধুর আরো অসুস্থ। তা সত্ত্বেও জীবনধারণের জন্য আবার তাকে ব্যারিস্টারি শুরু করতে হলো। মধু ফিরে এসেছে শুনে বন্ধু মনোমোহন ঘোষ ও গৌরদাস বসাক এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

কেমন আছো মধু?

ভাল।

কিন্তু দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।

ওঁরা কথা বলছেন, ডাঃ মধু গুপ্ত এলো।

এসো—এসো ডাক্তার, দেবদূতসম এসেছো এ সময়!

আপনাকে তো দেখে ভাল মনে হচ্ছে না।

আঁরিয়েৎ ঐ সময় ঘরে ঢুকে বললে, ডাক্তার, ওঁকে একটু ভাল করে পরীক্ষা করুন।

নিশ্চয়ই—কিন্তু—

আঁরিয়েৎ বললে, গলায় ঘা। রোজ অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে—তাছাড়া—

কি মিসেস দত্ত ?

প্রায়ই রক্তবমি হয়।

তাই তো !

মধু ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে পরীক্ষা করল কবিকে, মুখ তার বিষণ্ণ হলো।

কবি একটা অনুরোধ করবো আপনাকে ?

কি অনুরোধ ডাক্তার ?

মদটা ছেড়ে দিন।

তুমি সত্যিই পাগল ডাক্তার ! মদ ছেড়ে দিলে কি নিয়ে বাঁচবো ডাক্তার ?

কিন্তু—

না ডাক্তার, সময় যদি এসেই থাকে—আসতে দাও। Let it come !

আঁরিয়েৎ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে স্বামীর মুখের দিকে।

মধু বললেন :

নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকারমণ
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি সে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।

সকলেরই চোখে জল। মধুর গলার স্বর ভাঙ্গা, যেন প্রতিটি কথা উচ্চারিত হচ্ছে অসহ্য এক যন্ত্রণায়—কবি যেন মনে আজ বড় ক্লান্ত—কণ্ঠ বুঝি রুদ্ধ হয়ে আসছে, তাই শেষ মিনতি জানাচ্ছেন রাধারমণের কাছে। ক্রাইস্ট নয়—গড নয়—নবজলধর শ্যাম—মুরলীমোহন রাধিকারমণের কাছে।

৩১

মাত্র তের বৎসর বয়সের সময় আনন্দচন্দ্র এসেছিল শহর কলকাতায়।

কলকাতা শহরেই বলতে গেলে তার পাঠ ও শিক্ষা শুরু। কলকাতা শহরে ভাগীরথীর জলে তখন চলেছে এক নব জাগরণের পালা। বিদ্যাসাগর মশাই তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করছেন—কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজ থেকে পালিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। ঐ বৎসরই ১৮৪৩ সালে এদেশে দাসত্ব

প্রথা নিরোধ আইন পাস হয়। সেদিনকার ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' সেই আইনকে অভিনন্দন জানিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। বিদ্যাসাগরের নিজের ছেলেবেলা থেকেই দেখা দাসত্বের নিষ্ঠুর বন্ধন সমাজজীবনে কি ভয়াবহ অবস্থা এনেছে।

১৮৪৩ সালে দাসত্ব প্রথা নিরোধ করে আইন পাস হলো এ দেশে—ঈশ্বরচন্দ্রর বয়স তখন মাত্র ২৩ বৎসর—২৩ বৎসরের এক যুবক সেদিন বাংলা সমাজের মেঘাবৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছুই যেন দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দাসত্বপ্রথা রহিত হলেও সমাজের সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মুক্তির এখনো অনেক দেরি। সংগ্রাম সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এখনো অনেক কঠিন পথ অতিক্রম করে যেতে হবে।

সেদিনের ঐ সমাজ-চেতনার মুখপাত্র ছিল কলকাতা শহরের ইয়ংবেঙ্গল দল—তারাই ছিল পুরোগামী।

অবিশ্যি ইয়ংবেঙ্গলের সে সময়কার যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমকে স্বীকার করেও তাদের ঐ যুগোপযোগী মনোভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

একদিকে তাঁরা যেমন ভেঙ্গেছিলেন তেমনি অন্যদিকে নতুন করে সব কিছু গড়ে তোলার মত ভিত রচনা করতেও তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, অভাব ছিল না তাঁদের যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্যের বিরুদ্ধ মনোভাবকে গড়ে তোলার প্রয়াসের।

ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও ইয়ংবেঙ্গলের সেদিনকার বিদ্রোহী মনোভাব কিভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত সে সময়কার অন্যতম বুদ্ধিমান মেধাবী ছাত্র মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ।

যশোলাভের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সেদিন মধুসূদনকে বিচলিত করেছিল, তার পশ্চাতেও ছিল ঐ যুগমানসের প্রেরণা। তাই সেদিন তাঁকে পারিবারিক জীবনের গতানুগতিকতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বর্ণসীতা বেঁধে রাখতে পারে নি।

সেই বিদ্রোহের সাময়িক 'প্রকাশ' ভুল হলেও বিদ্রোহটা ভুল নয়, কালোত্তীর্ণ যুগসত্য।

আনন্দচন্দ্র মাইকেলের কথা ভাবতে গিয়ে দেখেছিল—অনুধাবন করেছিল মধুসূদনের বিদ্রোহী আত্মসচেতন মনোভাবের মধ্যে কালোত্তীর্ণ সত্যেরই প্রকাশ। এবং কয়েক মাস পরে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যেও আনন্দচন্দ্র ঐ একই সত্যের সত্যের সাময়িক প্রকাশ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় নি।

নবযুগের জীবনমন্ত্রটির মধ্যে আনন্দচন্দ্র দেখতে পেয়েছিল মানব-মর্যাদাবোধ,

অন্যায়, অযুক্তি, কুযুক্তি ও বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব।

ঐ একই সময় অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে সে সময়কার ইংলণ্ডের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র জর্জ টমসন এ দেশে আসেন।

টমসন বলেছিলেন, আমি এসেছি এ দেশের মানুষ ও সমাজকে চিনতে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে আমি আসি নি।

অতঃপর সভার পর সভা হতে লাগল কলকাতা শহরে এবং জর্জ টমসন প্রত্যেকটি সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ঐ সময়ই বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিও স্থাপিত হলো।

দর্মাহাটার রাধারমণ মল্লিকের গৃহে থেকে স্কুলের পাঠ করতে করতে সব কিছুই লক্ষ্য করেছে আনন্দচন্দ্র—কেমন করে জর্জ টমসন সাহেব এদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলেন, নিজেদের অভাব-অভিযোগ নিজেরাই শাসকদের কাছে প্রকাশ করতে পারে সেই চেষ্টাই করেছেন।

সাধারণ দেশবাসীর মনের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ বা বিদ্রোহ একবারেই জাগিয়ে তুলতে চান নি। বিদেশ থেকে টমসনের দৌত্যে এ দেশে দেশপ্রেমের আমদানি হয় নি।

দেশপ্রেম দেশের মাটিতেই ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল।

সামনে সেদিন ছিল আনন্দচন্দ্রের বিরাট একটি চরিত্র ও তাঁর কার্যকলাপ—যাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র। সেই সময় থেকেই আনন্দচন্দ্র দেখেছে—কেমন করে ধীরে ধীরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর নিজের সমাজ সংস্কারের আদর্শে তাঁর জনমত সংগঠন করবার কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। শিক্ষার নানাবিধ দিক নিয়ে, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন দিক নিয়ে, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বিচারতর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

জনসাধারণের মনে সুস্থ ও সুন্দর সমাজবোধ জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করে চলেছেন একান্ত নিষ্ঠায়।

১৮৪৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের সুযোগ পান সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুতে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে সংস্কৃত কলেজে এসে যোগদান করাটা ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা।

১৮৪৬ ২রা এপ্রিল বিদ্যাসাগর মশাই কাজে যোগ দেন এবং ১৮৪৭-এর এপ্রিলেই

বিদ্যাসাগর ঐ কাজে ইস্তফা দেন। জুলাই মাসে তাঁর সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

আনন্দচন্দ্র সংবাদটা জানত।

নবজাগরণের যুগের মূলমন্ত্র সেদিন ছিল অবাধ বাণিজ্য। এবং তার প্রধান মূলধন ছিল বিত্ত ও বিদ্যা দুইই। তাই নবযুগ কেবল পণ্য-বণিকের যুগ নয়, বিদ্যা-বণিকেরও যুগ। বিদ্যাসাগর যে তাঁর উদ্যম ও স্বাতন্ত্র্যবোধ দিয়ে ঐ শেষোক্ত পথটিই বেছে নিয়েছিলেন তাও আনন্দচন্দ্র জানত।

বিদ্যাসাগর হলেন গ্রন্থকার, মুদ্রক ও প্রকাশক। ঐ সময় 'অন্নদামঙ্গলে'র অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের চাহিদা জনগণের কাছে খুব বেশী ছিল।

বিদ্যাসাগর, তাই আনন্দচন্দ্র জানত, কাজ ছাড়ার পর প্রেসের কাজকর্ম ও গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশ করেন। আবার অবিশ্যি ১৮৫০-এ বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃত কলেজে এসে যোগদান করেছিলেন।

বালক দক্ষিণারঞ্জনের কাছে আনন্দচন্দ্র প্রায়ই ঐ মহাপুরুষের কথা বলতো:

বলতো, বুঝিছো—ঐ হচ্ছে আদর্শ পুরুষ, সর্বদা মনে রাখবা ঐ আদর্শকে তোমায় অনুসরণ করতি হবে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পিতা যেমন ছিলেন দরিদ্র—তেমনি তোমার বাপও দরিদ্র।

ক্যান—আপনে তো ডাক্তারী করেন। ছেলে বলেছে।

হ, করি, কিন্তু এই গ্রামে ডাক্তারী করে ক'টা টাকাই বা পাই। কত কষ্টে যে এই সংসার আমাকে চালাতে হয়—

তয় আপনে আমারে ডাক্তার করতি চান কেন বাবা? শুনিছি দারোগারা অনেক টাকা উপার্জন করে—আমি বড় হয়ে দারোগা হবো।

না, না—তোমারে ডাক্তারই হতি হবে। তুমি শহরে প্র্যাকটিস করবা—টাহা অনেক উপার্জন করতি পারবা।

ভারতচন্দ্র যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন—আনন্দচন্দ্রও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষিণারঞ্জনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে।

কোন স্বপ্ন ছিল না কেবল অন্নদাসুন্দরীর। উদয়-অস্ত সে কেবল খেটেই যেতো সংসারের পিছনে। তার না ছিল কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোন স্বপ্ন।

অন্নদাসুন্দরী কেবল চাইত তার সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাক। একজন গ্রাম্য গৃহস্থ বধূর এর চাইতে আর কি বড় আশা বা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে!

মধুমতীর জল যে কেমন করে ভাগীরথীতে গিয়ে মিশছে—সেই ভাগীরথীর

তীর যে শহর কলকাতা—তার কোন সংবাদই তার কানে কোন দিন পৌঁছায় নি।

ছেলেরা যখন বড় হয়েছে, পরবর্তীকালে সব কলকাতায় কলেজে পড়াশুনা করতে গিয়েছে, তখনও তার মনটা ঐ গ্রাম ছেড়ে এক পাও দূরে যায় নি।

কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে রাত থাকতে থাকতে শয্যাত্যাগ করতো অন্নদাসুন্দরী। তারপর সোজা চলে যেতো পাঁচদুয়োরের ঘাটে এঁটো বাসনপত্র নিয়ে। ফিরে এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে গিয়ে ঢুকতো রন্ধনশালায়। গৃহে লোকজন তো কম নয় —রান্নাব ও আহারাদির পাট চুকতে চুকতে সেই বেলা তৃতীয় প্রহর—সূর্য তখন গাব গালের আড়ালে চলে গিয়েছে—রৌদ্র ঝিমিয়ে এসেছে।

দিনমানে স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দচন্দ্রের বড় একটা দেখাই হতো না।

রাত্রেও শয্যা নেওয়ার অনেক পরে ঘরে প্রবেশ করতো অন্নদাসুন্দরী। আনন্দ-চন্দ্র তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘরের কোণে পিলসুজের উপর কেবল রেড়ির তেলের প্রদীপটা মিটি মিটি জ্বলতো।

সেরাত্রেও সংসারের কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকতে অনেক দেরি হয়েছিল অন্নদাসুন্দরীর।

কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখে স্বামী তখনো জেগে। হুঁকো হাতে তামুক সেবন করছে।

এ কি—এখনো ঘুমোও নি?

না। তা তোমার কাজকর্ম সারা হলো বড়বৌ?

হ্যাঁ। বলে অন্নদাসুন্দরী শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুখের ও গলার ঘাম মুছতে থাকে—গুণ্ঠনটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে।

জান ভাবতিছি—

কি?

কলকাতা যাবো ভাবতিছি।

ক্যান্?

খুড়ো মশাইয়ের স্ত্রী একটা পত্র দেছেন।

খুড়ো মশাই?

হ্যাঁ, নিবারণ খুড়োর স্ত্রী।

অন্নদাসুন্দরী অঞ্চল প্রান্ত দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললে, তোমাদের সেই ন্যাকাপড়া জানা বেম্মো কুসুমঠাকরুন—

আনন্দচন্দ্র মৃদু হেসে বললে, খুড়ীমা লেখাপড়া জানে ঠিকই কিন্তু বেম্মো তোমারে কলো কেডা?

ক্যান্, তুমিই তো বলতে।

আমি বলতাম ?

নালি আমি জানবো ক্যাম্নায় ? তা কি লিখছেন তিনি ?

খোলস করে তো কিছু লেখেন নি পত্রে—কেবল বিশেষ প্রয়োজন একবার যাতি লিখছেন। তা ছাড়া কিছু কাজও আছে—সেগুলানও সেরে আসবো ভাবতিছি।

কালই যাবা ?

হ্যাঁ। ভৈরবরে কয়ে দিছি, আবদুল মাঝিরে সংবাদ দিতি।

ছোট পিসীর থান সব ছিঁড়ে গেছে —পারো তো হাওড়ার হাট থেকে তাঁর জন্যি দু'জোড়া থান আনবা।

আনবো। তা তোমার শাড়িগুলানও তো ছিঁড়ে গেছে !

ও আমি সেলাই করে নেবো নে।

আনন্দচন্দ্র স্ত্রী অন্নদাসুন্দরার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আশ্চর্য ঐ এক নারী—তার স্ত্রী অন্নদাসুন্দরী ! আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে কখনো তার কাছে কিছু চাইল না। উদয়-অস্ত সংসারটার পিছনে খেটেই চলেছে—মুখে 'রা'টি নেই। কোন অভিযোগ নেই।

হ্যা, ভাল কথা—

কি কও ?

অন্নদাসুন্দরী বললে, সামনে তো পুজো এসে গেল। ওদের—ঐ ছাওয়াল পানদের জন্যি—জামাকাপড়গুলান—

দেহি, কুলাতি পারলি আনবো নে।—মনে আছে আমার কথাটা।

বনগাঁ পর্যন্ত তখন সবে রেল লাইন বসেছে।

দুটো ট্রেন চলাচল করে। একটা কলকাতা থেকে বনগাঁ আসে—সেইটাই সন্ধ্যার দিকে আবার বনগাঁ থেকে কলকাতা ফিরে যায়। নৌকা করে খুলনা—সেখান থেকে গরুর গাড়ি বা পদব্রজে বনগাঁ পৌছাতে দুটো পুরো দিন লেগে যায়।

তিন দিন পর ভোরের দিকে কলকাতায় এসে পৌছান আনন্দচন্দ্র। সেখান থেকে পদব্রজেই কলুটোলা।

সদরে বৈঠকখানাতেই দেখা হয়ে গেল নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে। প্রায় নয় বৎসর পরে দেখা। এই নয় বৎসরে যেন নিবারণচন্দ্র অনেকখানি বুড়িয়ে গিয়েছেন বয়েসের অনুপাতে। মাথার সমস্ত চুলই প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

সামনে বসে ছিল দিবাকর—তার হাতে কিছু মামলার নথিপত্র। দিবাকর গুপ্ত নিবারণচন্দ্রেরই সজাতি। দীর্ঘদিন ধরে মুহুরীর কাজ করছেন নিবারণচন্দ্রের কাছে। তাঁরও বয়েস হয়েছে—তবে নিবারণচন্দ্র থেকে বয়েসে কিছু ছোট।

আনন্দচন্দ্র এসে নিবারণচন্দ্রের পদধূলি নিতেই তিনি বললেন, কে, আনন্দ ?

আজ্ঞে কাকামশাই।

কবে এলে ?

আজই এসে পৌঁচেছি।

সংবাদ সব ভাল তো ?

হ্যাঁ, কাকামশাই।

যাও, ভিতরে তোমার ছোট খুড়ীমা আছেন।

নিবারণচন্দ্র যেন বলতে হয় তাই দুটো কথা বলে আবার মামলা সম্পর্কে দিবাকরের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন।

এ বাড়িতে আনন্দচন্দ্রর অবারিত দ্বার।

আনন্দ সোজা অন্দরে এসে প্রবেশ করে।

দাওয়ায় বসে কুসুমকুমারী তরকারি কুটছিল।

আনন্দচন্দ্র ডাকল—খুড়িমা !

কে ?

আমি—

আনন্দ, এসো ! একটু বসো, আনাজগুলো কুটে দিয়ে—

ব্যস্ত হবেন না আপনি—কাজ শেষ করুন, আমি এই দাওয়াতে বসছি।

আনন্দচন্দ্র অদূরে দাওয়ার উপরেই বসে পড়লো।

আমার পত্র পেয়েছিলে আনন্দ ?

আপনার পত্র পেয়েই তো তাড়াতাড়ি চলে এলাম কাকীমা। পত্রে তো আপনি তেমন কিছু লেখেন নি—

না।

তা খোকাকে দেখছি না যে !

কুসুমকুমারীর দুটি চোখ জলে ভরে যায়।

কি হয়েছে খুড়ীমা !

সে তো নেই—

নেই ?

না।

কি হয়েছিল—কবে—

তা বৎসরখানেক হবে—মায়ের ধন মায়ের কাছেই চলে গেছে।

আনন্দ বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে। ঐ শোকের সান্ত্বনার কোন ভাষাই যেন সে খুঁজে পায় না।

ইতিমধ্যে তরকারি কোটা হয়ে গিয়েছিল। বামুনদিদি এসে সব নিয়ে গেল।

কুসুমকুমারী উঠে দাঁড়াল।

চল, এসো আমার ঘরে—

কুসুমকুমারীর সেই শয়নকক্ষ নয়—অন্য একটি কক্ষ।

ঘরের মধ্যে বিশেষ কোন আসবাব চোখে পড়ে না। কেবল একটি পালঙ্ক ও একটা লোহার সিন্দুক।

বসো আনন্দ।

আনন্দ পালঙ্কের উপরই বসল।

খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

হ্যাঁ।

কিছু বললেন না তিনি ?

না তো !

বলেন নি ?

না।

তিনি তো আবার বিবাহ করছেন !

বিবাহ ? কি বলছেন খুড়ীমা—এই বয়েসে কাকামশাই—

পুরুষের আবার বয়েস কি ?

তাই বলে—

সব ঠিক হয়ে গিয়েছে যে !

ঠিক হয়ে গিয়েছে ?

হ্যাঁ।

পাত্রী ?

দিবাকর কাকার ছোট মেয়ে—ক্ষ্যান্তমণি।

দিবাকর কাকা—

হ্যাঁ, ঐ যে মুহুরী—

কাকামশাইয়ের মনে হচ্ছে মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা দিবাকরই বা এই প্রস্তাবে রাজী হলো কেমন করে ?

প্রস্তাবটা তো সে-ই দিয়েছে !

বলেন কি ?

হ্যাঁ, তোমার খুড়োমশাই পাত্রীর সন্ধান করছেন শুনে সেই প্রস্তাবটা দিয়েছে।

সত্যিই তাই।

সরস্বতীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই নিবারণচন্দ্রের মনের গতির পরিবর্তন হয়েছিল এবং সেই পরিবর্তনের পশ্চাতে হয়ত কিছুটা দায়ী কুসুমকুমারীই।

কুসুমকুমারী আবার কোন দিন ফিরে আসবে ভাবতে পারেন নি নিবারণচন্দ্র। সরস্বতীর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে কুসুম যখন ফিরে এলো, সত্যিই আনন্দ হয়েছিল মনে নিবারণচন্দ্রের। শোকের মুহ্যমান ভাবটা মন থেকে কাটতে মাস দুই সময় লেগেছিল নিবারণচন্দ্রের।

তার পরই ধীরে ধীরে মনটা শান্ত হয়ে এসেছিল।

এদিকে কুসুমকুমারী কিন্তু স্বামীগৃহে ফিরে এলেও নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ একটা সম্পর্ক রাখে নি। সে অন্য একটি ঘরে সরস্বতীর নবজাত শিশুটিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত।

সাংসারিক ব্যাপারে দু'একটা পরামর্শ স্বামীর সঙ্গে করলেও, স্বামীর সামনে বা তাঁর ঘরে বড় একটা সে আসত না। নিবারণচন্দ্র ডাকলেও আসত না। তবে তাঁর আহারের সময়টিতে পূর্বের মত এক খানি পাখা হাতে সামনে বসে থাকত। একদিন রাত্রে আহারাদির পর নিবারণচন্দ্র কুসুমকুমারীর হাত থেকে পান নিতে নিতে বললেন, মেজবৌ, আজ একবার রাত্রে আমার ঘরে এসো—

কেন ? কিছু কি প্রয়োজন আছে ?

না না, প্রয়োজন আব কি !

জান তো খোকন একদণ্ড আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না—কুসুমকুমারী বললে।

কেন সুখদা কি করে ?

সুখদার হাতে খোকনকে আমি কখনো দিই না।

নিবারণচন্দ্র আর কিছু বললেন না, নিজের শয়নকক্ষের দিকে চলে গেলেন।

আবার কিছুদিন পরে নিবারণচন্দ্র সুখদাকে দিয়েই ডেকে পাঠালেন এক রাত্রে কুসুমকুমারীকে।

কুসুম বলে পাঠাল, খোকনকে নিয়ে সে ব্যস্ত—আসতে পারবে না।

সুখদা দাসী এসে সেই কথাই বললে।

কি হলো?

সুখদা বললে, মেজমা খোকন সোনাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন।

ঠিক আছে তুই যা।

সুখদা চলে গেল।

প্রচণ্ড একটা অভিমান হয় নিবারণচন্দ্রের।

এ শুধু অবহেলাই করা নয় তাকে—অস্বীকারও করা।

ঠিক আছে আর কখনো ডাকবেন না তিনি কুসুমকে। থাক সে খোকনকে নিয়ে। মনে মনে ভাবলেন কথাটা বটে, কিন্তু কি একটা আক্রোশে যেন সারাটা অন্তর তার পুড়ে যেতে লাগল।

কটা মাস গেল। নিবারণচন্দ্রের মনের মধ্যে যেন এতটুকু শান্তি নেই। কুসুমকুমারীর অবহেলাটা যেন তাঁকে দিবারাত্র দগ্ধাতে থাকে। এমনি সময় এক রাত্রে কুসুমই কি একটা কাজে নিবারণচন্দ্রের কক্ষে প্রবেশ করতেই নিবারণচন্দ্র ডাকলেন, কুসুম!

কুসুমকুমারী আলমারি খুলে কি সব টাকাপয়সা রাখছিল—স্বামীর ডাকে ফিরে তাকাল।

দু'জনার চোখাচোখি হলো।

শোন।

কি?

কাছে এসো।

না।

কুসুম!

বলো?

তুমি কি আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছো?

তাই কি হয়!

তবে?

কি তবে—

আমি ডাকলে কাছে আসো না কেন?

আমি যাই—কুসুম দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

নিবারণচন্দ্র পালঙ্ক থেকে নেমে এসে কুসুমকুমারীর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা উলঙ্গ কামনার আগুন যেন কুসুম দেখতে পায়।

পথ ছাড়ো।

না।

ছিঃ!

ঐ ছোট্ট একটি 'ছিঃ' যেন নিবারণচন্দ্রের মুখের উপর চাবুকের ঘা বসালো।

নিবারণচন্দ্র থমকে গেলেন। কুসুম আর দাঁড়ায় না। ঘর ছেড়ে চলে যায়।

সারাটা রাত্রি নিবারণচন্দ্রের চোখের পাতায় ঘুম এলো না। অস্থির অশান্ত ভাবে পায়চারি করে-করেই রাতটা একসময়ে শেষ হয়ে গেল।

আর নিবারণচন্দ্র কুসুমকে ডাকেন নি।

কিন্তু তাঁর অশান্ত মনকেও যেন শান্ত করতে পারছিলেন না। হঠাৎ—হঠাৎই একদিন তারপর তাঁর মনে হলো আবার তিনি বিবাহ করবেন।

কেন—কেন বিবাহ করবেন না? এখনো মন থেকে তাঁর ভোগের তৃষ্ণা যায় নি। খুব গোপনে পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু ব্যাপারটা যতই তিনি গোপন করার প্রয়াস করুন—সর্বক্ষণের সঙ্গী মুহুরী দিবাকরের কাছে ব্যাপারটা কিন্তু চাপা থাকল না।

দিবাকরের কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষান্তমণির বয়স তখন তেরো বৎসর। মেয়ে বিবাহ-যোগ্যা হলেও দিবাকর মেয়েকে অর্থের অভাবে পাত্রস্থ করতে পারছিলো না।

সেইখানে মালিকের মনের ভাবটা বুঝতে পেরে কথাটা সে একদিন নিবারণ-চন্দ্রের কাছে উত্থাপন করল।

বড় দুশ্চিন্তায় আছি কর্তা—

দুশ্চিন্তা! কিসের দিবাকর?

আপনি তো জানেন আমার ছোট কন্যাটির বয়স হয়েছে, কিন্তু পাত্রস্থ করতে পারছি না।

তাই নাকি? তা কত বয়স হলো?

তা এই তেরো হলো। একটি বুড়ো বা দোজবরেও যদি পেতাম—

মেয়েটি দেখতে কি রকম তোমার দিবাকর?

আসুন না, আজ গরিবের কুঁড়েতে যদি দয়া করে পদধূলি দেন তো—

বিলক্ষণ—দয়া কি হে—যাবো।

কবে?

আজই সন্ধ্যার পর।

ক্ষান্তমণিকে দেখে নিবারণচন্দ্রের মাথা ঘুরে গেল।

কিশোরী ক্ষান্তমণি যেন তার মনের মধ্যে আগুন জ্বেলে দিল।

দিবাকরের বুঝতে আর বাকি থাকে না।

কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল।

তবে আপাততঃ ব্যাপারটা গোপন রাখতে বললেন নিবারণচন্দ্র। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও চাপা থাকল না ব্যাপারটা। কুসুমকুমারী জানতে পারল এবং সেই দিনই আহারাদির পর কুসুম এসে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করল।

এসব কি শুনছি! কুসুম বললে।

কি শুনছো?

তুমি নাকি আবার বিবাহ করছো?

হ্যাঁ।

কথাটা তাহলে সত্যি!

হ্যাঁ।

অকস্মাৎ তার দশ দিন পরে সরস্বতীর পাঁচ বৎসরের শিশুটি কঠিন বিসূচিকা রোগে মারা গেল।

কুসুম শয্যা নিল শোকে।

ঐ ঘটনারই মাস কয়েক বাদে বিবাহের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় আবার।

এবার নিবারণচন্দ্র বললেন, পুত্রার্থেই আবার তাঁকে অনন্যোপায় হয়ে বিবাহে তৃতীয়বার সম্মতি দিতে হচ্ছে।

আনন্দচন্দ্র সব শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

কিন্তু—

কি আনন্দ?

এ বিয়ে কি বন্ধ করা যায় না খুড়ীমা!

কেমন করে?

আমি বলবো খুড়োমশাইকে?

কোন ফল হবে না।

হবে না বলছেন?

হ্যাঁ, তোমার খুড়োমশাইয়ের মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে।

আনন্দচন্দ্র কি জানত না, কি গভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা একসময় দেখেছে সে কুসুমকুমারীর তার স্বামীর প্রতি। সেই স্ত্রীর প্রতি এত বড় অবমাননাটা যেন কিছুতেই মনে মনে মেনে নিতে পারছিল না আনন্দচন্দ্র। যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিল না খুড়োমশাই নিবারণচন্দ্রকে।

তার যেন মনে হচ্ছিল এ কেবল ধর্মরক্ষার্থেই বিবাহ নয়, এর মধ্যে আছে একটা পুরুষের চিরন্তন লালসা। এবং সেই লালসার তাড়নাতেই নিবারণচন্দ্র পুনরায় বিবাহ করবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছেন।

একবার মনে হয়েছিল আনন্দচন্দ্রের, সে সোজাসুজিই খুড়োমশাইকে গিয়ে বলবে, এ কি অন্যায় করছেন আপনি? এ বয়সে পুনরায় বিবাহ শুধু অন্যায়ই নয় অধর্ম। পুত্রসন্তান আপনার ভাগ্যে থাকলে সরস্বতীর পুত্রসন্তানটির এমন অকালমৃত্যু ঘটতো না! এটা পুরোপুরিই আপনার নিজেকে ছলনা করা!

কিন্তু খুড়োমশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা বলবার মত সাহস মনের মধ্যে সে পায় না। তথাপি আনন্দচন্দ্রের মনে হয় খুড়ীমা যখন তাকে ডেকে এনেছেন, বিশেষ করে ঐ কারণেই, একটা কিছু তার করা কর্তব্য।

খুড়ীমার ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আবার আনন্দচন্দ্র এসে বাইরের ঘরে প্রবেশ করল।

কথাটা কিন্তু আনন্দচন্দ্রকে বলতে হলো না, বরং খুড়োমশাই-ই কথাটা তুললেন।

নিবারণচন্দ্র বললেন—কিছুদিন থাকছো তো আনন্দ?

না, চার-পাঁচ দিন পরেই ফিরে যাবো।

দেখো তুমি যে এসময় এসেছো, আমি খুব খুশী হয়েছি। বিশেষ করে তোমার খুড়ীমার জন্য—

খুড়ীমা!

হ্যাঁ, হয়ত ইতিমধ্যে তুমি কথাটা শুনেছো, আমি আবার বিবাহ করবো স্থির করেছি।

আনন্দ কতকটা যেন বিস্মিত হয়েই খুড়োমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিশ্চয়ই কথাটা তোমার খুড়ীমা তোমাকে বলেছেন!

হ্যাঁ।

বলেছেন?

হ্যাঁ, আপনি আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজন। তবু একটা কথা—

বলো না কি বলতে চাও!

একান্তই কি প্রয়োজন ছিল পুনরায় আপনার বিবাহ করার ?

ছিল বৈকি।

ছিল ?

হ্যাঁ। যাক সে-সব আলোচনা তোমার সঙ্গে আমি করতে চাই না। সংসার-ধর্ম-বড় জটিল। তুমি এখনো ছেলেমানুষ, বুঝবে না। তুমি একটা কাজ করতে পারবে ?

কি, বলুন !

তোমার খুড়ীমাকে কটা দিনের জন্য বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার পিত্রালয়ে রেখে আসতে পারবে ?

পিত্রালয়ে !

হ্যাঁ। তারপর এদিককার ক্রিয়াকর্ম চুকে গেলে—

আনন্দচন্দ্র মনে মনে বিস্মিত হয়। এই বিবাহ-ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই একদিন কুসুমকুমারী যখন পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেদিন ঐ খুড়োমশাই তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন ! আর আজ সেই খুড়োমশাই-ই তাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিতে চান ! কি বিচিত্র এই সংসার ? কি বিচিত্রই না মানুষের মন ?

একটা কথা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, খুড়োমশাই ?

আনন্দচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরে নিবারণচন্দ্র আনন্দের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—কি প্রশ্ন ?

আজ যে আমাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রথাটা সম্পর্কে—

নিবারণচন্দ্র রুক্ষস্বরে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, কতকগুলো উন্মাদ অবিশ্যি বলছে বহু-বিবাহ একটা অনিষ্টকর সামাজিক ইনস্টিটিউশন, কাজেই রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা ঐ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো উচিত। কিন্তু আমি তা মনে করি না।

আনন্দচন্দ্র জানত কথাটা কার ? পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। তাই সে বললে—আপনি তাহলে বলতে চান, অত বড় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

তিনি মহাপণ্ডিত হতে পারেন এবং স্বীকার করি, বিধবা বিবাহ আইন পাস করিয়ে তিনি ভালই করেছেন কিন্তু এই বহুবিবাহ ব্যাপারে তাঁর মতামতকে আমি স্বীকার করতে পারি না।

পারেন না ?

না। কারণ এটা কেবল সামাজিক নয়, ধর্মীয় ব্যবস্থারূপে প্রতিপন্ন করে—তাছাড়া বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ঐ মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন স্বয়ং তারা-নাথ তর্কবাচস্পতি মশাইও তাঁর ভুল বুঝতে পেরে। তোমাদের পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের

অমন যে অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশে সমাজ-সংস্কারের পক্ষে কত রচনা লিখেছেন, তিনিও তো কই বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহ নিবারণ সম্পর্কে আইন পাস হোক সমর্থন করেছেন কি ? দেখো এতকাল এত বছর ধরে যে সব সমাজে চলে আসছে আনন্দ, প্রয়োজনবোধে হয়ত আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে আপনা থেকেই ধীরে ধীরে যাদের তোমরা কু-প্রথা বলো লোপ পেয়ে যাবে—

কিন্তু খুড়োমশাই, ব্যাপারটা যে আমাদের সমাজ-জীবনের পক্ষে অকল্যাণকর তা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করেন না !

না, এত সহজ নয় ব্যাপারটার মীমাংসা করা।

আনন্দচন্দ্র আর তর্ক করল না।

সে স্পষ্টতঃই বুঝতে পেরেছিল সমাজের ভিতর থেকে চেতনা না এলে কেবল কাগজে লিখে ঐ পরিবর্তন সমাজে আনা সম্ভবপর নয়।

আনন্দচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সেই শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ক্রমশঃ বাংলায় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল এবং তাদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও ঘটছিল এবং সেদিন তার দুটি প্রধান উপাদান হয়েছিল আত্মমর্যাদা বোধ ও আত্মগৌরব বোধ এবং তাদের মধ্যে ক্রমশঃ দেখা দিতে শুরু করেছিল এক নতুন জাতীয়তা বোধ—পূর্বের অন্ধ পাশ্চাত্যভাব-প্রীতি ও প্রবল অনুচিকীর্ষার বদলে।

সমাজের ঐ নতুন ভাবতরঙ্গে আনন্দচন্দ্রও অনেকটাই জড়িত হয়ে পড়েছিল।

সেদিন সেও পিছিয়ে থাকে নি।

তাই সেদিন খুড়োমশাই নিবারণচন্দ্রের ঐ মনোবৃত্তিকে মন থেকে সমর্থন জানাতে পারে নি। এবং তাই সেদিন যা আনন্দচন্দ্র জীবনে কখনো করে নি তাই করল।

সে বললে—ক্ষমা করবেন খুড়োমশাই, আমি খুড়ীমাকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে আসতে পারব না।

পারবে না !

কথাটা বলে অবাক-বিস্ময়েই যেন নিবারণচন্দ্র তাকালেন আনন্দচন্দ্রের মুখের দিকে। তিনি যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি আনন্দচন্দ্র ঐভাবে তাঁর মুখের উপরে 'না' কথাটা উচ্চারণ করতে পারবে।

আমি তাহলে চলি—আনন্দচন্দ্র বললে।

নিবারণচন্দ্র ফিরেও তাকালেন না আনন্দর মুখের দিকে।

আনন্দচন্দ্র নিঃশব্দে নিবারণচন্দ্রের পদধূলি নিয়ে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

বস্তুতঃ আনন্দচন্দ্রের মনের মধ্যে যে দুটি মানুষের প্রতি অপার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁরা ঐ বিদ্যাসাগর মশাই ও কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মনটা আনন্দচন্দ্রের অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। নিবারণচন্দ্রের গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আনন্দচন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে বৈঠকখানার দিকে চলল।

বৈঠকখানার বাড়িতেই থাকে তার বন্ধু ডাঃ মধু গুপ্ত।

কিন্তু মন থেকে যেন খুড়ীমার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না।

বেলা তখন গোটা দশেক হবে।

আনন্দচন্দ্র যখন মধু ডাক্তারের গৃহে গিয়ে পৌছাল, মধু গৃহে নেই।

সংবাদ পেয়ে নীরজা নীচে নেমে এলো।

আপনি!

হ্যাঁ, এলাম। মধু কোথায়?

সে তো তার ডাক্তারখানায় গিয়েছে!

ফিরবে কখন?

তা বেলা বারোটা-একটার আগে নয়। তাও কোন রোগীর বাড়ি থেকে ডাক এলে আরো দেরি হবে।

আমি তাহলে যাই। বৈকালের দিকে বা সন্ধ্যায় আসবো'খন।

না না, যাবেন কি! বন্ধু বাড়িতে নেই বলে কি বাড়িতে কেউ-ই নেই? আমি তো আছি। বসুন, বিশ্রাম করুন। আহারাদি করুন—চলুন উপরে চলুন।

আনন্দ আর অমত করল না।

কলকাতায় যে কটা দিন থাকবে, সে ভেবেছিল খুড়োমশাইয়ের ওখানেই থাকবে। কিন্তু খুড়ীমার মুখে সব কথা শোনার পর সে-গৃহে থাকতে সে পারে নি। জলস্পর্শ পর্যন্ত না করে চলে এসেছে।

কি ভাবছেন? চলুন উপরে।

আনন্দ তথাপি ইতস্তত করে।

এখানে এবারে অনেকদিন পরে এলেন!

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে নীরজা বললে।

হ্যাঁ, তা বোধ হয় বৎসরখানেক হবে।

বাড়ির সব কুশল তো?

তা একপ্রকার।

আপনার পুত্রকন্যারা ?

সবাই ভাল। আমাদের কবির কোন সংবাদ জানেন ? আনন্দ শুধাল।

উনি তো গতকালও গিয়েছিলেন কবিকে দেখতে।

কেমন আছেন ?

ভাল না। তাছাড়া সমানে সর্বক্ষণ মদ্যপান করে চলেছেন !

বেলা দ্বিপ্রহর।

কবি তাঁর কক্ষে বসে সব জানালা দরজা বন্ধ করে মদ্যপান করে চলেছেন।

আরিয়ৎ হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে বলে, কান্নাকাটি করেও স্বামীকে তার মদ্যপান থেকে নিবৃত্ত করতে পারছে না।

কবি যেন মদের মধ্যেই ডুবে আছেন।

মধু আছো ? দরজার কবাটে মৃদু করাঘাত।

Who's there ? কবি প্রশ্ন করেন।

আমি !

আমি কে ?

আমি মনোমোহন।

Ah ! The great Barrister—এসো এসো।

মনোমোহন এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

এ কি, ঘর অন্ধকার কেন ? জানালা দরজা সব বন্ধ করে রেখেছো ?

মধু বলে উঠলেন—

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে—

এসো এসো, মনোমোহন।

বলতে বলতে সামনে রক্ষিত পানপাত্রটি তুলে কবি এক দীর্ঘ চুমুক দিলেন।

মনোমোহন বললেন—এ কি করছো, এ তো আত্মহত্যা !

মধুর মুখে হাসি। হাসি নয়, যেন করুণ সূর্যাস্তের আভা।

মধু আর একবার পানপাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন—হ্যাঁ মনোমোহন, আত্মহত্যাই করছি। তবে গলায় ছুরি দেওয়ার চেয়ে এতে কষ্টটা একটু কম। Yes, this is a process equally same, but less painful !

মনোমোহন মনে দুঃখ পান সত্যি সত্যি। বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় না, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। প্রদীপ নিভতে আর বেশী দেরি নেই।

হঠাৎ মধুর গলার মধ্যে সর-সর করে ওঠে।

তাড়াতাড়ি একটা পিকদানী মুখের সামনে তুলে ধরলেন মধু।

খানিকটা তাজা লাল রক্ত বমি করে ফেললেন: Blood—again that blood!

এ কি, এ যে রক্ত—মনোমোহন বললেন।

ভয় পেলে মনোমোহন? No my dear, don't get nervous! জানো সেদিন রামকুমার বিদ্যারত্ন এসেছিল দেখা করতে। সে বলছিল, মধু, তোমাকে আমি ভালবাসি। এখনো মদ ছাড়ো যদি বাঁচতে চাও। তাকে কি বলেছি জানো মনোমোহন?

কি?

দেখো তোমায় আমি ভালবাসি রামকুমার, কিন্তু এ ধরনের অনুরোধ যদি আবার কখনো করো, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

মনোমোহন আর কি বলবেন। চুপ করে রইলেন।

কি জানো মনোমোহন, এত দীর্ঘ দিনের অভ্যাস—এ কি পরিবর্তন করা এত সহজ? কে পারে খণ্ডিতে বিধির নির্বন্ধ?

আঁরিয়েৎ এসে ঘরে ঢুকল।

কখন এলেন মনোমোহনবাবু?

এই কিছুক্ষণ—চলুন মিসেস দত্ত, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

চলুন।

পাশের ঘরে এসে আঁরিয়েৎকে বললেন মনোমোহন—ও যে মরে যাবে এখনো মদ না ছাড়লে!

আমি কি জানি না ঘোষ—কিন্তু ও আমার কথা শোনে না।

সত্যি, এত বড় একটা প্রতিভা—

মনোমোহন ঘোষ অতঃপর বিদায় নিলেন।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে মধু গুপ্ত গৃহে এলো।

আনন্দকে দেখে খুব খুশী।

আনন্দ কখন এলে?

সকালে।

নীরজা বললে—আর দেরি করো না। হাত মুখ ধুয়ে নাও। উনি এখনো কিছু খান নি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তাই নাকি! এখুনি আসছি আমি।

পাশাপাশি দুই বন্ধু। আহারে বসে গল্প শুরু করে। মধু গুপ্ত বলে—কবির অবস্থা খুব খারাপ আনন্দ!

গেছিলে নাকি তার ওখানে?

সেখানে গিয়েই তো দেরি হয়ে গেল। প্রায়ই রক্তবমি করছেন, মদ্যপান কিছুতেই ছাড়বেন না।

সত্যি অমন একটা প্রতিভা, বড় দুঃখ হয়—আনন্দ বললে।

চারিদিকে কেবল ধার আর দেনা। দেনায় দেনায় একেবারে দিশেহারা।

আজ একবার সন্ধ্যায় ভাবছি কবির ওখানে যাবো।

বেশ তো, যাও।

দেখা হবে তো?

হবে না কেন—হবে!

তুমি সঙ্গে যাবে?

সন্ধ্যায় অনেক কাজ। আজ হবে না। ভাল কথা, ক'টা দিন তুমি আছো তো?

দিন দুই আছি।

কোথায় উঠেছো?

এখনো ঠিক করি নি। সকালেই তো আজ এলাম। থাকার রাত্রে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সে আবার কি! অন্য কোথায়ও কেন যাবে, এখানেই থাকো না!

এখানে? মানে—

হ্যাঁ, কেন আপত্তি আছে কিছু?

না, আপত্তি কি?

নীরজা, ওর সব ব্যবস্থা করে দিও।—মধু গুপ্ত বললে।

নীরজা বললে—তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বলার আগেই ওঁর থাকবার সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

মধু গুপ্ত হেসে বললে—করে রেখেছো? তবে তো কোন কথাই নেই। জানো আনন্দ, ভাগ্যে ওর মত গৃহিণী পেয়েছিলাম! সংসারের এ দিকটা আমাকে কিছু ভাবতে হয় না।

আনন্দ বললে—তুমি ভাববে কখন? তোমার কি ভাববার মত সময় আছে? দিবারাত্র তো তুমি রোগীদের নিয়েই ব্যস্ত!

কেন ব্যস্ত থাকি জানো আনন্দ ?

কেন ?

কারণ ওতেই আমার মুক্তি। ভাল কথা, আজ থিয়েটার দেখতে যাবে ?

থিয়েটার !

হ্যাঁ।

কি বই ?

চৈতন্যলীলা।

হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের কে যেন দেখে গিয়েছে—বলছিল সেকথা।

নটী বিনোদিনী যা অভিনয় করেছে না—তুমি তো আজকালকার থিয়েটার দেখোও নি।

না, আমি সেই কবে দেখেছিলাম কবির নাটক বেলগাছিয়ায় রাজাদের ওখানে।

কিন্তু তখন তো অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করানো হতো না! সত্যি, মেয়েছেলের ভূমিকা মেয়েছেলে না করলে কি জমে ? গোঁফ-কামানো পুরুষ মেয়ে সেজে ঢং করে—সত্যি, আমার যা হাসি পেত না! তাহলে ঐ কথাই রইলো, আমি ঠিক সন্ধ্যার আগে আসবো।

মধু গুপ্ত আহার শেষ করে আবার ধড়াচুড়ো পরে বের হয়ে গেল।

আনন্দচন্দ্র এসে বাইরের ঘরে বিশ্রামের জন্য পাতা বিছানায় উপবেশন করল।

আনন্দচন্দ্রের জীবনে অনেক কিছুই ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে। বিধবা বিবাহ আন্দোলন, সেপাই বিদ্রোহ, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবিভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের শুরু বা প্রতিষ্ঠা, কবি ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান ও কবি মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজে নবশক্তির সঞ্চার—আর ঐ সব কিছুই বঙ্গসমাজে এনেছিল একটা প্রবল আন্দোলন।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের পর যে অত সমাদর হয়েছিল তার কারণ প্রধানত নাট্যকাব্যের নতুন অভ্যুদয় ও রঙ্গালয়ের আবির্ভাব।

নাট্যকাব্যের অভ্যুদয় বাংলা দেশে একটি বিশেষ ঘটনা।

আরো আগে এদেশে ছিল যাত্রা, কবি গান, হাফ আখড়াই প্রভৃতি এবং ঐ সব কিছুর ভিতর দিয়েই এদেশের লোকেরা আমোদপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো।

অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐসব যাত্রা, কবি, হাফ আখড়াই প্রভৃতি অশ্লীলতায় ভরা থাকত। সেই কারণেই বিশেষত আনন্দচন্দ্র দেখেছে দেশে ইংরাজী শিক্ষা

যত বিস্তার লাভ করতে থাকে ঐসব কুরুচিপূর্ণ আমোদ-প্রমোদের প্রতি মানুষের মনে বিতৃষ্ণা জাগায়—ফলে একমাত্র সামাজিক আমোদ যা অবশিষ্ট রইলো নব-শিক্ষিত সমাজে তা হচ্ছে সুরাপান ও হাস্যপরিহাস।

ইংরাজদের একটি প্রতিষ্ঠিত রঙ্গশালা ঐ সময় ছিল, যেখানে অভিনয় দেখতে শিক্ষিত সমাজের অনেকেই যেতেন। ১৮৫৭ সনে সেপাই বিদ্রোহের আগে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি' ভবনে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নামে এক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সেক্সপীয়ারের সব নাটক সেখানে অভিনীত হতে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজে ঐভাবেই একদিন ইংরাজী নাটক অভিনয়ের ধুম লেগে গেল।

কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায় ক্রমে বুঝতে পারলেন ঐ রকম ইংরাজী নাটক অভিনয় করে ঠিক রস উপভোগ করা যায় না। বাংলা নাটকের জন্ম ঐ সময়ই। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হলো ঐ 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারেই'। প্রথম হোতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তারপর ১৮৫৭ সালে 'শকুন্তলা' নাটক, তারপর 'বেণীসংহার', আরো পরে পাইকপাড়ার রাজপরিবারের দুই ভাইয়ের এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তিনজনের প্রচেষ্টায় বেলগাছিয়ার উদ্যানে এক নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে মধুসূদনের রত্নাবলী নাটক, শর্মিষ্ঠা, পদ্মা- বতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নাটক।

আজ সেদিনকার সেই প্রচেষ্টারই প্রকাশ বর্তমান রঙ্গালয়ে। নট ও নাট্যকার গিরিশের আবির্ভাব।

রঙ্গালয়ে পৌঁছে দুই বন্ধু সামনের রো-তে টিকিট কেটে বসল।

নাটক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কানাঘুষায় ওরা শুনতে পেল, দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণও এসেছেন ঐদিন চৈতন্যলীলা নাটক শুনতে দেখতে।

আনন্দ বললে—সত্যি ঠাকুর এসেছেন নাকি ?

তাই তো শোনা যাচ্ছে। আরে ঐ তো দোতলার বক্সে বসে আছেন রামকৃষ্ণ —মধু বললে।

তুমি ওঁকে আগে দেখেছো নাকি ?

হ্যাঁ। নীরজার অনুরোধে তাকে নিয়ে একদিন নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। মধু গুপ্ত বললে।

সত্য-সত্যিই ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন সেদিন গিরিশের নাটক দেখতে, চৈতন্যলীলা দেখতে।

মঞ্চে তখন বিদ্যাধরীগণ সমবেত কণ্ঠে গাইছে :

'নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখীপাখা
রাধিকা হৃদিরঞ্জন।'

আহা, কি গান! কি কথা!

বক্সে বসে গান শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন।

৩৩

চৈতন্যলীলা নাটক একসময় শেষ হলো।

ঠাকুর যে চৈতন্যলীলা নাটক দেখতে এসেছেন, গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের নটনটী-দের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কথাটা শুনে অবধি নটী বিনোদিনীর বুকটা কাঁপতে শুরু করেছিল। ঠাকুরের নাম সে আগে অনেক শুনেছে। মনে মনে বার বার ঠাকুরকে প্রণাম করেছে। নিমাইয়ের ভূমিকার নেমেছিল বিনোদিনী পুরুষ বেশ নিয়ে। নাটকের শেষ যবনিকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সাজঘরে চলে এসেছিল। বেশভূষা তখনো ছাড়ে নি, হঠাৎ তার কানে এলো ঠাকুর মঞ্চের ভিতরে এসেছেন।

ঠাকুর গিরিশকে শুধান, কই গো সেই ছেলেটি কই? যে তোমাদের নিমাই করলে!

গিরিশ বিনোদিনীকে ডাকলেন—বিনোদ, এদিকে এসো।

বিনোদিনী ঘরে ঢুকে দেখে—এক সৌম্যকান্তি জ্যোতির্ময় পুরুষ সামনে তার দণ্ডায়মান।

মুখে চাপদাড়ি—মাথায় দু'পাশে সামান্য টাক।

দুটি আয়ত চক্ষু যেন ঢুলু-ঢুলু। কি এক আনন্দ ভাবে বিভোর।

গায়ে একটা বোতাম-আটা কালো কোট। তার উপর দিয়ে আটহাতি একটা কালোপাড় ধুতির শেষাংশটা গলায় ফেলা।

ঠাকুর, এই বিনোদিনী!

ঠাকুর আয়ত চক্ষু তুলে তাকালেন। বললেন—সেই ছেলেটি—আহা আসল নকল এক হয়ে গেছে গো!

ঠাকুর ও ছেলে নয়, মেয়ে।

য়্যাঁ!

হ্যাঁ, মেয়ে—ওর নাম বিনোদিনী।

বিনোদিনী ততক্ষণে লুটিয়ে পড়েছে ঠাকুরের পায়ে। অশ্রুজলে দুটি চক্ষু তার ভেসে যাচ্ছে।

ঠাকুর, কৃপা করো এই নরকের কীটকে—

উঠ গো—উঠ, হবে হবে—তোর হবে।

ঠাকুর আমার কি গতি হবে? আমি যে অনেক পাপ করেছি!

হবে হবে—ডাক তাকে ডাক।

নট ও নটীরা সবাই এসে এসে ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করে। নাট্যশালা সেদিন পুণ্যতীর্থ হয়ে ওঠে ঠাকুরের শ্রীচরণস্পর্শে। ঠাকুরের চরণধূলিতে মহাতীর্থ হয়ে ওঠে।

ঠাকুর বলেন গিরিশকে—বড় ভাল লিখেছিস রে—বড় ভাল।

নটী বিনোদিনীর দু'চোখের কোল বেয়ে তখনো অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করে দিচ্ছে।

আনন্দরা নাট্যশালার বাইরেই অপেক্ষা করছিল, সামনাসামনি একবার ঠাকুরকে দর্শন করবে। কিন্তু সে সুযোগ ওরা সেদিন পেল না।

মধু তাগিদ দেয়—চল আনন্দ, রাত হলো।

হ্যাঁ, চল।

মধুর ব্রুহাম গাড়ি অপেক্ষা করছিল, দু'জনে সেই গাড়িতে উঠে বসে।

গাড়ি চলেছে মধুর গৃহের পথে।

অশ্বযুগলের ক্ষুরের টক্ টক্ শব্দ কানে এসে বাজে।

একসময় মধু বললে—আজ দর্মাহাটায় এক সন্ন্যাসিনী এসেছেন শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, জানো আনন্দ?

সন্ন্যাসিনী!

হ্যাঁ। কতই বা বয়স হবে সন্ন্যাসিনীর—পঁচিশও বোধ করি হবে না। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

দর্মাহাটার কোথায়?

মল্লিকদের যে পুরাতন ভাঙ্গা বাড়িটা আছে—

চমকে ওঠে যেন আনন্দ। বলে—মল্লিকদের পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ি!

হ্যাঁ। বিশাল সে প্রাসাদের মত বাড়ি। সংস্কারের অভাবে প্রায় সবটাই আজ ভগ্ন, জীর্ণ। কেবল মল্লিকদের প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মন্দিরটি কোনমতে টিকে আছে। আর আছে সেই রাধামাধবের পাষাণবিগ্রহ।

আমি জানি সে বাড়ি—আনন্দ বললে।

তুমি জানো ?

হ্যাঁ, জানি। একসময় হিন্দু স্কুলে যখন পড়ি—ঐ গৃহে আমি ছিলাম।

তাই নাকি !

রাধারমণ মল্লিকমশাই—ঐ মল্লিক বংশের শেষ বংশধর—তার এক বালবিধবা কন্যা ছিল। সে-ই পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়।

কি রকম। মধু গুপ্ত রীতিমত কৌতূহলী হয়ে ওঠে আনন্দচন্দ্রের কথায়।

আনন্দ তখন সুহাসিনীর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করে গেল। তারপর বললে, আমার যেন মনে হচ্ছে মধু—

কি ?

তুমি যাকে দেখেছো সে ঐ সন্ন্যাসিনী সুহাসিনী। তাকে শেষ দেখা দেখেছিলাম মল্লিকখুড়োর মৃত্যুসময়ে।

তা হতে পারে। তবে সন্ন্যাসিনী—বয়সও তোমাকে বললাম, মাথায় আজানুলম্বিত রুক্ষ কেশভার, পরনে গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

মল্লিকবাড়ির রাধারমণের মন্দিরের চাতালে বসেছিলেন দুটি চক্ষু মুদ্রিত—ধ্যানাসনে উপবিষ্ট।

পাশে একটি ত্রিশূল ও কমণ্ডলু। কি রূপ সেই যোগিনী সন্ন্যাসিনীর ! সর্ব অঙ্গ দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

তা তুমি সেখানে হঠাৎ কেন গিয়েছিলে মধু ?

হঠাৎ নয়। ঐখানেই একজন রোগীকে দেখতে গিয়েছিলাম। রোগীর বয়স বেশী হবে না। এই আমাদের বয়সীই হবে, বা দুচার বছর বড হতে পারে আমাদের থেকে। ভয়াবহ ক্ষয়রোগ—একেবারে শেষ অবস্থা।

সেই ক্ষয়রোগীকে দেখতে তুমি কোথায় গিয়েছিলে মধু ? আনন্দ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

সে এক ইতিহাস ভাই—অবিশ্যি সব কথা স্থানীয় এক বৃদ্ধের মুখেই শোনা।

তারপর মধু গুপ্ত যে কাহিনী বলে গেল—অবিশ্যি সবটাই সেই বৃদ্ধের মুখে শোনা।

ঐ ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর নাম ভোলানাথ। কথাটা বলতেই আনন্দ চমকে ওঠে।

ভোলানাথ ! নাম ভোলানাথ ?

হ্যাঁ, চেনো নাকি তাকে ?

চিনি—

চেনো!

হ্যাঁ। ঐ ভোলানাথ যুবাবয়সে ঐ মল্লিকগৃহেই ছিল। মল্লিকবাড়িতে যে রাঁধুনী ছিল তারই ছেলে। মায়ের মত সেও ঐ গৃহে ছিল আশ্রিত। লেখাপড়া করে নি, অথচ ছেলেটি সত্যিই বুদ্ধিমান ছিল। অসৎ সঙ্গে মিশে যাকে বলে অধঃপাতে গিয়েছিল। কবির দলে, গাঁজার আড্ডায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

তারপর?

ভোলানাথ ছিল সুহাসিনীর প্রতি আকৃষ্ট।

প্রেম?

প্রেম কিনা জানি না—তবে সুহাসিনীর প্রতি তার একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। সরল বিধবা বালিকা সংসারজ্ঞানহীনা—সেও ভোলানাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মল্লিক-গিন্নী ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তিনি ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরে তাকে মল্লিকবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু—

কি?

ভোলানাথ কিন্তু প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে সুহাসিনীর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। এদিকে মল্লিকখুড়ো বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পরামর্শ নিয়ে বালবিধবা কন্যার আবার বিবাহ দেবেন স্থির করেন। কত্তামা ও মল্লিকগিন্নী ব্যাপারটা ঐ ভোলানাথের মুখ থেকেই জানতে পেরে বিবাহের ঠিক দুদিন আগে কর্তামার গুরুগৃহ নবদ্বীপধামে নাতনীকে নিয়ে চলে যান। সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম ওদের পৌছে দিতে।

এ যে রীতিমত এক নাটক হে আনন্দ!

তাই।

তারপর যা যা ঘটেছিল আনন্দচন্দ্র বলে গেল। সুহাসিনীর সন্ন্যাসগ্রহণ ও তার পিতার শেষ সময়ে অকস্মাৎ ঐ গৃহে আগমন—সব কিছু।

তারপর ভোলানাথের কি হলো?

জানি না। তার কোন সংবাদ আর আমি পরে পাই নি। অবিশ্যি জানবারও কোন চেষ্টা করি নি।

সব শুনে মধু বললে—তাহলে তুমি ঐ ভোলানাথ ও সন্ন্যাসিনীকে চেনো আনন্দ?

হ্যাঁ।

পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে সেই সাহেবের বাড়ির খানসামা আব্বাস মিঁয়ার ডেরাতেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত ভোলানাথ।

সাগরসঙ্গমে সন্ন্যাসী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে একপ্রকার ভোলানাথ কলকাতা-

তেই ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে ঐ আব্বাসের ডেরাতেই গিয়ে ওঠে।

একমুখ দাড়িগোঁফ, একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, ছিন্ন বসন—ভোলানাথকে দেখে আব্বাস মিয়া রীতিমত অবাক হয়।

ভোলাবাবু, এঁ কি চেহারা হয়েছে হে তোমার? এত দিন কোথায় ছিলে?

ভোলানাথ আব্বাসের কথার কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

কি হয়েছে তোমার ভোলাবাবু?

কিছু না মিয়া। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাবো।

কিছু খাবে?

না।

আব্বাসের খাটিয়াটার উপরেই ভোলানাথ শুয়ে পড়লো।

আব্বাস আর কিছু বললে না।

দুটো দিন দুটো রাত তারপর ঐ খাটিয়াটার উপর পড়ে পড়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে ভোলানাথ।

তৃতীয় দিন দুপুরে ঘুম ভাঙ্গল তার।

ঘুম ভাঙ্গলো?

হ্যাঁ।

কিছু খাবে?

কি আছে?

রোটি, গোস—

গরুর মাংস?

হ্যাঁ। আর তো কিছু নেই। খাবে?

ভাত নেই? ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করে।

জল-দেওয়া ভাত আছে।

তাই দাও। আর দুটো লঙ্কা পুড়িয়ে দাও।

ভোলানাথ আব্বাসের ডেরাতেই থেকে গেল। ক'টা দিন কেবল পড়ে পড়ে ঘুমাল ভোলানাথ। অমন যে আমুদে মানুষটা—সর্বদা কেমন চুপচাপ বসে থাকে যখন জেগে থাকে।

এমন কি কোথায়ও বেরও হয় না।

আব্বাস শুধায়—কি হয়েছে তোমার ভোলাবাবু?

কিছু তো হয় নি।

আলবত কিছু হয়েছে তোমার। তুমি আমার কাছে লুকাচ্ছো। কালুদের আড্ডায় যাবে ?

না।

সেদিন কালু আর জগন্নাথ তোমার কথা শুধাচ্ছিল।

ভোলানাথ ওর কথার কোন জবাব দিল না।

মাথাভর্তি ঝাকড়া ঝাঁকড়া চুল। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ।

একদিন ভোলানাথ বললে—আমাকে একটা কাজ দেবে মিয়া ?

কি কাজ ?

যা হোক কোন কাজ। খানসামার কাজ, কোচওয়ানের কাজ।

ব্রুহাম গাড়ি হাঁকাতে পারবে তুমি ?

পারবো।

তবে ঠিক আছে। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে একজন কোচওয়ানের দরকার। আমার এক ভাইজান সেখানে কাজ করে। বলবো তাকে।

অবশেষে আব্বাসের চেষ্টাতেই সেখানে কাজ পেল ভোলানাথ।

কিন্তু সে কাজ বেশী দিন করতে পারে না। মনের মধ্যে যেন দিবারাত্র একটা শূন্যতা। একদিন ঘুরতে ঘুরতে মল্লিকবাড়িতে এলো ভোলানাথ প্রায় বৎসর দুই পরে।

মল্লিকবাড়ির সে বোলবোলাও আর নেই।

সুহাসিনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকবাড়ির সমস্ত আলো যেন নিভে গিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন ও আশ্রিতের জন্য যে গৃহ সর্বদা গমগম করতো, সে গৃহ এখন যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

কত্তামা ভবতারিণী দেবী স্বর্গে গেছেন।

কত্তাবাবু রাধারমণ মল্লিক মশাই সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। ভোলানাথের মা মঙ্গলা নেই, নবদ্বীপধামে চলে গেছে।

অত বড় বাড়ির মধ্যে মানুষজনের মধ্যে কত্তাবাবু রাধারমণ মল্লিক সর্বদাই ঘরের মধ্যে বসে থাকেন। ঘরের বাইরে বড় একটা বেরই হন না।

অন্নপূর্ণা একা। আর আছে কাদম্বিনী। মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াতেই কাদম্বিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভোলানাথের।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

কাদম্বিনী এসেছিল মন্দিরে সান্ধ্যপ্রদীপ দিতে।

নাটমন্দিরের একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল ভোলানাথ। দূর থেকে তাকে

দেখতে পেয়ে কাদম্বিনী শুধালো—কে গো ওখানে ?

ভোলানাথ সাড়া দেয় না।

সাড়া দিচ্ছ না কেন—কে ওখানে ?

তবু সাড়া নেই ভোলানাথের।

প্রদীপ হাতে এগিয়ে এলো ভোলানাথের সামনে কাদম্বিনী—কে ?

একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—একমুখ দাড়িগোঁফ।

কাদম্বিনী আঁতকে ওঠে, বলে—কে, কে ?

আমি—

কে ? ভোলানাথ ?

কণ্ঠস্বরেই চিনতে পেরেছিল কাদম্বিনী ভোলানাথকে।

হ্যাঁ। ভোলানাথ বললে।

এ কী চেহারা হয়েছে তোমার ?

মা কোথায় ? মাকে একবার ডেকে দেবে কাদম্বিনী ?

বামুনদিদি ?

হ্যাঁ, আমার মা।

বামুন দিদি তো নেই !

নেই ? কোথায় ? মারা গেছে ?

না।

তবে ?

বামুনদিদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

কোথায় ?

নবদ্বীপধামে।

ও। আচ্ছা আমি চলি।

চলে যাবে ? গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করবে না ?

না।

কত্তাবাবু—মামা—

না।

ভোলানাথ বের হয়ে এলো মল্লিকবাড়ি থেকে।

প্রদীপ হাতে স্থাণুর মত মন্দিরচত্বরে দাঁড়িয়ে রইলো কাদম্বিনী।

আর ভোলানাথ আসে নি ঐ গৃহে সুদীর্ঘ সাতটা বৎসর।

ক্ষয়রোগে ধরেছিল ভোলানাথকে।

কবরেজমশাই কালীশঙ্কর জ্যোতিষার্ণব বলেছিলেন—এ বাবা ক্ষয়রোগ, শিবেরও অসাধ্যি।

বাবুরা রোগের কথা শুনে ওকে অন্যত্র চলে যেতে বললেন।

সাত বৎসর বাদে ঘুরতে ঘুরতে আবার একদিন এলো ভোলানাথ ঐ মল্লিক-বাড়িতে। ভগ্ন জীর্ণ মল্লিকবাড়ি তখন—রাধারমণ মল্লিক ও অন্নপূর্ণা বৎসর দুই হলো স্বর্গে গেছেন।

মানুষজন বলতে একটিমাত্র প্রাণী—কাদম্বিনী।

সে-ই একা প্রেতিনীর মতো ঘুরে বেড়ায় সারাটা বাড়িতে।

শ্বশুরালয়ে চলে গিয়েছিল সে—রাধারমণ ও অন্নপূর্ণার মৃত্যুর কিছু পূর্বে। বৎসর দুই বাদে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে বিতাড়িত হয়ে সেখান থেকে।

সে যখন আবার ফিরে এলো—মল্লিকবাড়ি তখন শূন্য।

সেই থেকে কাদম্বিনী একাই রয়েছে ঐ জনশূন্য পুরীতে।

জ্বর নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন ভোলানাথ আবার এসে উঠলো ঐ মল্লিক-বাড়িতেই।

কাদম্বিনী তো দেখে তাকে চিনতেই পারে না।

কে গো ?

কাদম্বিনী, আমি—আমি ভোলানাথ।

প্রবল জ্বরে ধুঁকছে তখন ভোলানাথ। মধ্যে মধ্যে খক খক করে কাশছে। দাঁড়াতেও পারছে না ভোলানাথ।

কি—কি হয়েছে তোমার ? চল—চল ঘরে চল !

গোটা-দুই ঘর নিয়ে কাদম্বিনী থাকত। ভোলানাথকে ধরে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

কাদম্বিনী, আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো ?

সে কি ! তাড়িয়ে দেব কেন ? নাও, এখানে শুয়ে পড়।

সুখময় জানত কাদম্বিনী ঐ মল্লিকগৃহে আছে—সে আপত্তি জানায় নি। বাড়িটা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত বাড়িটা দেখাশুনারও তো একজন দরকার।

সুখময় তাই বাধা দেয় নি। বরং তার আহারের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে আসতো সুখময়।

খোঁজখবর নিত সব কিছুর—চাল, ডাল, তেল, নুন, আনাজপাতির ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতো।

আসলে সুখময়ের ধারণা ছিল ঐ মল্লিকবাড়ির কোথায়ও না কোথায়ও রাধা-

রমণ মল্লিকের অনেক ধনরত্ন সোনাদানা লুকানো আছে।

মধ্যে মধ্যে এসে সে সেই সব লুক্কায়িত ধনরত্নের সন্ধান করতো।

একদা কাদম্বিনী সত্যি-সত্যিই ভালবেসেছিল ভোলানাথকে।

তাই ভোলানাথ ঐখানে আসায় সে খুশীই হয়।

ভোলানাথ বললে—কাদম্বিনী, আমার খারাপ ব্যাধি হয়েছে।

কি হয়েছে?

কবরেজ বলেছেন—ক্ষয়রোগ।

ও মাগো, সে কি সর্বনেশে কথা! আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে কাদম্বিনী।

কাদম্বিনী!

কি গো?

আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো কাদম্বিনী?

না, না। সে কি কথা—তবে সুখময়বাবু যদি জানতে পারেন—মানুষটা তো একের নম্বরের হারামজাদা—হয়ত দুজনকেই বাড়ি থেকে বের করে দেবে!

তাহলে কি হবে কাদম্বিনী?

তুমি কিছু ভেবো না। তুমি যে এখানে আছো আমি সেটা জানতেই দেবো না তাকে। সে জানতেই পারবে না।

লোকটা বুঝি প্রায়ই আসে এখানে?

মধ্যে মধ্যে আসে। মামার লুকানো ধনরত্নের লোভে।

তাই নাকি?

হ্যা। এসে খোঁজাখুঁজি করে—এখানে ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে শাবল দিয়ে। কিন্তু পাবে না, কোন দিনই সে-সবের সন্ধান সে পাবে না। এমন জায়গায় সে-সব আছে—

তুমি জান?

জানি। হঠাৎ একদিন জানতে পেরেছিলাম—রাধামাধবের মন্দিরের পাষাণ-বেদীর তলায় একটা চোরাগর্ত আছে—তার মধ্যে সব লুকানো আছে।

জানলে কি করে?

কত্তামা জানতেন—একদিন তাঁকে ঐ লুকানো জায়গা থেকে একটা মোহর বের করতে দেখে ফেলেছিলাম। জান সে আসল সোনার মোহর—বাদশাহী সোনার মোহর—একঘড়া সোনার মোহর।

থাক গে!

তুমি চাও তো সব তোমাকে দেখাতে পারি।

না, ওর প্রতি আমার কোন লোভ নেই।

লোভ নেই!

না। যদি থাকত—যেদিন সুহাসিনী আমাকে তার সব গয়না দিয়েছিল—আমি তা গঙ্গাসাগরের জলে সব বিসর্জন দিয়ে এসেছি—

সেকি গো!

হ্যাঁ। ওসব ধনদৌলতে আমার এতটুকুও লোভ নেই।

কাদম্বিনী রীতিমত অবাকই হয় ভোলানাথের কথা শুনে।

হঠাৎ কাদম্বিনী বলে—সুহাসিনী মরে নি তুমি জান?

জানি।

জান?

হ্যাঁ, জানি। সে সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছে।

সে এখন কোথায় জান?

জানি না। তাকে শেষ দেখা দেখেছিলাম কত্তাবাবু ও গিন্নীমার মৃত্যুসময়ে। তারপরই একটু থেমে বললো ভোলানাথ—একটিবার যদি তার দেখা পেতাম—

তাহলে কি করতে?

তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতাম।

ক্ষমা!

হ্যাঁ, ক্ষমা।

কেন? কিসের ক্ষমা?

সে ছিল বিধবা—তাকে ভালবেসে যে পাপ করেছিলাম—জান কাদম্বিনী, এ রোগ আমার সেই মহাপাপেরই ফল। কিন্তু আমি জানি এ জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না।

দিনে দিনে ভোলানাথের অবস্থার অবনতি ঘটে। একেবারে শয্যায় লীন হয়ে যায় যেন ভোলানাথ।

কাদম্বিনী সাধ্যমত তার চিকিৎসা করায়, কিন্তু কোন সুফল দেখা যায় না।

কবিরত্ন একপ্রকার জবাবই দিয়ে গিয়েছেন, কোন আশাই আর নেই।

কাদম্বিনী কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়।

এমন সময় হঠাৎ এক প্রত্যুষে কাদম্বিনী মন্দির ধোয়া-পোঁছা করবার জন্য মন্দিরে আসতেই চোখে পড়ে এক সন্ন্যাসিনী—মন্দিরের সোপানে বসে।

ভোরের প্রথম আবছা আবছা আলোয় সন্ন্যাসিনীকে চিনতে পারে না কাদম্বিনী।

কে মা তুমি ?

কাদম্বিনী !

কে—কে ? এ কি স্থহাসিনী !

না, আমি সন্ন্যাসিনী। ভোলাদাকে দেখতে এসেছি যোশী মঠ থেকে।

তার প্রাণটা বোধ হয় এখনো দেহ ছেড়ে যায় নি কেবল তোমারই প্রতীক্ষায় –তাকে দেখবে ?

কোথায় সে—

ঘরে। সে তো উঠতে পারে না। একেবারে শয্যাশায়ী।

চল।

কোথায় ?

তার কাছে আমাকে নিয়ে চল।

৩৪

কাদম্বিনী পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল নবীনা সন্ন্যাসিনীর দিকে।

তার মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন তখন তোলপাড় করছে। সত্যিই কি এই সন্ন্যাসিনী সেই স্থহাসিনী ! সন্ন্যাসিনীর সারা অঙ্গ হতে যেন এক অপরূপ লাবণ্য ও জ্যোতি ঝরে পড়ছে।

রুক্ষ কেশভার নিতম্ব পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা একটি ব্যতীত কোন আভরণ দেহের কোথায়ও নেই। বিশাল দুটি চক্ষু যেন নিমীলিত।

সন্ন্যাসিনী আবার বললে, কি হলো, চল ?

অ্যাঁ ! চমকে ওঠে কাদম্বিনী। হারানো সম্বিৎ যেন ফিরে পায় ও, বলে, কোথায় ?

ভোলাদার কাছে, সন্ন্যাসিনী বললে।

হ্যাঁ, চল।

সেই বিরাট মল্লিকদের গৃহ আজ ভগ্ন, জীর্ণ। কোথাও কোন কার্নিসের আড়ালে বসে কবুতর একটানা গুঞ্জন করে চলেছে। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি এই গৃহে কত স্মৃতি-ভরা। কত্তামার সেই স্তবপাঠ যেন শুনতে পায় সন্ন্যাসিনী।

'প্রভুমীশমণীশমশেষগুণম্—'

সব কক্ষগুলিই পরিত্যক্ত। জীর্ণ আঙ্গিনায় বড় বড় ফাটল—মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থের চারা শাখা-প্রশাখা মেলেছে—অদ্ভুত একটা নির্জনতা যেন কণ্ঠ টিপে ধরে।

একেবারে শেষপ্রান্তে ঘরটি—যে ঘরে কত্তামা আর কাদম্বিনী থাকত—সেই কক্ষে কাদম্বিনীর পিছনে পিছনে এসে সন্ন্যাসিনী প্রবেশ করল।

দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে যেন একটা থমথমে অন্ধকার—সবকিছু কেমন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা এবং সেই কারণেই দিনমানেও ঘরের কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। ঘরের একটিমাত্র জানালা খোলা—সেই খোলা জানালাপথে বাইরের আলো প্রবেশ করছে না বললেই চলে।

এ ঘরে খুবং কম আসতো সুহাসিনী। এ ঘরটার মধ্যে পা দিলেই যেন গা-টার মধ্যে কেমন ছমছম করতো।

ঘরের একধারে বিরাট একটি পালঙ্ক। পঙ্খের কাজ করা। ঐ পালঙ্কেই কত্তামা শুতেন। সেই পালঙ্কের উপরেই জীর্ণ শয্যায় ভোলানাথ শুয়েছিল।

সন্ন্যাসিনী ঘরে প্রবেশ করে প্রথমটায় কিছুই দেখতে পায় না। কেমন একটা ভ্যাপসা চাপা গন্ধ ঘরের বাতাসে—নানা জাতীয় কবিরাজী ঔষধ ও তৈলের মিশ্র গন্ধ, কটু, নাক জ্বালা করে।

ভাল করে তাকাতেই সন্ন্যাসিনী শয্যায় শায়িত ভোলানাথকে দেখতে পেল। একেবারে যেন লীন হয়ে গিয়েছে শয্যায় ভোলানাথের শীর্ণ কঙ্কালসার দেহটা, মুখ-ভর্তি দাড়ি। সন্ন্যাসিনী কয়েক মুহূর্ত সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, ভোলাদা।

সেই ডাক শ্রবণে প্রবেশ করতেই ভোলানাথের শীর্ণ দেহটা যেন বারেকের জন্য কেঁপে উঠল। সে চক্ষু মেলে তাকাল, ক্ষীণকণ্ঠে বললে, কে?

ভোলাদা, আমি!

কে—সুহাস? সত্যি-সত্যিই তুমি এসেছ? জেগে স্বপ্ন দেখছি না তো আমি। ভোলানাথের গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা।

সন্ন্যাসিনী ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ভোলানাথের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াল।

সুহাস—

আমি সন্ন্যাসিনী। ও-নামে আজ আর ডেকো না ভোলাদা। শান্ত গলায় বললে সন্ন্যাসিনী।

কাদম্বিনী!

কিগো? কাদম্বিনী ভোলানাথের ডাকে সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রদীপটা—প্রদীপটা একটু সামনে তুলে ধর। একবার—একবার ওকে ভাল করে দেখি।

কাদম্বিনী ঘরের কোণ থেকে প্রজ্বলিত প্রদীপটা নিয়ে এসে সামনে তুলে ধরল।

ভোলানাথ দু'চোখ ভরে দেখে সন্ন্যাসিনীকে।

এই কি তার সেই সুহাস!

তৃপ্তিতে, কি অসীম শান্তিতে যেন তার এত বৎসরের তৃষিত দুটি চক্ষুর দৃষ্টি যেন ভরে গেল। চোখের পাতা নেমে এলো।

ভোলাদা, দিবারাত্র তুমি আমায় ডাকছিলে—তাই আমাকে আসতে হলো।

অসীম করুণা তোমার দেবী।

আমাকে আর চিন্তা করো না ভোলাদা, সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ডাকো।

ঈশ্বর—ভগবান—তুমিই আমার সব।

সন্ন্যাসিনীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি জেগে ওঠে।

কাদম্বিনী! ডাকল সন্ন্যাসিনী।

কি বলছো?

এর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছো?

কবিরাজ দেখছেন।

না, তুমি কোন বড় চিকিৎসককে এনে ওকে দেখাও।

কাকে ডাকবো? কাউকেই তো আমি চিনি না!

বৈঠকখানায় ডাঃ মধু গুপ্ত থাকেন—খুব অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক, তাঁকে ডেকে আনো। বিলম্ব করো না—আজই যাও।

আমি তো শহরের রাস্তাঘাট চিনি না।

পাড়ার কারো সঙ্গে তোমার আলাপ নেই?

আছে, কিন্তু এখানে কেউ আসে না। তাছাড়া একা ওকে এখানে রেখে যাবো কি করে?

আমি এখানে আছি—তুমি দেখো কাউকে পাঠাতে পারো কিনা।

দেখছি আমি—বলে কাদম্বিনী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

দেবী!

কথা বলো না ভোলাদা। বলতে বলতে সন্ন্যাসিনী শয্যার আরো নিকটে গিয়ে তার শীতল স্নিগ্ধ পুষ্পকোরকতুল্য হাতখানি ভোলানাথের কপালের উপর রাখল।

আঃ!

ঘুমোও—কথা বলো না।

পাড়ার একটি ছেলেকেই পাঠিয়ে দিল কাদম্বিনী। ছেলেটি ভাগ্যক্রমে চিনত মধু গুপ্তর ডাক্তারখানা।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মধু গুপ্ত এল।

কোথায় রোগী ?

আসুন এই ঘরে।

ঘরে প্রবেশ করতেই মধু গুপ্ত দেখতে পেল শয্যায় শায়িত জীর্ণ এক কঙ্কালসার দেহ—তার পাশে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসিনী। নবীনা সন্ন্যাসিনী। মধু গুপ্তর চোখের দৃষ্টি যেন আর ফেরে না।

আসুন ডাক্তারবাবু।

সন্ন্যাসিনীর ডাকে মধু গুপ্ত এগিয়ে এল।

মনে হচ্ছে ক্ষয়রোগ—দেখুন তো পরীক্ষা করে !

মধু গুপ্ত রোগীর দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল, রোগ সর্বপ্রকার চিকিৎসার বাইরে। তা হলেও ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে নানা ভাবে রোগীকে পরীক্ষা করল।

ভোলানাথ চেয়ে আছে মধু গুপ্তর মুখের দিকে। চোখে মুখে যেন বাঁচার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

ঘর এমন অন্ধকার করে রেখেছেন কেন ? জানালা দরজা সব খুলে দিন—আলো বাতাস আসুক। আলো-বাতাসই এ রোগের প্রধান চিকিৎসা।

মধু গুপ্ত অতঃপর নিজেই সব জানালা খুলে দিল। পর্যাপ্ত আলো ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের বাইরে একসময় এসে সন্ন্যাসিনী প্রশ্ন করল মধু গুপ্তকে, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ল মধু গুপ্ত। বললে—না, ভালো নয়।

ওর মৃত্যু সন্নিকটে, আমিও বুঝতে পেরেছি ডাক্তারবাবু।

তবু আমরা চিকিৎসকেরা তো আশা ছাড়ি না।

যা করবার তাহলে আপনি করুন।

নিশ্চয়ই করব।

অর্থের জন্য ভাববেন না।

আর ক'টা মাস আগেও যদি এঁরা আমাকে ডাকতেন ! আক্ষেপ জানাল মধু ডাক্তার।

এরা একা, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ এদের ধারে ঘেঁষে না।

ক্ষয়রোগের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা ভীতি আছে তো, আমাকে ডাকতে হবে না, আমি নিজেই এসে দেখে যাব।

মধু!

কিছু বলছো আনন্দ ?

রাত তো এখনও খুব বেশী হয় নি।

কাল সকালে গেলে হয় না আনন্দ ? মধু বললে।

না। কাল আমি থাকছি না, চল আজ এই রাত্রেই একবার দেখে আসি ভোলানাথকে।

বেশ, তবে চল।

কোচোয়ানকে মধু গাড়ী ঘোরাবার নির্দেশ দিল।

একসময়ে গাড়ী এসে থামল জীর্ণ মল্লিকগৃহের ফটকের সামনে।

সমস্ত বাড়ীটা স্তব্ধ।

আবার এতকাল পরে আনন্দকে টেনে এনেছে এই মল্লিকবাড়ী !

মনে পড়ে গেল আনন্দর মল্লিককাকার সেই মৃত্যুদৃশ্য। সেই করুণ আর্তনাদ।

আনন্দর তো এই গৃহ অতি পরিচিত। ক্রহাম গাড়ী থেকে নেমে আনন্দই এগিয়ে চলে। পিছনে পিছনে এগোয় মধু ডাক্তার। অন্ধকারেও তার পথ চিনতে কষ্ট হয় না।

কিছুটা অগ্রসর হবার পর অন্ধকারে একটা আলো দেখা গেল।

কাদম্বিনী গাড়ির শব্দ পেয়ে আলো হাতে এগিয়ে আসছিল ঐদিকেই।

কে ?

আমি। সাড়া দিল মধু ডাক্তার।

ডাক্তারবাবু ?

হ্যাঁ, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখে যাই।

আসুন।

কাদম্বিনী ওর সঙ্গে আনন্দকে দেখেও কিন্তু চিনতে পারে না।

কাদম্বিনী না চিনতে পারলেও আনন্দ কিন্তু চিনতে পেরেছিল কাদম্বিনীকে। কাদম্বিনীর চেহারায় বিশেষ একটা তেমন কিছু পরিবর্তন হয় নি।

আনন্দ ডাকল, কাদম্বিনী !

কে ?

আমি আনন্দ, চিনতে পারছ না আমাকে ?

আনন্দ !

হ্যাঁ।

তুমি কোথা থেকে ?

ডাক্তারবাবু আমার অনেক দিনের বন্ধু। তার মুখে সব কথা শুনে দেখতে

এলাম ভোলানাথকে। কেমন আছে সে?

এসো।

সকলে গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

গলা পর্যন্ত একটা কাঁথায় ঢাকা ভোলানাথের শীর্ণ দেহটা।

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে। আর ঘরের অন্যদিকে মেঝেতে বসে সন্ন্যাসিনী, তুটি চক্ষু মুদ্রিত—ধ্যানস্থ—কোন শব্দ যেন শ্রবণে প্রবেশ করছে না।

কাদম্বিনী বললে, সন্ধ্যা থেকে জ্বরটা খুব বেশী, ডাক্তারবাবু। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে।

মধু ডাক্তার পরীক্ষা করল রোগীকে।

জ্বরের ঘোরে সংজ্ঞাহীন ভোলানাথ।

সুহাসিনীকে চিনতে আনন্দর কষ্ট হয় না। তাছাড়া ঐ সন্ন্যাসিনী-বেশে সুহাসিনীকে তো পূর্বেও দেখেছে একবার মল্লিককাকার মৃত্যুসময়ে।

মধু ডাক্তার আনন্দকে বললে, আনন্দ, তুমিও একবার পরীক্ষা করে দেখো না!

আমি আর কি দেখব মধু!

তবু একবার তুমিও পরীক্ষা করে দেখো।

আনন্দ আর আপত্তি করল না। স্টেথো দিয়ে সেও পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ ধরে। তুটি বুকই মনে হল তার একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে।

ঐ সময় ভোলানাথ চোখ মেলল।

কাদম্বিনী! ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল।

এই যে আমি, কিছু বলছ? মুখের ওপর ঝুঁকে বলল কাদম্বিনী ভোলানাথের।

বড় কষ্ট—

এই যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কি আর করবেন উনি, বুঝতে পারছি সময় আমার হয়ে এসেছে।

ভোলানাথ! আনন্দ ডাকল।

কে?

ভোলানাথ, আমি আনন্দ—

আনন্দ—আনন্দ তুমি—

হ্যাঁ, ভোলানাথ। খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

না। দেবী কি চলে গেছেন?

না।

তাঁকে আর আটকে রেখো না আনন্দ। আজ তিন দিন আমার রোগশয্যার পাশে রয়েছেন তিনি। এবার তাঁকে যেতে বলো।

ভোলাদা!

চমকে সকলে ফিরে তাকাল।

কখন একসময়ে সন্ন্যাসিনী উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, কেউ ওরা জানতে পারে নি।

দেবী—এবারে আপনি যান।

ব্যস্ত হয়ো না। শান্তকণ্ঠে সন্ন্যাসিনী বলল।

ভোলানাথের দু'চোখে জলের ধারা। সন্ন্যাসিনী ভোলানাথের মাথায় একখানি হাত রাখল।

প্রথম ভোরের আলো পূর্বদিকের প্রান্তে তখন সবে লুকোচুরি শুরু করেছে। মল্লিকবাড়ির পশ্চাতের জঙ্গলে পাখিদের প্রথম কাকলি শুরু হয়েছে।

ভোলানাথ শেষ নিঃশ্বাস নিল।

ভোলানাথের দাহকার্য শেষ পর্যন্ত মধু ডাক্তার ও আনন্দকেই সম্পন্ন করতে হল গঙ্গাতীরে মহাশ্মশানে।

চিতার অগ্নি নির্বাপিত হওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাসিনীকে কিছুদূরে গঙ্গাতীরে উপবিষ্টা দেখা গিয়েছিল, তারপর আর কেউ তাকে দেখতে পায় নি। যেমন অকস্মাৎ সে এসেছিল তেমনি অকস্মাৎই যেন সে চলে গেল। আর কেউ তাকে কখনো দেখে নি।

৩৫

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দাহকার্য যখন শেষ হলো, আনন্দ মধুকে বললে, তুমি বাড়ি যাও মধু।

তুমি যাবে না?

আমি একবার মল্লিকবাড়িতে যাবো। আনন্দ বললে।

কেন? সেখানে কি প্রয়োজন? শুধালো মধু।

কাদম্বিনী সেখানে এখন একা আছে। তার একটা ব্যবস্থা না করে—

তুমি ব্যবস্থা করবে! কেন তোমার কি দায়? মধু বললে, সে তো তোমার কেউ নয়।

তা জানি মধু, তবু আজ ঐ অসহায়া নারীকে যদি ঐভাবে জেনেশুনে একাকী ফেলে রেখে যাই, ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না।

আনন্দর কথা শুনে মধু চেয়ে থাকে আনন্দর মুখের দিকে। আনন্দর কাছ থেকে ঠিক ঐ ধরনের কথাটা যেন সে প্রত্যাশা করে নি।

আনন্দ বললে, কি জান মধু, মল্লিকবাড়ির কাছে—তুমি তো জান, আমি অনেক ঋণী। প্রথম জীবনে এই শহরে যখন আমি লেখাপড়া করার জন্য আসি, তখন মল্লিক কাকার আশ্রয় না পেলে হিন্দু কলেজেই জীবনে আমার পড়া হতো না। মেডিকেল কলেজেও পড়া হতো না। ঐ কাদম্বিনী মেয়েটি মল্লিক কাকারই আত্মীয়। যদি কাদম্বিনীর অসহায় অবস্থার কথাটা না জানতাম, কথা ছিল না। কিন্তু সব জানার পর আমি দূরে সরে যেতে পারছি না। তুমি বাড়ী যাও, তোমার স্ত্রী হয়ত সারাটা রাত ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে আছেন। আমি একটিবার মল্লিকবাড়ী ঘুরে আসছি।

কথাগুলো বলে আর আনন্দ দাঁড়ালো না।

সোজা দর্মাহাটার দিকে হাঁটতে লাগল।

সেই প্রাসাদোপম জীর্ণ মল্লিকবাড়িটা তেমনি মৃত্যুর স্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে আছে। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ধূসরালোকে কেমন যেন বিষণ্ণ, ম্লান। সব কিছু ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। কেবল সেই স্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে বিঘ্নিত হচ্ছিল কবুতরের গুঞ্জনে।

ধীরে ধীরে আনন্দ অন্দরে প্রবেশ করে সেই কক্ষের সামনে এসে পড়ল, যে কক্ষ হতে আজই প্রত্যূষে সে ভোলানাথের মৃতদেহটা অন্যান্যদের সাথে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করে থমকে দাঁড়াল আনন্দ।

কাদম্বিনা কক্ষের এক কোণে চুপটি করে বসে আছে আব্‌ছা আব্‌ছা ম্লান আসন্ন সন্ধ্যার আলোয়। নিশ্চল পাষাণ যেন। রুক্ষ কেশভার পৃষ্ঠের উপরে ছড়ানো।

পদশব্দে কাদম্বিনী মুখ তুলে তাকাল। সে মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দচন্দ্র যেন হঠাৎ কেমন চমকে ওঠে। দুঃখ, বেদনা, হতাশা যেন সবকিছু একসঙ্গে সে মুখের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে আনন্দ মৃদু গলায় ডাকল, কাদম্বিনী!

কাদম্বিনীর কাছ থেকে কোন সাড়া এলো না। কেমন যেন এক শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো আনন্দের মুখের দিকে।

আনন্দচন্দ্র আবার ডাকল, কাদম্বিনী!

সব শেষ হয়ে গেল আনন্দ—

সেই সকাল থেকে এইভাবে বসে আছো! ঘরে প্রদীপও জ্বালাও নি?

হ্যাঁ, আনন্দ। সন্ধ্যাপ্রদীপ তো জ্বালাতেই হবে। এই ভিটেতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলবে না, তাও কি হয়?

কাদম্বিনী উঠে দাঁড়াল। ঘরের কোণে বিরাট একটা প্রদীপদানে একটি পিতলের প্রদীপ ছিল, সেটা জ্বালাল চকমকি ঠুকে।

তুমি একটু দাঁড়াও আনন্দ, চট করে একটা দীঘির ঘাটে ডুব দিয়ে আসি।

এই শীতের সন্ধ্যায় স্নান করবে?

কাদম্বিনী মৃদু হাসল। তারপর বললে, তুমি বোস। আমি ডুবটা দিয়ে আসি।

দড়ির উপর থেকে গামছাটা নিয়ে কাদম্বিনী ঘর থেকে বের হয়ে গেল হাতে প্রদীপটা নিয়ে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ক্রমশঃ চাপ বেঁধে উঠছে। সেই চাপ-বেঁধে-ওঠা অন্ধকারের মধ্যে আনন্দ চুপটি করে একাকী দাঁড়িয়ে রইলো। মল্লিকবাড়ির মৃত্যুর মত স্তব্ধতাটা যেন তাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে।

এই মল্লিকবাড়ি একদিন কত জমজমাট ছিল।

লোকজন দাসদাসী দরোয়ান কোচোয়ান। ঘরে ঘরে সন্ধ্যার পর প্রদীপ জ্বলতো। বাইরের ঘরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলতো। রন্ধনশালায় ব্যস্ততা।

সন্ধ্যার কিছু পরে এ বাড়ির মল্লিককর্তা সেজেগুজে হাতে ছড়ি, গায়ে সুগন্ধি আতর মেখে, ব্রুহাম হাঁকিয়ে বের হয়ে যেতেন। আরবী ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট আওয়াজ। গলায় ঘণ্টির শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে যেত। ওদিকে রাধামাধবের মন্দিরে সন্ধ্যার কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠতো। শোনা যেত শঙ্খধ্বনি। সচকিত হয়ে উঠতো মল্লিকবাড়ি।

কত্তামা তাঁর ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় চোখে চশমা দিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ভাগবত পাঠ শুরু করতেন।

মাত্র তো মধ্যখানে ক'টা বৎসর।

তারপর সব যেন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল।

বালবিধবা সুহাসিনীর বিবাহ দেবেন রাধারমণ স্থির করেছেন। কত্তামা তাকে নিয়ে নবদ্বীপধাম গুরুগৃহে রাতারাতি পালালেন। সঙ্গে তাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে পরের দিন মধ্যরাত্রে সে-ই সুহাসিনীকে নিয়ে পালিয়ে এল কলকাতায়। গুম্‌-ঘরে বন্দিনী সুহাসিনীর সর্পদংশনে মৃত্যু।

সুহাসিনী কিন্তু মরল না। সে আবার বেঁচে উঠলো। কি করে বেঁচে

উঠলো—কি করে বেঁচে উঠেছিল তা আনন্দ জানে না।

কয়েক বৎসর পরে সেই সুহাসিনী, সকলে যাকে জানত মারা গিয়েছে—বিষ-জর্জরিত মৃতদেহটা তার ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে—সে ফিরে এলো।

সন্ন্যাসিনী। সত্য ঘটনা নয়—যেন কোন কল্পিত কাহিনী। অবিশ্বাস্য।

কাদম্বিনী এসে ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে প্রদীপ।

ইতিমধ্যে সে স্নান সমাপন করেছে, শাড়ি বদলেছে, ভিজে চুলের রাশ পিঠে ছড়ানো।

আনন্দ!

কিছু বলবে কাদম্বিনী?

কবে এলে কলকাতায়?

দিন-দুই হলো এসেছি।

তুমি তো পাস করে ডাক্তার হয়েছো?

হ্যাঁ। একটা কথা ভাবছিলাম কাদম্বিনী—

কি কথা আনন্দ?

এর পর তুমি কি করবে?

কি করবো মানে?

এত বড় একটা জনশূন্য বাড়িতে একা মেয়েছেলে তুমি—

একাই তো ছিলাম।

ছিলে, তবে—

কিছুদিনের জন্য ভোলানাথ এসেছিল—

তাই বলছিলাম, এবার তো সত্যি একা হয়ে গেলে!

কাদম্বিনী চুপ করে রইলো।

তোমার কি কোন আত্মীয়পরিজন নেই?

না।

তোমার স্বামী?

তার সঙ্গে তো, তুমি জান, বহুকাল আগেই সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কি তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ইহজন্মে বা পরকালে কখনো শেষ হয়?

হয়। যে সম্পর্কের মধ্যে কোনদিনই এতটুকু সত্য ছিল না, যা সেই শুরু থেকেই মিথ্যা—আমার কথা তুমি ভেবো না আনন্দ, আমি এখানে এই পড়ো

বাড়িতে কার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে শবরীর প্রতীক্ষায় ছিলাম একাকী, তুমি হয়ত জান না আনন্দ।

জানি, ভোলানাথের জন্য। কিন্তু আজ তো সেও চলে গেল।

আমি যে অভাগিনী। আমার নিঃশ্বাসে বিষ।

আমার একটা কথা রাখবে কাদম্বিনী? তুমি তোমার স্বামীর গৃহে চলে যাও। বল তো আমি তোমাকে সঙ্গে করে রেখে আসতে পারি।

না। এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথায়ও যাবো না। এখানেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়, এখানেই সে শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছে। পাপ-পুণ্য-স্বর্গ-নরক আমি জানি না আনন্দ। যদি স্বর্গ ও নরক বলে কিছু থাকে তো এই ভিটেতেই আমার সেই স্বর্গ—সেই নরক।

তরপর একটু থেমে বললে কাদম্বিনী, এখান থেকে তুমি আমাকে কোথায়ও যেতে বলো না আনন্দ।

আনন্দ দেখলে, প্রদীপের আলোয় কাদম্বিনীর দুই চক্ষুর কোণ বেয়ে দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

কাদম্বিনী, এত বড় বাড়িতে একা একা থাকতে তোমার ভয় করে না?

না, আনন্দ। ভয় কি? তা ছাড়া—

কি?

মামাবাবুই তো আছেন।

মামাবাবু?

হ্যাঁ। যখন রাত নিশুতি হয়, তিনি সারাটা বাড়ি হেঁটে হেঁটে বেড়ান। তাঁর খড়মের শব্দ শুনতে পাই। কয়েকদিন তাঁকে দেখেছিও।

কি বলছো তুমি কাদম্বিনী?

তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না কথাটা, আমি জানতাম আনন্দ। এ ভিটের মায়া আজো বোধ হয় তিনি কাটাতে পারেন নি।

অতঃপর আনন্দ কি বলবে বুঝতে পারে না। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। তার কেবল মনে হয় কাদম্বিনীর নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।

সেই কাল রাত থেকে বোধ হয় তোমার পেটে এখনো নিশ্চয়ই কিছু পড়ে নি আনন্দ? খাবে কিছু? ঘরে চিঁড়ে কলা আছে বোধ হয়। এনে দেবো?

না, থাক।

কেন? আনি না?

না, কাদম্বিনী।

কেন, আমার হাতে খেতে ঘেন্না করে তোমার আনন্দ ?

ঘেন্না !

তাই। একজনের বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে অন্য এক পরপুরুষকে ভালবেসেছি। তোমাদের সমাজবিরুদ্ধ কাজ করেছি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে আনন্দ ?

কি ?

যে স্বামী তার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্যই জীবনে পালন করলো না, একটার পর একটা বিবাহ করে গিয়েছে, তার কোন পাপ হলো না—আর আমি একজনকে ভালবেসেছি বলেই সমস্ত পাপের বোঝা আমারই কাঁধে চাপল—এ তোমাদের সমাজের কি বিচার ? কোন্ দেশী বিচার ?

তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই কাদম্বিনী।

নেই না—বল, তুমি সেই সমাজেরই এক শেখা পুরুষ—যারা নিজেদের স্বার্থের দাঁড়িপাল্লাতেই সবকিছুর বিচার চিরদিন করে এসেছে। বলতে পারো, কেন সেদিন তুমি সুহাসের যাতে বিবাহ না হয়, তাকে নিয়ে কত্তামার সঙ্গে নবদ্বীপ-ধামে পালিয়ে গিয়েছিলে ? তোমাদের অন্ধ কুসংস্কার আর অন্যায় বিকারকে প্রশ্রয় দেবার জন্যই নয় কি ? সমাজ—সমাজ—সমাজ। সমাজ কি কেবল মেয়েদের জন্যই, পুরুষদের কি সাত খুন মাপ ?

আনন্দচন্দ্র সেদিন একটি কথারও জবাব দিতে পারে নি কাদম্বিনীর। অধো-বদনে চুপটি করে কেবল দাঁড়িয়েছিল।

কাদম্বিনীর দু' চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছিল। ঘৃণা উপচে পড়ছিল তার প্রতিটি উচ্চারিত কথার সঙ্গে সঙ্গে।

অবশেষে এক সময় ধীরে ধীরে বললে, সত্যিই ক্ষিধে পেয়েচে আমার কাদ-ম্বিনী। কি আছে নিয়ে এসো তোমার ঘরে, যাও।

খাবে ?

খাবো। যাও নিয়ে এসো।

কাদম্বিনী পাশের ঘরে চলে গেল।

এবং একটু পরে একটা কাঁঠাল কাঠের পি ড়ি এনে মেঝেতে পেতে দিয়ে এক গ্লাস জল এনে রাখল। থালায় করে শালী ধানের সরু চিকন চি ড়া, গোটা কয়েক মর্তমান কলা ও একটু আখের গুড় এনে রাখল।

নাও, বোস।

আনন্দ পিঁড়িতে বসে থালাটা সামনে টেনে নিল।

খেতে খেতে আনন্দ বুঝতে পারে সত্যিই তার ক্ষুধায় পেট জ্বলছিল।

আনন্দ—

কিছু বলছো কাদম্বিনী ?

বিদ্যাসাগর মশাইকে কখনো দেখি নি। একবার যদি তাঁর দর্শন পেতাম—

তিনি তো কলকাতায় নেই। তাছাড়া তিনি খুব অসুস্থ।

অসুস্থ ?

হ্যাঁ। শুনেছি কার্মাটারে আছেন তিনি।

একটিবার তাঁকে প্রণাম করার মনে মনে বড় সাধ ছিল আনন্দ।

আনন্দর আহারপর্ব শেষ হয়েছিল। সে গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গ্লাসের সমস্ত জলটা পান করলে। গামছায় হাত মুছতে মুছতে বললে, তাহলে এখানেই থাকাটা স্থির করলে কাদম্বিনী ?

হ্যাঁ, আশীর্বাদ কর যেন যেখানে ভোলানাথ তার শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছে, সেই ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস নিতে পারি।

ভয় নেই তোমার কাদম্বিনী। তাই হোক। বিধাতা তোমার এত বড় প্রেমের অমর্যাদা নিশ্চয়ই করবেন না।

৩৬

বিধাতা তোমার এত বড় প্রেমের নিশ্চয়ই অমর্যাদা করবেন না।

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল আনন্দচন্দ্র।

কাদম্বিনী—

ডাকল আনন্দচন্দ্র।

কাদম্বিনী তাকাল আনন্দচন্দ্রর মুখের দিকে।

আমি তাহলে এবার চলি কাদম্বিনী।

যাবে ?

হ্যাঁ, চলি। আর হয়ত এ জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তবে একটা কথা বলা থাকলো—যদি কখনো কোন কারণে আমাকে তোমার প্রয়োজন হয়, আমাকে একটা সংবাদ দিতে দ্বিধা করো না।

না, করবো না। তারপর একটু থেমে বললে, যদি কখনো ভবিষ্যতে কারো দ্বারস্থ হতে হয়, হাত পাততে হয়, সে তোমারই কাছে হাত পাতবো।

মধুকে আমি বলে যাবো, যদি কখনো কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তো তাকেও

একটা খবর পাঠাতে পারো।

কাদম্বিনী আনন্দর কথার কোন জবাব দিল না।

আনন্দ অতঃপর দরজার দিকে এগুতেই কাদম্বিনী বললে, দাঁড়াও একটু আনন্দদাদা।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই আনন্দ কাদম্বিনীর মুখের দিকে তাকাল।

কাদম্বিনী এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে আনন্দর পায়ের সামনে প্রণাম করল। আশীর্বাদ করো আনন্দদাদা, যেন তাড়াতাড়ি ভোলানাথের কাছে যেতে পারি।

আনন্দ কোন জবাব দিল না। ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বাইরে তখন রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। হাঁটতে লাগল আনন্দচন্দ্র।

রাস্তায় মধ্যে মধ্যে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। রাস্তায় বড় একটা লোকজন নেই। মধ্যে মধ্যে এক আধটা ব্রুহাম পালকি গাড়ি পাশ দিয়ে ছুটে যায়। তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ খটখট করে বাজে। আর মধ্যে মধ্যে দেখা যায় দু' একটি মাতাল।

এত রাত্রে আর সেই খিদিরপুরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আনন্দচন্দ্র কলুটোলার দিকেই হাঁটতে লাগল।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভোরের আকাশে শুকতারাটা এখনো জ্বলজ্বল করছে।

নিবারণচন্দ্রর গৃহ দূরেও নয়, কাছেও নয়।

কেন যেন হঠাৎ কুসুমকুমারীর কথাটা মনে পড়ছিল আনন্দর। এ দেশের মেয়েরা কত অসহায়। বিচিত্র সমাজব্যবস্থায় তারা যেন দগ্ধে দগ্ধে মরে। বাল-বিধবা সুহাসিনী আজ সন্ন্যাসিনী। সমাজে তার ঠাঁই হলো না। ভরা যৌবনে সুহাসিনীকে হতে হলো সন্ন্যাসিনী।

ছোটবেলায় দেখেছে তার পিসীমাদের। কি দুঃখেই না তাদের প্রতিটি দিন ও রাত্রি কেটেছে। এ সমাজব্যবস্থা কি কোনদিন পাল্টাবে না? পুরুষ-শাসিত হিন্দু সমাজ কি কোনদিন অসহায় ঐ মেয়েগুলোর দিকে তাকাবে না? নিষ্ঠুর। নির্মম।

নিবারণচন্দ্রের গৃহের সদরে এসে থমকে দাঁড়াল আনন্দ।

সদরে একটি পালকি।

তাহলে কি সত্যি সত্যিই কুসুমকুমারী স্বামীগৃহ ছেড়ে চললেন?

তার অনুমানটা যে মিথ্যা নয় সেটা আনন্দ পরমুহূর্তেই জানতে পারল। আপাদমস্তক চাদরে আবৃতা এক নারী গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন। তাঁর পশ্চাতে খুড়োমশাই নিবারণচন্দ্র। চাদরে আবৃতা নারী এসে পালকিতে আরোহণ

করলেন। পালকি-বেহারারা পালকি কাঁধে তুলে নিল। পালকি চলে গেল।

আনন্দচন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ কানে এলো নিবারণচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, কে? কে ওখানে?

আজ্ঞে আমি।

কে, আনন্দ?

আজ্ঞে—

তুমি গাঁয়ে ফিরে যাও নি?

না।

নিবারণচন্দ্র আর দাঁড়ালেন না। ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আনন্দর কি যেন মনে হলো সে গঙ্গার দিকে হাঁটতে শুরু করল। নিশ্চয় নৌকা করেই শান্তিপুরে যাবেন কুসুমকুমারী।

কুসুমকুমারী সবে নৌকার পাটাতনে পা রেখেছেন। আনন্দর ডাক শুনে ফিরে তাকালেন।

খুড়ীমা।

কে?

আমি আনন্দ।

তুমি যাও নি আনন্দ গাঁয়ে ফিরে?

না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আনন্দ বললে।

যাবে তুমি আনন্দ?

হ্যাঁ, চলুন খুড়ীমা। কিন্তু কাউকে দেখছি না। আপনি কি একাই যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ আনন্দ। একাই। তোমার খুড়োমশাই অবিশ্যি লোক দিতে চেয়েছিলেন সঙ্গে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু আমি বললাম, প্রয়োজন নেই। কতটুকুই বা পথ। চলে যেতে পারবো। তা ছাড়া বাকী জীবনটাও আমাকে একাই কাটাতে হবে।

খুড়ীমা।

হ্যাঁ আনন্দ, তাই। যে কটা দিন বাঁচবো, বিধাতার কাছে একটি প্রশ্নই করবো —হিন্দুঘরের মেয়েদের প্রতি কেন তোমার এত অবিচার?

আনন্দ কোন জবাব দিল না কুসুমকুমারীর কথার। নৌকার পাটাতনে পা রেখে মাঝিকে বললে, নাও ভাসাও মাঝি।

দিন দুয়েকের জন্য কলকাতায় এসে দশটা দিন থেকে গেল আনন্দ।

শান্তিপুরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে পারল না। কিন্তু শান্তিপুরে কুসুমকুমারীর সঙ্গে না গেলে ঐ আশ্চর্য নারীর সম্যক পরিচয়ও সে পেত না।

কুসুমকুমারীর একান্ত অনুরোধেই সে সাতটা দিন শান্তিপুরে থেকে গিয়েছিল।

সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী। কুসুমকুমারীর প্রৌঢ়া মাতা, আর কুসুমকুমারী। বাড়িতে কোন পুরুষ নেই। সংসারে স্বাচ্ছল্যও ছিল না। কয়েক বিঘা মাত্র জমি। তাতেই যা ধানের সময় ধান ফলতো। সারা বছরের চাল তা থেকেই সংগৃহীত হতো। আর যা সামান্য বাড়ির পাশে জমি ছিল, সে জমিতে কলাইয়ের সময় কলাই ও মটরের সময় মটর ফলতো। একটা গাই, দুটি বলদ।

দু'দিন থেকেই বুঝতে পেরেছিল আনন্দ—অভাবের সংসার।

তাই একদিন বলেছিল, খুড়ীমা, সংসার চলবে কি করে ?

কোন তো অভাব নেই আনন্দ।

অভাব। একে অভাব ছাড়া আপনি কি বলবেন খুড়ীমা, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে খুড়োমশাইকে বলবো।

না, না! আনন্দ—

কেন না, খুড়ীমা ? আপনি তাঁর স্ত্রী—

না আনন্দ। আর যার কাছেই হাত পাতি না কেন তাঁর কাছে হাত পাততে পারবো না।

হাত পাততেই বা যাবেন কেন ? এ তাঁর কর্তব্য।

কর্তব্য !

নিশ্চয়ই। কর্তব্য নয় ?

তাই যদি হতো তো নিজে থেকেই ব্যবস্থা একটা করতেন তিনি। তাঁর অজানা তো কিছুই নয়, ভুল আমারই আনন্দ। ছোটর উপরে সংসারের ভার তুলে দিয়ে সেদিন এখানে চলে আসার পর আমারই আবার ফিরে যাওয়া সেদিন উচিত হয় নি।

সে দোষও তো আপনার নয় খুড়ীমা। আমিই তো এসেছিলাম সেদিন আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনার পরবর্তী কালের লাঞ্ছনা ও অবমাননার জন্য বোধ করি আমিও দায়ী কিছুটা।

কুসুমকুমারী বলেছিলেন, না আনন্দ, না। আমার ভাগ্য, আমার নিয়তিই সেদিন আবার আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই বা বলি কেন, স্বামীর সংসারে ফিরে যাবার হয়ত একটা লোভও সেদিন আমাকে সেখানে টেনে

নিয়ে গিয়েছিল। তোমার মনের মধ্যে সেজন্য কোন ক্ষোভ রেখো না আনন্দ।

আনন্দ সেদিন সেই স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত নারীর জন্য সত্যিই বড় দুঃখ বোধ করেছিল। স্বামী বর্তমানেও যে বিবাহিতা নারীকে শেষ জীবনে অমন করে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়, আর যে সমাজ তাকে প্রশ্রয় দেয়, সে সমাজের প্রতি একটা ক্ষমাহীন ক্ষোভে সেদিন আনন্দর মনটা সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠেছিল। আর সেদিন তার মনে হয়েছিল, সমাজকে নিশ্চয়ই তার জন্য একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মাইকেল মদ ছাড়তে কিছুতেই পারেন নি। যে যাই বলুক, যত উপদেশ ও নিষেধই করুক, মধু মদ্যপান ছাড়তে পারেন নি।

রোগের বহুবিধ জ্বালায় ভুগে ভুগে রোগক্লান্ত অবসন্ন মধু মনে মনে বোধ হয় বুঝতেই পেরেছিলেন—দিন তাঁর সত্যি সত্যিই ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যুর রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

হঠাৎ একদিন তাঁর লেখনী দিয়ে সেই অমর কথাগুলো বের হয়ে এসেছিল।

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!

লিখেই বোধ হয় আবার কি খেয়াল হয়েছিল কবির, মৃদু হেসে কবিতা লেখা কাগজটা ঘরের কোণে ছেঁড়া কাগজের বেতের ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন।

মেয়ে শর্মিষ্ঠা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে সেই কাগজের টুকরোটা পেয়ে পড়ে কেঁদে ফেলে। সে তার মা আঁরিয়তের হাতে গিয়ে কাগজটা তুলে দিয়ে বলল, দেখো মামি, ড্যাডি কি লিখেছেন?

কিরে শর্মিষ্ঠা?

দেখ না।

দেখি।

কবিতাটা পড়তে পড়তে আঁরিয়ত কেঁদে ফেলে।

এবং সেই রাত্রেই মধু যখন একা একা বসে বসে মদ্যপান করছে সে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল।

এসো আঁরিয়ত।

এসব তুমি কি লিখেছো ?

কেন ডারলিং, কি লিখেছি ?

এই যে, দেখো।

মধুর হাতে কাগজটা তুলে দিল আঁরিয়ত।

মধু মৃদু হাসলেন। এটা রেখে দাও ডারলিং আমার মৃত্যুর পর আমার কবরে—

এত নিষ্ঠুর তুমি ?

নিষ্ঠুর নয় ডারলিং। আমাকে হয়ত মনে করবে—

মনে তোমাকে এ দেশের লোক চিরদিনই রাখবে। কখনও ভুলবে না।

জানি, জানি আঁরিয়ত। এমন দিন আসবেই যখন প্রকাশকরা আমার বই বিক্রি করে তাদের পকেট ভর্তি করবে, কিন্তু আমার কপালে কিছুই জুটলো না।

ক্রমশঃ মধুর শরীর আবার ভাঙ্গছে। তবু নিষ্ঠুর দারিদ্র্য, নিদারুণ অভাব, মধ্যে মধ্যে তাঁকে হাইকোর্টে যেতেই হয়। ঐ সময় একটা মকদ্দমার জন্য তাঁকে ঢাকা যেতে হলো।

তিনি তো কেবল ব্যারিস্টারই নন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের অমর স্রষ্টা।

ঢাকাবাসীরা অকৃতজ্ঞ নয়। তাঁকে সম্বর্ধনা জানালো। মধু সাহেবী পোশাক পরে সম্বর্ধনা সভায় গিয়েছিলেন। কে যেন বললে, এই সম্বর্ধনা সভায় অন্ততঃ মধু-সূদনের সাহেবী পোশাক পরে আসা উচিত হয় নি।

মধুর কানে কথাটা গিয়েছিল। মধু মৃদু হেসে বললেন, বিলাতী পোশাক পরেছি বলেই কিন্তু আমি সাহেব হই নি। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আয়নাটা বলে দেয় আমি কৃষ্ণবর্ণ।

যতই বিলাতী আদবকায়দা পোশাক-আশাক ব্যবহার করুন না কেন, মধু মনে-প্রাণে বাঙ্গালীই ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও কখনো তিনি চার্চে যান নি।

ঢাকা থেকে কাজ সেরে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। আবার সেই পাওনাদারদের তাগাদা। কিন্তু মনের সঙ্গে শরীর যেন পাল্লা দিয়ে ভাঙ্গছে। শরীর ক্লান্ত, মনও ক্লান্ত। মধুসূদন যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেন।

ক'টা দিন যদি গঙ্গার তীরে কোথায়ও গিয়ে থাকতে পারেন স্বাস্থ্যটা হয়ত একটু ভাল হতে পারে। মধুর মনে পড়ল উত্তরপাড়ার জমিদারের গঙ্গার একেবারে কোল ঘেঁষে একটা সুন্দর লাইব্রেরী আছে। তখনই লিখলেন মধু, জয়, আমি যদি

তোমার গঙ্গার তীরবর্তী লাইব্রেরীতে গিয়ে ক'টা দিন থাকি, তোমার কি আপত্তি আছে ভাই ?

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, আদৌ না। তুমি যেদিন খুশী, চলে আসতে পারো মধু। You are most welcome. তুমি আসছো জানলে আমি সব ব্যবস্থা করে রাখবো।

মধু চলে গেলেন সেখানে।

বিরাট লাইব্রেরী বাড়িটা। অনেকগুলো বড় বড় ঘর। একেবারে যেন গঙ্গার উপরে বাড়িটা। সামনে ভাগীরথী বহে চলেছে। মধ্যে মধ্যে পালতোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে। দিবারাত্র হু-হু করে হাওয়া বইছে। মনের মধ্যে যেন নতুন বল। সাহস পান মধুসূদন।

কিছুদিন আগে বিদ্যাসাগর অসুস্থ জেনে মধুসূদন তাঁকে একটা কবিতা লিখে পাঠান :

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র ! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি, তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে
বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ?

খুব মনে পড়ত মধুর ঐ সময় বিদ্যাসাগরের কথা। বিদ্যাসাগর অসুস্থ।

আবার কখনো মনে পড়ে নিজেরই লেখা কবিতা—গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর সেই প্রিয় জন্মভূমি কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রাম।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত, তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
শোনে মায়ামন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !

কখনো বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ান। আপনমনে আবৃত্তি করতে করতে, কখনো একটা আরাম কেদারায় শুয়ে চেয়ে থাকেন গঙ্গার দিকে। নাতিউচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করেন :

ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি, কেন ডরাইব
তোমায় ?

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে গঙ্গাবক্ষে।

এ-পার ও-পারের মধ্যখানে দুলছে যেন এক অস্বচ্ছ যবনিকা। মনে পড়ে মধুর অতীত দিনের স্মৃতি, সে এক এমনি সন্ধ্যা ছিল।

ওদিককার ঘরে স্ত্রী আঁরিয়ত পিওনো বাজাচ্ছে। মেয়ে শর্মিষ্ঠা ইংরেজীতে গান গাইছে। মাও মেয়ের কণ্ঠের সঙ্গে নিজের কণ্ঠের সুর মিলিয়েছে।

মধুর দু' চোখের কোল বেয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা তাঁর গণ্ড ও চিবুক বেয়ে পড়ে।

আর আজ—আজ তিনি তাঁর শেষ শয্যায় শায়িত।

আশা নেই—ভরসা নেই—

To-morrow and to-morro w, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time—

সিঁড়িতে কার ভারী জুতোর শব্দ যেন শোনা যায়।

কে আসে ?

মধু কান পেতে শোনেন।

৩৭

নবজাগরণের মূলমন্ত্র হল অবাধ বাণিজ্য এবং তার প্রধান মূলধন বিত্ত ও বিদ্যা দুইই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বিদ্যার মূলধন নিয়োগ করে তিনি বিদ্যাবণিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

আর সেটা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মধ্যে—তাঁর গ্রন্থকার, মুদ্রক ও প্রকাশক হওয়ার মধ্য দিয়ে।

অবিশ্যি রামমোহন রায়ও তার আগেই সেই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাঁর দেখাদেখি অনেক ইয়ং বেঙ্গলও তাঁর পথ অনুসরণ করেছিলেন। এবং সেদিনকার সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে নবযুগের বণিকসুলভ ঐ মনোবৃত্তি

প্রকাশ পেয়েছিল। আর সেটাই যে রেনেসাঁসের অন্যতম ঐতিহাধিক লক্ষণ, সে সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধেরই অবকাশ নেই।

সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিন বলতেন—The new conditions of life brought with thin new attitudes and new valuations.

আর তাই জীবনের নতুন পরিবেশ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলল।

সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তন কালে 'ব্যক্তির' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সকল শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। নিঃসন্দেহে সেদিন বিদ্যাসাগরই ছিলেন অন্যতম 'ব্যক্তি'।

বাংলার নবজাগরণ প্রধানতঃ বাইরের আদর্শ সংঘাতে শুরু হয়েছিল বলে এবং বৈদেশিক শাসনাধীনে তার বাস্তব ভিত্তি অনেকটাই রচিত হয় নি বলে তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল সেদিন উত্থান-পতন ও দ্বন্দ্ব-বিরোধ।

বিদ্যাসাগর তাই দ্বন্দ্ব-বিরোধের আঘাত থেকে মুক্তি পান নি। সমাজ পরিবর্তনের সূচনা তখনই হয় যখন সামাজিক ভাল-মন্দ বিচারের মানদণ্ডগুলি বদলাতে থাকে।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক ব্যক্তিত্ব সবল ও সমুন্নত হলেও তার মধ্যে অন্তর্বিরোধ যে একেবারে ছিল না তা নয়, তার প্রসারও সীমাবদ্ধ ছিল। যার ফলে তাঁর পক্ষে কোন সামাজিক ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় নি। প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা তিনি করেছেন, ভিতও স্থাপন করেছেন কিন্তু ধৈর্য ধরে সেটাকে ছোট থেকে বড় একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে সক্ষম হন নি।

ভারত সভা Indian Association-ই এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ঐ ধরনের একট প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠুক, বিদ্যাসাগর একান্তভাবে কামনা করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সভার উদ্যোগীরা যখন তাঁকে ঐ সভার সভাপতি হতে অনুরোধ জানাল, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে কে কে ঐ উদ্যোগের মধ্যে আছেন শুনে বলেছিলেন, তোমাদের সকল প্রচেষ্টাই পণ্ড হবে শিবনাথ। এবং তাঁর সে দূরদৃষ্টি কতটা ছিল সেটা প্রমাণিত হয়েছিল।

মানুষটার সারাটা জীবনই দ্বন্দ্ব আর বিরোধের সঙ্গে সংগ্রাম। একটানা সংগ্রাম কেবল এবং সে সংগ্রাম তাঁর নিজের সঙ্গেও তাঁকে করতে হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের ভাল-মন্দ—সংশয় ও সত্য, সবকিছু নিয়ে সেদিন একজন তাঁকে বোধ হয় সত্যিকারের চিনতে পেরেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ঠাকুর। তাই তিনি নিজেই একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য তাঁর গৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাক্ষাতের পর তাঁদের পরস্পর পরস্পরকে চিনতে একটি মুহূর্তও দেরি হয় নি।

আপনি !—বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে নমস্কার করলেন।

হ্যাঁ গো, এলাম। সাগরে এসেছি, ইচ্ছা তো আছে কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাবো।

মৃদু হেসে বিদ্যাসাগর বললেন, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয় না। কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।

ঠাকুর হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, এমন না হলে আর সাগর দেখতে আসবো কেন ?

সেদিন ঠাকুর আরো বলেছিলেন, এতদিন গেড়ে ডোবায় ছিলাম, আজ সাগরে এসে মিশলাম।

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, যখন সাগরে এসেছেন, তখন লোনা জল খেয়ে যান।

ঠাকুর বললেন, না গো, তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও যে তোমারও লোনা জল থাকবে। দেখছি তুমি বিদ্যার সাগর। লোক দেখাবার জন্য হাতির বাহিরে এক রকম দাঁত—লোকহিতকর কাজে বাইরে তোমার উৎসাহ, কিন্তু অন্তরে তুমি বেদান্ত জ্ঞানী। তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ !

কিরূপ ?

আলু পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়—তা তুমি খুব নরম দেখছি।

আনন্দচন্দ্র তার রোজনামচার পাতায় পরবর্তী কালে লিখেছিল—তিন মহা-পুরুষের আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই আমাদের সবকিছু আজকের গড়ে উঠেছে। রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বিদ্যাসাগর মশাই। আকাশের নক্ষত্রের মত অবিশ্যি আরো নক্ষত্রের আলো আমরা পেয়েছি, পাশাপাশি ঐ সময়টায়।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং তাঁর বয়স যখন ১৪ বৎসর, সেই সময় বঙ্কিমের জন্ম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একজনের জন্ম যশোর জিলার সাগর-দাঁড়িতে, অন্যজনের জন্ম নৈহাটির সন্নিহিত কাঁঠালপাড়ায়। মাইকেল যখন ইউ-রোপ যাত্রা করেন, বঙ্কিমের বয়স তখন ২৪ বৎসর।

মধুসূদন যখন মৃত্যুপথযাত্রী, বঙ্কিম তখন পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক।

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ পায় ১৮৬৪ সালে অর্থাৎ মধুসূদন তখন ইউরোপে।

ঐ সব তারিখ ও মানুষগুলোর কথাও আনন্দচন্দ্র সযতনে লিখে রেখেছিল তার রোজনামচার খাতায়।

জীবনে আনন্দচন্দ্রের বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা হয় নি। সেবারে ইচ্ছা ছিল দেখা করবার কিন্তু শান্তিপুর থেকে ফিরতে ফিরতে দশ দিন হয়ে গেল। শান্তিপুর থেকে ফিরে সেদিন বৈকালের দিকে আনন্দচন্দ্র সোজা গেল বন্ধু ডাঃ মধু গুপ্তের গৃহে।

মধু তখন বেরুচ্ছে ডাক্তারখানায়।

কি ব্যাপার আনন্দ? এ কয়দিন কোথায় ছিলে? সেই মল্লিকদের পড়ো বাড়িতেই নাকি?

না।

তবে কোথায় ছিলে?

শান্তিপুর গিয়েছিলাম।

নদে শান্তিপুর?

হ্যাঁ।

তা সেখানে হঠাৎ?

হঠাৎই চলে গিয়েছিলাম।

কি রকম?

আনন্দ ঘটনাটা বিবৃত করলো। কুসুমকুমারীর সঙ্গে মধুর পরিচয় হয়েছিল একদা আনন্দেরই মধ্যস্থতায়। মনে মনে অশেষ শ্রদ্ধা করতো মধু কুসুমকুমারীকে। সব শুনে বললে, সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার।

আনন্দ বললে, আজকের সমাজব্যবস্থাটা পাল্‌টানো দরকার।

মধু গুপ্ত বললে, পাল্‌টাবে নিশ্চয়ই একদিন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা একদিন সফল হবেই। এই বহু বিবাহ বন্ধ হবেই। যাক তোমাকে খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে আনন্দ। ক'টা দিন এখানে বিশ্রাম নাও।

না ভাই, তার উপায় নেই। এমনিতেই দেশ-গাঁ ছেড়ে এসেছি। কাল প্রত্যুষেই রওনা হবো। ভাল কথা, কবির কোন সংবাদ জান?

জানি।

কেমন আছেন কবি?

ভাল না। বর্তমানে উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটা

লাইব্রেরী আছে একেবারে গঙ্গাতীরে, সেখানেই আছেন খবর পেয়েছি। গৌরদাস-বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনিই বলছিলেন—কবি বোধ হয় আর বাঁচবেন না।

সত্যি বলছো মধু?

দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছিল সেই সন্ধ্যাতেই উত্তরপাড়ায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে তার ম্লান ধূসর আঁচলখানি বিছিয়ে দিচ্ছে গঙ্গাবক্ষে।

গ্রীষ্মকাল।

মধুসূদন উদাস দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলেন।

জয়কৃষ্ণের নাতি রাসবিহারী এসে উপস্থিত হলেন। মধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রাসবিহারী যেন চমকে ওঠেন।

এ কি হয়েছে চেহারা কবির? একদা সোনার চামচ মুখে করে যে মানুষটা জন্মেছিল। বিরাট ধনীর পুত্র। যে শোনা যায় পাঠশালা থেকে ফিরে নদীতে স্নান করতে গেলে পাঁচটা হাঁড়িতে চাল সিদ্ধ হতো—যে হাঁড়ির ভাত সব চাইতে বেশী সুসিদ্ধ হতো সেই হাঁড়ির ভাতই খেতেন—তার আজ এ কি অবস্থা।

মধু—

কে? রাসবিহারী, এসো ভাই। কেমন আছো?

তুমি কেমন আছো?

মধু হেসে আবৃত্তি করেন:

> Out, out, brief candle,
> Life's but a walking shadow,
> a poor player,
> That starts and frets his hour
> upon the stage,
> And then is heard no more.

বলতে বলতে তাকালেন রাসবিহারীর দিকে। বললেন, বোস ভাই।

রাসবিহারী জানতেন না মধুর দারিদ্র্য তখন চরমে পৌঁছেছে।

ধার দেনায় মাথার প্রতিটি চুল বিক্রীত।

তবু সেই মদ্যপানের নেশা মধু ছাড়তে পারেন নি। কোনদিন অন্ন জোটে, কোনদিন জোটে না।

রাসবিহারী—

বলুন।

জান, আজ কয়দিন থেকেই একটু দেশী খাওয়া খেতে ইচ্ছা করছে।

কাল নিয়ে আসবো।

রাসবিহারী—

বলুন।

বিদ্যাসাগরের সংবাদ জান? শুনেছি তিনি বড় অসুস্থ।

আহা, প্রার্থনা করি তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। এমন একটি মানুষ—এমন একটি চরিত্র আর আমার চোখে পড়ে নি রাসবিহারী।

The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man, and the heart of a Bengalee mother—one of Nature's noblemen—greatest Bengali.

রাসবিহারী বললেন, ডাক্তারী চিকিৎসা তো অনেক হলো, এবারে কবিরাজী চিকিৎসা হোক।

মধু মৃদু গলায় বললেন, না।

আরো কয়দিন পরে—

গৌরদাস এসেছেন মধুকে দেখতে।

দেখলেন মধুর প্রবল জ্বর। মধ্যে মধ্যে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। পাশের ঘরে তাঁর স্ত্রী আঁরিয়েৎও দারুণ অসুস্থ। জ্বরে তারও গা পুড়ে যাচ্ছে।

গৌরদাস আঁরিয়তের ঘরে ঢুকতে সে বললে, আমার মৃত্যুতে কোন খেদ নেই। আপনার বন্ধুকে দেখুন। ওকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে ভাল করে তুলুন।

গৌরদাস মধুকে এসে বললেন, তোমাদের এভাবে এখানে পড়ে থাকাটা আর আমার ভাল মনে হচ্ছে না। একটা কথা বলি, তোমরা সকলেই কলকাতায় চলো। সেখানে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিছু হবে না ভাই। কিছু হবে না—বাতি নিভে আসছে। তবু তুমি বলছো যখন তাই হবে। ব্যবস্থা করো।

সেইমত ব্যবস্থাই হলো।

মধু সপরিবারে আবার বেনেপুকুরের বাড়িতে ফিরে এলেন।

মধু অসুস্থ—স্ত্রী আঁরিয়েৎও অসুস্থ। কে কাকে দেখে? কে কার শুশ্রূষা করে?

মনোমোহন ঘোষ, গৌরদাস, রাসবিহারী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মধুর বন্ধুরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলেন মধুকে হাসপাতালে ভর্তি করে

দেবেন।

বাড়িতে রেখে আর চিকিৎসা অসম্ভব।

সেইমত ব্যবস্থা করা হলো। মধুকে প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে ভর্তি করা হবে।

সে সময় প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে একমাত্র ইউরোপীয়ান ছাড়া আর কারো চিকিৎসা হতো না। তবে মধুকে অনেক ইংরাজ কর্মচারী চিনতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় মধুকে প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। যাঁরা করেছিলেন চেষ্টা, তাঁদের মধ্যে ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তীও ছিলেন।

হাসপাতালে ডাক্তার পামার মধুর চিকিৎসার সমস্ত ভার নিলেন।

হাসপাতালে মধু একা। বাড়িতে অসুস্থ আঁরিয়ৎ।

মধুর আদৌ ইচ্ছা ছিল না শেষ সময় আঁরিয়তকে ছেড়ে হাসপাতালে চিসিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু আঁরিয়ৎই বিশেষ করে অনুরোধ করে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল।

তুমি যে একা হয়ে যাবে ডারলিং ?

না, না। তোমার বন্ধুরা তো আছেন—তুমি যাও। আমার জন্য ভেবো না।

মধুর হাসপাতালের রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে সর্বদা মনে পড়ে, বিদায়মুহূর্তে সেই আঁরিয়তের বিষণ্ণ করুণ কথাগুলি।

সেই অশ্রুসজল দুটি চোখ। মধুরও তখন কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না। আঁরিয়তেরও ছিল না। দুজনে কেবল পরস্পরের দিকে চেয়েছিলেন। সেই শেষ দেখা। আর জীবিতকালে পরস্পরের দেখা হয় নি।

আনন্দ বন্ধু ডাক্তার মধু গুপ্তর চিঠিতেই সব জানতে পারে। সে তখন গাঁয়ে।

সেদিন বন্ধু মনোমোহন হাসপাতালে মধুকে দেখতে এসেছেন।

ডাক্তার পামার অবিশ্যি বলেই দিয়েছিলেন, He is too late—বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।

ঐ চেষ্টাই মাত্র সার।

মৃত্যু এগিয়ে আসছিল মধুর শিয়রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।

মনু—

কিছু বলছো মধু—মনোমোহন বললেন।

তোমার কাছে বন্ধু একটা প্রতিশ্রুতি চাই—দেবে ?

কি বল।

দেখো ভাই। আমি বুঝতে পারছি, My days are numbered—দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই ভাই একটা অনুরোধ—আমার অবর্তমানে আমার ছেলে দুটি যেন অনাথ না হয়।

না, হবে না। আমার যদি দু' মুঠো জোটে তো তাদেরও জুটবে।

মন্—

বল।

আঁরিয়েৎ কেমন আছে ?

ভাল।

কিন্তু মিথ্যা বলেছিলেন সেদিন মনোমোহন।

আঁরিয়েতের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। চিকিৎসা যে তার হয় নি, তা নয়। কিন্তু সে যেন সকল চিকিৎসার বাইরে নিঃশেষিত জীবনীশক্তি।

আঁরিয়েৎ শেষ নিঃশ্বাস নিল।

সংবাদ পেয়ে মধু ডাক্তার বেনেপুকুরে ছুটে গিয়েছিল।

পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে তার কবর দেওয়া হলো। অনেক ফুল—আর অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়ে। মধুসূদন জানতেও পারলেন না।

উঃ, সেদিন কি ঝড় আর বৃষ্টি।

মনোমোহন গেলেন হাসপাতালে মধুর স্ত্রীকে কবর দেবার পর।

ইতিমধ্যে মধু স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন। মধু বন্ধুকে বললেন, হে ঈশ্বর, আমাদের দুজনকে একই সঙ্গে নিলে না কেন ?

মধুর চোখের কোল বেয়ে জল পড়তে লাগল।

বাইরে প্রবল বৃষ্টির ধারা। আকাশ বাতাস কাঁদছিল।

৩৮

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবি মধুসূদন—মেঘনাদবধ রচয়িতাকে এক সভার আয়োজন করে অভিনন্দন করেছিলেন। সে সভায় অনেক গুণীজ্ঞানী মহাজন এসেছিলেন।

রাজা প্রতাপ চন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক—সব নাট্যরসিকের দল।

ঘোড়ার গাড়িতে করে এলেন মধু—সঙ্গে তাঁর পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন।

সুসজ্জিত সভাকক্ষে এসে কবি প্রবেশ করলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ কবির কণ্ঠে মাল্যদান করলেন। তারপর তাঁর হাতে তুলে দিলেন রৌপ্যনির্মিত একটি সুরার পাত্র। মানপত্র পাঠ করলেন: "আপনি বাংলা ভাষা নূতনতম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন। আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাংলা ভাষা আবিষ্কৃত হইল। তজ্জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছে। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য করিয়াছেন, তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকিবে, দেশবাসী জনগণ চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন।"

যে কবি মধুসূদন সম্পর্কে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একদিন বলেছিলেন, কৃত্তিবাস ও কালিদাসের পরই মধুসূদনের স্থান, যে কবি মধুসূদনের কাছে কবিতা লেখাই ছিল একমাত্র সার্থকতা, পয়সা রোজগার যাঁর কাম্য ছিল না, সেই কবি মধুসূদন হাসপাতালে রোগশয্যায় শেষের ক্ষণটির অপেক্ষা করছেন।

আঁরিয়তের মৃত্যু হয়েছে।

কিছুক্ষণ পূর্বে মধু স্ত্রী আঁরিয়তের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন। দুটি চক্ষু মুদ্রিত মধুর। প্রেমময়ী স্ত্রীর কথাই বোধ করি ভাবছিলেন। মনে মনে বললেন কবি—হে ঈশ্বর, আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে নিলে না কেন।

বন্ধু মনোমোহন এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

মধু চোখ মেলে তাকালেন সেই পদশব্দে।

কে মনু?

মনোমোহন কবির দিকে তাকালেন।

Yes! I know. She is no more. মন্ত, আঁরিয়তের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে তো?

মনোমোহন মাথা নীচু করে বিষণ্ণ গলায় বললেন, সবই ঠিক হয়েছে। ঝড়-জলের জন্য বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্রকে খবর দেওয়া সম্ভব-পর হয় নি। তবে—

কি মনু?

আপনার ছেলেমেয়ে, জামাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা এসেছিল।

মধু চোখ বুজলেন। তারপর এক সময় বললেন—মনু, তুমি তো একদিন সেক্সপীয়ার পড়েছিলে। Do you remember what Macbeth said

when he heard the news of his wife's death? বলে মধু আবৃত্তি করেন মৃদু শান্ত গলায়—

To-morrow and to-morrow,
and to-morrow,
Creeps in this petty pace from
day to day,
... ...
That starts and frets his hour
upon the stage
And then is heard no more,
it is a tale
told by an idiot, full of sound
and fury,
Signifying nothing.

মনোমোহন বললেন—আপনি অত ভাবছেন কেন? নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন।

মধু হাসলেন।

সে হাসি যেমন করুণ তেমনি বিষণ্ণ।

বললেন—সান্ত্বনা দিচ্ছ মনু, consolation? কিন্তু জান কি, আমি মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে গিয়েছি।

কি বলছেন?

সত্যি তাই মনু। সকালে যখন ডাঃ পামার আমাকে পরীক্ষা করতে আসেন, আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।

কি অনুরোধ?

যদি আমার অনুরোধ আপনি রাখেন তবেই বলি।

বেশ তো, বলুন।

আমার আর ক'দিন ডাক্তার?

Please don't ask me that.

কিন্তু আপনি বলেছেন আমার অনুরোধ রাখবেন।

তখন ডাঃ পামার কি বলেছেন জান মনু?

কি ?

Two days more—আর দুদিন। তাই বলছিলাম, মনু, পৃথিবীতে আমার এখন প্রতিটি মুহূর্ত গোনা। Days are numbered.

মনোমোহনের চোখের কোণে অশ্রু আসে।

ঠিক তিন দিন পরে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি এসেছেন।

মধুর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত।

Reverend ! আমি যীশুখৃষ্টকে বিশ্বাস করি।

অথচ মধু খৃষ্টান হলেও কোনদিন কখনো কোন গির্জায় যান নি।

কৃষ্ণমোহন বললেন—তোমার অন্ত্যেষ্টির জন্য লর্ড বিশপের অনুমতি নিয়ে আসি।

মধু ক্ষীকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন—না, না। মানুষের তৈরী গির্জায় আমার প্রয়োজন নেই। আমি ঈশ্বরের কাছেই চিরবিশ্রাম পাবো। যেখানেই আমার কবর দেওয়া হোক, সেখানে যেন একটু সবুজ ঘাস থাকে। সেখানেই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবো।

১৮৭৩, ২৯শে জুন। ঘড়ির কাঁটা বেলা দেড়টার ঘর পার হতে চলেছে।

কবি চোখ বুজে শয্যায় শুয়ে। ডাঃ পামার শেষ জবাব দিয়ে গিয়েছেন।

মধুর ছেলে মেয়ে জামাই সবাই এসেছে।

তারা কবির শেষ শয্যার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

ভাইপো ত্রৈলোক্যমোহন এসেছে।

মধু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—ত্রৈলোক্য, জীবনের কোন আশা, কোন সাধ পূর্ণ হলো না। তুমি—

বলুন কাকা।

যদি বেঁচে থাকি তো কাল পরশু একবার এসো। অনেক কথা বলার আছে।

ছেলে মেয়ে কাঁদছিল।

কবি তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কিছু বুঝি বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বলা হলো না।

বাইরের আকাশে মেঘ জমছে। বৃষ্টি নামবে বোধ হয়।

মধু বোধ করি জানতেই পেরেছিলেন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। তাই কিছু-

দিন আগে, কি খেয়াল হয়েছিল, একটা কবিতা লিখেছিলেন।

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

কবি কবিতাটা লিখে কি আবার খেয়াল হয়েছিল কে জানে, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। পরের দিন টুকরিটা থেকে ছেঁড়া কাগজগুলো ফেলতে গিয়ে কবিতাটা পেল। কবিতাটা পড়ে শর্মিষ্ঠা ছুটে গিয়ে কাগজটা মার হাতে দিয়ে বললে—দেখো মামী, ড্যাডি কি লিখেছে?

কি লিখেছে রে?

দেখো না পড়ে।

আঁরিয়েত কবিতাটা পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলে। পাশের ঘরে কবি বসে-ছিলেন। আঁরিয়েত তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—এ তুমি কি লিখেছো?

মৃদু স্নিগ্ধ একটুকরো হাসি কবির মুখে।

বললেন—ওটা ফেলো না ডারলিং—keep it. আমি যখন থাকবো না, ঐ কয়টি লাইন যেন—

কথা শেষ হলো না। একটা কাসির দমকে—এক ঝলক রক্ত উঠে এলো মুখ দিয়ে।

শর্মিষ্ঠার সেই দিনের কথাটিই মনে পড়ছিল বার বার কেন যেন।

কবির দু' চোখে মহানিদ্রা নেমে এলো ধীরে ধীরে।

ঘড়িতে তখন ঠিক বেলা দু'টো। বাইরে দ্বিপ্রহরের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে।

বন্ধু মধু ডাক্তারের চিঠিটা পড়ছিল আনন্দ।

সকালে চিঠিটা এসেছে।

আনন্দ,

কবি চলে গেলেন। গত ২৯শে জুন দ্বিপ্রহরে।

কয়েকদিন আগে কবিপত্নী আঁরিয়ত চলে গেছেন।

কবিও চলে গেলেন।

Captive Lady, মেঘনাদবধ কাব্যের, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবি চলে গেলেন।

আনন্দর সেই কবিতাটি মনে পড়ে :

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবননদে ?

বাইরে মেঘে মেঘে আকাশটা ছেয়ে গিয়েছে।

কৈলাস এসে ঘরে ঢুকল। দাদাবাবু—

কিরে ?

পাঙ্খার চর থেকে বছিরুদ্দীন মিঞা এয়েলেন—তার সঙ্গে একবার নাকি যাতি হবে। তার ছাওয়ালডার খুব জ্বর। ক'দিন—

আসছি। তুই যা।

ঘরে এসে আনন্দ জামা পরছে। অন্নদা বললে—এই ঝড়-বাদলার মধ্যি কনে যাতিছো ?

পাঙ্খার চরে।

বাইরে আকাশ দেখিছো ?

তা আর কি হবে—

আনন্দ বাক্সটা নিয়ে বের হয়ে গেল। এক হাতে বাক্সটা, অন্য হাতে ছাতাটা।

পথেই বৃষ্টি নামল। মুষলধারায় বৃষ্টি।

আনন্দর মনে পড়ছিল, 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সর্গে যেখানে লেখা আছে—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ—

সমাপ্ত